মধ্যস্থতায় মহাত্মা

আমিনুল হক হেলাল

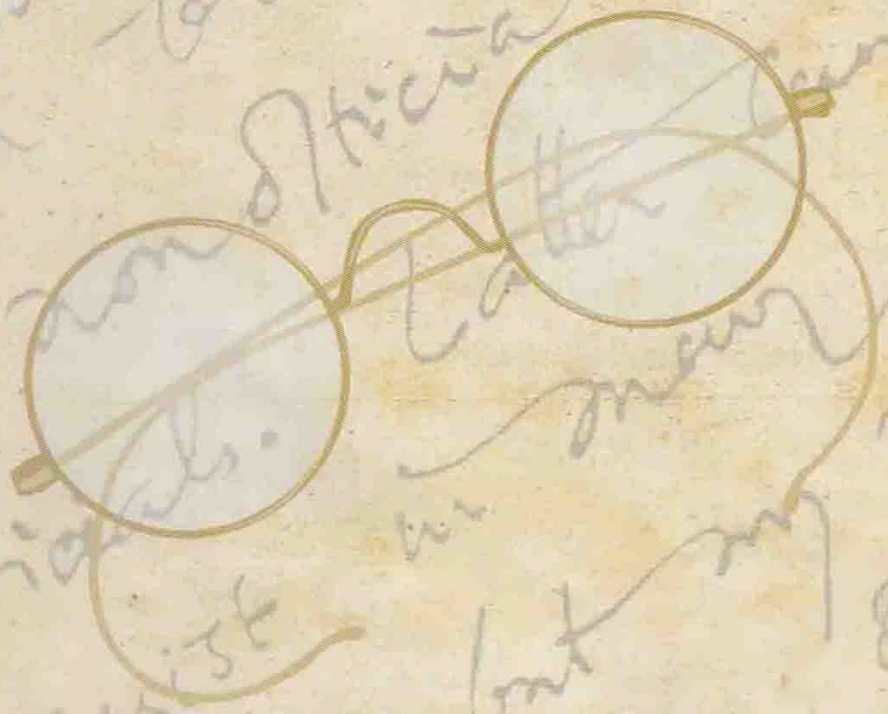

আমিনুল হক হেলাল

মধ্যস্থতায় মহাত্মা

দি বাংলাদেশ ল' টাইমস

মধ্যস্থতায় মহাত্মা

Published and Printed by

SAMARENDRA NATH GOSWAMI
Advocate, Appellate Division,
Supreme Court of Bangladesh
Mediator &
Founder Chairman of Bangladesh International Mediation Society BIMS
24/1, Segunbagicha, At Present, 9, Circuit House Road,
Dhaka-1000, Bangladesh.

First Edition
March, 2021

প্রচ্ছদ

টুটুল আহসান

অক্ষরবিন্যাস

মোঃ বিপ্লব

Sales Center
Supreme Court Bar Building, 3rd Floor, Room No-11
Dhaka-1000, Bangladesh Cell: 01712-281344

Price: BDT: 200/-

উৎসর্গ

সূক্ষ্ম অনুভূতিপ্রবণ সকল মানুষকে

বাংলাদেশ ল' টাইমস বার্তা কক্ষ থেকে

প্রিয় পাঠক,

অভিনন্দন! বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েশন সোসাইটি-র আনুকুল্যে স্নেহাস্পদ জনাব আমিনুল হক হেলাল এ্যাডভোকেট কর্তৃক গবেষণাধর্মী **"মধ্যস্থতায় মহাত্মা"** বইটি বাংলাদেশ ল' টাইমস্ এর প্রকাশনা তালিকায় নতুন সংযোজন। এই বইটি প্রকাশ করতে পেরে বিএলটি পরিবার গর্বিত।

মেডিয়েশন বিষয়ের প্রকৃত উৎসসমূহ জানার আগ্রহ থেকে ইতিপূর্বে ***"বঙ্গবন্ধুর দ্যুতিময় মেডিয়েশন"*** নামক গবেষণামূলক বই পাঠকদের লেখক উপহার দিয়েছে। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ হচ্ছে ভারত। ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ***শ্রী নরেন্দ্র দামোদারদাস মোদী*** বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে বলেন, "'Bangabandhu Mujibur Rahman' a hero for all Indians".

প্রিয় পাঠক,

বিরোধ নিস্পত্তির একটি উপায় হচ্ছে আপোষ-মিমাংসা বা Mediation. এক বা একাধিক পক্ষসমূহের মধ্যকার বিরোধের আপোষমূলক সমাধান হচ্ছে Mediation. যিনি মেডিয়েশন করেন তাঁকে মধ্যস্থতাকারী বা মেডিয়েটর বলা হয়। জাতিসংঘ সনদের ৩৩-৩৮ এবং ৫২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সালিশী সহ অন্যান্য উপায়ে বিরোধ নিস্পত্তির পরিবেশ সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। হেগ শান্তি চুক্তির উপর ভিত্তি করে গঠিত হয়েছে আন্তর্জাতিক সালিশী আদালত। বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু কর্তৃক সাধারণ জনগণ এবং বিশ্ব নেতাদের প্রতি বক্তব্যসমূহের মতো ভারতের জনক মহাত্মা গান্ধীর বক্তব্য ও কর্মসমূহ হচ্ছে মেডিয়েশন এর আত্মপরিচয়।

"**"মধ্যস্থতায় মহাত্মা"** গবেষণাধর্মী বইটিতে ফিরিস্তি মাধ্যমে লেখক মহাত্মার বক্তব্য ও কর্মসমূহ 'নাগিনিরা ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস, শান্তির ললিত বানী শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস, মানস-হ্রদের স্বচ্ছ সূর্যালোক, তোমাকে পেয়েছি অনেক মৃত্যু-উত্তরণের শেষে এবং সময়ের অমেয় আঁধারে জ্যোতির তারণকণা আসে' দ্বারা মেডিয়েশনের ভিত্তি স্থাপনের পর্যায় ক্রমানুযায়ী সন্নিবেশিত করেছেন। বিরোধ নিস্পত্তিতে মহাত্মার ধারণা, ধরণ ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট জানতে বইটি সহায়ক

শক্তি, একথা দিব্যি দিয়ে বলতে পারি।

প্রিয় পাঠক,

মহাত্মা গান্ধী। যাঁর কাছে সব চাইতে পবিত্র জিনিস ছিল 'অহিংসা'। মেডিয়েশন এর প্রতিবিম্ব হচ্ছে অহিংসা দ্বারা শান্তি স্থাপন। মেডিয়েশন দ্বারা পারিবারিক জীবনে, সমাজ জীবনে, রাষ্ট্রীয় সহিংস্রতা রোধে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গণে শান্তি স্থাপনে সহায়ক শক্তি।

প্রিয় পাঠক,

মেডিয়েশনের ছাত্র হিসাবে আমরা সবাই জানি 'মেডিয়েশন' একধরনের পদ্ধতিগত চিন্তার প্রতি দায়বদ্ধতা, জ্ঞান আহরণের প্রতি এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে বিরোধ নিস্পত্তির একটি কৌশল। ধী-শক্তি দ্বারা যা আহরণ করা সম্ভব। সুতরাং এটা শিখতে হয় পবিত্র শাস্ত্র, অভিজ্ঞতা বা অস্বাভাবিকতা নিয়ে ভাবা এবং প্রশ্ন তোলা থেকে। সুশৃঙ্খল কল্পনা খুব সহজেই সুস্থ 'মেডিয়েশন' বিনির্মাণে সহায়ক শক্তি। একাজ সমূহকে ত্বরান্বিত করতে পারে সম্যকস্থিত বক্তব্য ও কর্মসমূহ। যেমনটি মেডিয়েশনের উপযুক্ত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহসালা হতে পারে ''মধ্যস্থতায় মহাত্মা'। ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী *শ্রী নরেন্দ্র দামোদারদাস মোদী* যথার্থই বলেছেন, **'Gandhiji was an Indian. But, he didn't belong only to India.'**

"মধ্যস্থতায় মহাত্মা' বাংলাদেশের মেডিয়েশন ইতিহাসের ছাত্র, শিক্ষক, আইনজীবী, মেডিয়েটর এবং গবেষকদের নিকট Hand Book হিসেবে সমাদৃত হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। সুখপাঠ্য ও তথ্য সমৃদ্ধ বইটির পান্ডুলিপি পাবার পর থেকে প্রকাশ পর্যন্ত সহযোগীতার জন্য ড. রাজীব কুমার গোস্বামী, তন্ময় রহমান, তানজিনা রহমান এবং আফসানা বেগম এ্যাডভোকেট গণদের প্রতি বিএলটি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে।

সমরেন্দ্র নাথ গোস্বামী
এ্যাডভোকেট ও মেডিয়েটর
প্রকাশক ও সম্পাদক
বাংলাদেশ ল' টাইমস্

ফিরিস্তি

নাগিনিরা ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস ---------- ৫-৪৭
বিভাজন বৈরিতার পলিমাটিতে হিংসার চাষাবাদ
তপোবনে এলেন তপস্বী অতঃপর মেডিয়েশনের ইঙ্গিত
হঠাৎ দু'টি নির্দোষ বালক-বালিকা
অপরাধে হাতেখড়ি: আত্মোপলব্ধিতে বিচার প্রার্থনা এবং অহিংসার বীজতলা
মেডিয়েশনে গান্ধীমানস নির্মানে গোখলে
তোমরা যদি শহীদকে খুন করতে চাও, তাহা হইলে প্রথমে আমাকে খুন কর

শান্তির ললিতবাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস ---------- ৪৮-৭০
সব ধর্মই সত্য
প্রথম চোখ ফুটল নোয়াখালিতে
নোয়াখালীর দাঙ্গা রোধে পাঁঠাবলির চাকুতে মেডিয়েশনের জলছাপ
মেডিয়েশনের স্বপ্ননায়ক মহাত্মার নোয়াখালীতে একখণ্ড জমিৎ
আপসে জাতীয় পতাকা আকাশে না উড়লেও সেদিন উড়েছিল শান্তির পতাকা
বিবাদ ঘটিলে পঞ্চায়েতের বলে গরিব কাঙ্গালে বিচার পাইতাম

মানস হ্রদের স্বচ্ছ সূর্যালোক ---------- ৭১-১০৪
অবশেষে তিনটি গুলি
মনে হইল যেন কোর্ট ঘুরিতেছে
দেশ অনুযায়ী বেশ
আগুনের পরশমনি ছোঁয়াও প্রাণে
আমি কারো বিরুদ্ধে কোন নালিশ করবো না

তোমাকে পেয়েছি অনেক মৃত্যু-উত্তরণের শেষে ---------- ১০৫-১২৭
বঙ্গদেশে ঘরগেরস্তালির আদিকাব্য
মান্ধাতার চৌকাঠ পেরিয়ে
গান্ধীজির শান্ত স্থির কণ্ঠ শোনা গেল- ভয় পেয়ো না

সময়ের অমেয় আঁধারে জ্যোতির তারণকণা আসে ---------- ১২৮-১৪২
পরম স্নেহের বেলা
ওর মতো হাজারো ছেলে যেন এদেশে জন্মায়
সবকিছু ছেড়ে আমি বাঙালি হয়ে গেছি

উপক্রমণিকা

কুম্ভিলকবৃত্তির আশ্রয়ে নয়- মহাত্মাকে অনুভব করতে বার বার পড়েছি তাঁর লেখাগুলো। বিশেষ করে চিঠি। আমার কাছে মনে হয়েছে মহাত্মার চিঠিগুলো মেডিয়েশনের এক একটি খোলা দরজা-জানালা। সন্দেহের দোলাচলে দোদুল্যমান মানুষের সম্পর্কে তাঁর চিঠিগুলো এনে দিয়েছে স্থিরতা-নির্ভরতা। বিশেষ করে রাজনীতিতে।

২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮-এ সেবাগ্রাম থেকে গান্ধী চিঠি লিখে জিন্নাহকে মেডিয়েশনের আলোয় আসতে উদ্বুদ্ধ করলেন। গান্ধীর চিঠিতে মেডিয়েশনের ইঙ্গিতপূর্ণ নির্যাসটুকু হলো- *"শেষ কথা, আপনি চান যে আমি কিছু প্রস্তাব নিয়ে অগ্রসর হই। আপনি যেমন ছিলেন সেই রকমই হয়ে যান, নতজানু হয়ে একথা বলা ছাড়া আমি আর কী প্রস্তাব দিতে পারি? কিন্তু দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যের বুনিয়াদ স্থাপনের প্রস্তাব তো আপনার কাছ থেকেই আসতে হবে।"*

১৯৪৪-এর ২২ সেপ্টেম্বর তিনি জিন্নাহকে 'প্রিয় কায়েদ-ই-আজম' সম্বোধনে এরকম আরেকটি চিঠি লেখেন। তাঁর লেখাতে অপূর্বতায় ধরা দিলো মেডিয়েশনের চমৎকার ধারণা। চিঠির একদম শেষে তিনি লিখলেন- *"মনে হয় আমরা এক বৃত্তের মধ্যে ঘুরছি। আমরা যদি একমত হব বলেই ঠিক করেই থাকি আর আমার আশা যে আমরা তাই ঠিক করেছি, তাহলে আসুন আমরা কোনো এক বা একাধিক তৃতীয় পক্ষকে আমাদের পরিচালন করবার জন্য অথবা অন্তত আমাদের মধ্যে সমঝোতা করবার জন্য আহ্বান করি।"*

এরকম অনেক চিঠির মধ্যে আরেকটি চিঠি মেডিয়েশনের সুশীতল ছায়াতলে আসতে হাতছানি দিয়েছে। চিঠিটি লেখা হলো ৫ অক্টোম্বর ১৯৪৫-এ। প্রাপক ছিলেন

জওহরলাল নেহরু। প্রেরক যথারীতি মহাত্মা গান্ধী। চিঠিতে তিনি লেখেন- *"তোমার ও শরৎবাবুর মধ্যে যে মত-পার্থক্য দেখা দিয়েছে, সে কথাটা বলতে চাই। এর জন্যে আমি ব্যথিত। আমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। তুমি যা বলেছ, তা ছাড়া কি আরও কিছু ভিতরের ব্যাপার আছে? যদি থাকে, তা অবশ্য আমাকে জানাবে।"*

মহাত্মা বিশ্বাস করতেন সাধারণ মানুষের সাথে নেতা-কর্মীর স্বাভাবিক আলোচনা না থাকলে বিশ্বাসের সম্পর্কে আস্তর পড়ে। সমাজের চলমান ধারাবাহিকতা বাধাগ্রস্ত হয়। এজন্য তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে নানাজনের কাছে, দেশ-বিদেশে নিয়মিত চিঠি লেখেন। দেশে এসেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। চিঠি লিখেই তিনি নির্ভেজাল আন্তরিকতায় যুক্ত হয়েছেন দাদাভাই নৌরজী, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, কাউন্ট লিও টলস্টয়, রোমাঁ রোলা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, উইনস্টন চার্চিল, হের হিটলার প্রমুখ ব্যক্তির সাথে। এমনকি তিনি জাপান, ব্রিটেন, আমেরিকা এবং গুজরাটের জনগণের উদ্দেশ্যেও খোলা চিঠি লিখে ভাবের আদান-প্রদান করেছেন। তাঁর লেখা চিঠিগুলোর ছত্রেছত্রে সাজানো থাকতো ভারতবর্ষের ইতিহাস, সাহিত্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টি আর ঐতিহ্যের কথা।

মহাত্মাকে সমালোচনার ভস্মস্তূপ থেকে পরিশুদ্ধ আলোয় প্রকৃতভাবে উদ্ভাসিত করতে অন্নদাশঙ্কর রায়ের হালকা মেজাজের তাৎপর্যপূর্ণ ছড়ার অংশ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য

'তেলের শিশি ভাঙল বলে
খুকুর পরে রাগ করো।
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা
ভারত ভেঙে ভাগ করো!
তার বেলা?'

মহাত্মার বেলা হয়েছিল তার উল্টো। তিনি চিঠিতে, লেখাতে, অহিংস আন্দোলনে, সত্যাগ্রহে, অস্পৃশ্যতা বর্জনে, কুষ্ঠরোগী সেবায়, অনশনে এ'রকম কতশত মাধ্যমে মানবতা এবং দেশ প্রেম জাগিয়ে স্বাধীনতার বেদিতে অখণ্ড ভারতমাতাকে উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল প্রকৃত মানবতার আলোয় বিবেক জেগে উঠলে পৃথিবীতে আর কোন হানাহানি, মারামারি, দ্বেষ-বিদ্বেষ থাকবে না। চলমান জীবনেকিছু বিভেদ-বিপত্তি মাথা চাড়া দিলে, আলাপ-আলোচনার

মাধ্যমেই তা নিষ্পন্ন করতে পারলেএখন থেকে আমাদের অশান্তির পৃথিবীতে শান্তির ঢেউ আছড়ে পড়বে।

মহাত্মার শুদ্ধ চাওয়াকে লালন করে পৃথিবীতে এ'পর্যন্ত অনেক মহামানব আলো ছড়িয়েছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মার্টিন লুথার কিং, নেলসন ম্যান্ডেলা, বারাক ওবামা প্রমুখ। ১৯৪৭-এর দেশ বিভাজনের কষ্ট নিয়ে মহাত্মা অগস্ত্যযাত্রায় যুক্ত হলেও তাঁর অসহযোগ আন্দোলনের চেতনায় উদ্বুদ্ধ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশকে স্বাধীন করে আজ সেদেশে জাতির জনক। মহাত্মার সার্ধশততম জন্মবর্ষে দেওয়া বাণীতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উল্লেখ করেন- *"বঙ্গবন্ধু গান্ধীজির অহিংসার আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন।"* প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যথার্থই বলেছেন। কারণ গান্ধীজির কাছে অহিংস আন্দোলন ছিল একটি দর্শন। আর বঙ্গন্ধুর কাছেকৌশল।অহিংসার কৌশল নিপুন দক্ষতায় শতভাগ কাজে লাগিয়ে তিনি একটি গোষ্ঠীকে বাঙালি জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করেন।অতঃপর উদ্বুদ্ধ জাতীগোষ্ঠীকে নিয়ে তিনি একটি অঞ্চলকে স্বাধীন করতে পেরেছেন।

গান্ধীজির কল্যাণে এবং স্বর্গীয় দ্যুতির অন্তর্নিহিত আলোতে অহিংস সত্যাগ্রহের চেতনা পৃথিবীতে আজমহিমময় আলো ছড়াচ্ছে। দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ভারতবর্ষে বিদেশি শাসক ব্রিটিশের শাসনে তিনি বুঝতে পারলেন এ দু'দেশেই বসবাসরত মানুষের মধ্যে সুখ-শান্তি ফিরিয়ে আনতেসবার আগে প্রয়োজন দেশের মানুষের জীবনাচারের আলোকে আইন-কানুন প্রণয়ন করা। দূরদেশের প্রণীত সভ্য আইন-কানুন অন্যদেশে কখনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। তিনি লক্ষ্য করলেন ভারতবর্ষে এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্রিটিশ প্রণীত আইন-কানুনগুলো এ দু'দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে অশান্তির বীজরোপণ করেছে। এ'প্রসঙ্গে গান্ধীজির ভাবনার নির্যাসটুকু এরকম- *"সাহেব ত খোলা মনে যাহা উপযুক্ত ভাবিতেছেন তাহাই করিতেছেন। কিন্তু কাঙ্গাল ভারতবর্ষের অসুবিধার কথা তিনি কি বুঝিবেন? ভারতবর্ষের সুবিধা-অসুবিধা, ভাল-মন্দ অভ্যাস, প্রচলিত প্রথা ইত্যাদির কি তিনি বুঝিবেন? মোহর লইয়া যাহার কারবার, পাই-এর খবর কি সে বুঝিতে পারে? খুব সদিচ্ছা থাকিলেও হাতি যেমন পিপীলিকার প্রয়োজন বুঝিতে পারে না, তেমনি হাতির ন্যায় যাহার প্রয়োজন সেই ইংরাজ, পিপীলিকার ন্যায় ক্ষুদ্র যাহার প্রয়োজন সেই ভারতবাসীর বিচার করিতে পারে না। তাহার জন্য আইন রচনা করিতেও পারে না।"* মহাত্মা মনেপ্রাণে লালনকরতেন মেডিয়েশনের মৌলিক ভাবনা। এজন্যে নিঃসংকোচে

বলতে পেরেছেন- *"আমি তাঁহাকে কেবল এইটুকুই বলিব যে- দুইজনে ঘরোয়া মিটইয়া ফেলিলে আর উকিলের পেট ভরাইতে হয় না।"*

মহাত্মা ইংরেজ প্রণীত আইন সংশোধন করার জন্যে দক্ষিণ আফ্রিকাতে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করেন। সেখানে সফলভাবে তিনি সমঝোতার ভিত্তিতে অনেক সমস্যা শান্তিপূর্ণভাবে নিষ্পত্তি করেন।দীর্ঘ ২১ বছর দক্ষিণ আফ্রিকায় থেকে ভারতবর্ষে এসেও তিনি অহিংস-অসহযোগ আন্দোলন করে ইংরেজ প্রণীত অনেক আইন সংশোধন করেন। তাঁর এই অহিংস সত্যাগ্রহ, অসহযোগ আন্দোলন মেডিয়েশনের চিন্তা-চেতনারদিগন্তকে আস্তীর্ণ করেছে।

অল্প সময়ের মধ্যে মহাত্মার বিশাল কর্মময় জীবনকে অনুভব করা দূরে থাক, স্পর্শ করাও দুঃসাহস। তবুও বইটি প্রকাশ করতে সন্তানতুল্য মোঃ বিপ্লব অনেক কষ্টশ্রমে আমার পাশে থেকে সাহায্য-সহযোগিতা দিয়েছে। বন্ধু মোহাঃ শহিদুল ইসলাম অসীম ধৈর্যে বানানগুলোনির্ভুলকরতে সর্বাত্মক চেষ্টা করে আমাকে ঋণী করেছে। প্রচ্ছদ শিল্পী টুটুল আহসান অনেক ব্যস্ততা ডিঙিয়ে বন্ধুত্বের প্রগাঢ়তাকে আলিঙ্গন ক'রে আবারও প্রমাণ করলো বন্ধুত্বের বিকল্প শুধুইবন্ধুত্ব। জীবনসাথি কোয়েলিয়া লাজুল বইটি লিখতে আমাকে সবসময় মানসিকভাবেপ্রাণিত রেখেছে। আমি তাদেরধন্যবাদ না দিয়ে বরং তাদের কাছে আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা পৌছাতে পারলে আমি সারাজীবন কৃতার্থ থাকবো। *'দি বাংলাদেশ ল' টাইমস''মধ্যস্থতায় মহাত্মা'* প্রকাশ ক'রে আমাকে যারপরনেই আনন্দে বিহ্বল করেছে।

আমিনুল হক হেলাল

নাগিনিরা ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস

বিভাজন বৈরিতার পলিমাটিতে হিংসার চাষাবাদ

১৯০৫! বঙ্গভঙ্গ! অনেক ষড়যন্ত্রের ফসল! সাধারণ মানুষকে বোঝানো হলো, বঙ্গসন্তানদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য এটা হচ্ছে - প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ। এর ফলে বঙ্গবাসীর সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাবে, সুখ-শান্তির পায়রা আকাশে উড়বে। অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য আর বাতাসে ভেসে বেড়াবে না, মানুষের পায়ের নীচে ধুলো-মাটির মতো গড়াগড়ি যাবে। বঙ্গমানুষের কল্যাণের জন্যে ইংরেজও সুন্দরভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারবে। সাধারণ মানুষের খোঁজ-খবর সহজে-সহসা রাখতে পারবে। ইংরেজরা আরও প্রচার করলো বঙ্গভঙ্গ হলো কল্যাণব্রত ইংরেজ শাসকের শতকোটি মঙ্গলময় ইচ্ছের প্রতিফলন। বঙ্গভঙ্গ হলো মানুষের দোর-গোঁড়ায় ইংরেজদের সংস্কারমূলক মঙ্গলবার্তা পৌছানোর একটি শুভচেষ্টা মাত্র।

বৃহৎ বঙ্গীয় ভূখণ্ডে কার্যকর এবং কল্যাণকর প্রশাসন গড়ে তুলতে ব্রিটিশের সর্বাগ্রে প্রয়োজন পড়লো উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার। অনুন্নত যোগাযোগে ফলপ্রসু উন্নয়ন কখনও সম্ভব নয়। এককথায় উন্নয়নের প্রধান বাধা অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা। বৃহৎ বঙ্গদেশে অবস্থিত জালের মতো বিস্তৃত নদী-নালা, খাল-বিল, পাহাড়-পর্বত কার্যকর যোগাযোগে অন্তরায় হয়ে উঠলো। প্রয়োজন পড়লো খাল-বিল-নালার উপর কালভার্ট, ভাটি অঞ্চলের বিস্তীর্ণ খরস্রোতা নদী শাসন ক'রে সেতু নির্মাণ।

এছাড়াতো উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব নয়। অনন্যোপায় ইংরেজ অপেক্ষাকৃত ছোট পরিসরে কার্যকর প্রশাসন গড়ে তোলার বিদ্বেষপূর্ণ মানসিকতা নিয়ে অবশেষে বৃহৎবঙ্গকে এক কোপে দুই টুকরো করলো। ইংরেজ দাবি করলো বঙ্গভঙ্গের কল্যাণে বঙ্গবাসীর অফুরন্ত সুখ-শান্তি আর সুযোগ-সুবিধা হলো। ইংরেজও বড় পরিসর থেকে ছোট পরিসরে দক্ষতার সাথে কাজ করে কার্যকর প্রশাসন তৈরি করতে সফল হলো। প্রশাসনের সেবা দ্রুত পেতেও সাধারণ মানুষকে আর হাপিত্যেশ করতে হচ্ছে না। দাবি করলো বঙ্গভঙ্গের পর তারা অহর্নিশ সেবা দিয়ে দেশবাসীকে সুখ-শান্তির নীড় উপহার দিতে ইতোমধ্যে সফল হয়েছে।

প্রচারে-কৌশলে আশ্বাসের ভাষায় ইংরেজ বঙ্গবাসীকে বোঝালো হে বঙ্গবাসী, ব্যবচ্ছেদে তোমরা আরও সুখ পাবে, শান্তি পাবে, কাজ পাবে, খাবার পাবে, শিক্ষা পাবে, চাঁদের টিকিট পাবে, শনিতেও মঙ্গল পাবে আর মঙ্গলে তো শুধুই মঙ্গল, শনির অস্তিত্বও আর থাকবে না। বঙ্গব্যবচ্ছেদের ফলে আরও পাবে নতুন নতুন রাস্তা-ঘাট, ব্রীজ-কালভার্ট, যোগাযোগ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন। সেই সাথে আরও পাবে অর্থনৈতিক বিপ্লব। হে বঙ্গবাসী রোগে-শোকে তোমরা তাড়াতাড়ি হাসপাতালে যেতে পারবে। স্বাস্থ্য সেবায় ইংরেজ শাসকও এ্যাম্বুলেন্স নিয়ে দ্রুত ছুটে যেতে পারবে তোমাদের কাছে। তোমরা সানন্দে মেনে নাও বঙ্গভঙ্গ। পূজো-অর্চনা আর এবাদত-বন্দেগিতে ভরে তোলো বিভক্ত বঙ্গমাতাকে। ধন্য হও তোমরা, ধন্য করো বঙ্গভঙ্গকে।

ব্রিটিশ প্রচারে আরও যুক্ত হলো বাঙালি শুধু শুধু সস্তা বাঙালিপনার আবেগে চিরদিন জীবন চালিয়েছে। বাঙালির বয়ে যাওয়া কষ্টের জীবনে বঙ্গবিভাজনের বিনিময়ে সুখ এনে দেওয়া হয়েছে। গতিহীন জীবনে গতি এনে দেওয়া হয়েছে। বঙ্গবিভাজনের আগে-পরে ইংরেজরা বোঝালো বঙ্গদেশে আষাঢ়-শ্রাবণ-ভাদ্রের বৃষ্টিতে আর আকাশ থেকে গজব নামবে না। বঙ্গদেশের অতি বৃষ্টির পানি ইংরেজশাসক ব্লটিং পেপারের মতো শুষে নেবে। সেই সাথে বিভক্ত বাঙালির সমস্ত কষ্টও। তারা আরও প্রচারে যুক্ত করলো-বঙ্গভঙ্গতো তাদের ক্ষমতাকে নিপূণভাবে দীর্ঘমেয়াদী করবার জন্যে নয়! বঙ্গভঙ্গ শুধু বাঙালির সুখ-শান্তির জন্যে। বঙ্গবঙ্গ হলো বিভক্ত বাঙালির মঙ্গলপ্রদীপ। বঙ্গভঙ্গ হলো বাঙালির সুখ-শান্তির রাজটীকা।

বৃটিশ ভেবেছিল এভাবে বাঙালিকে অতি সহজেই কুইনাইন খাওয়ানো যাবে। ভেতরে যতই তেতো থাকুক-বাইরেতো চিনির প্রলেপ। বাঙালি অতশত বুঝবে না।

বৃটিশ যা বলছে, যা করছে-তারতো অকাট্য যুক্তি আছে। তাদের যুক্তিতো একদম খোঁড়া নয়, তা কখনও হবারও নয়। লোভী বাঙালি, ধান্দাবাজ বাঙালি ব্রিটিশের এ সরল চাওয়া বুঝবে না কেনো? কিন্তু বাঙালি অতি অল্পসময়ে ব্রিটিশের কূটচাল বুঝতে পেরেছিল। ফলশ্রুতিতে বিভ্রান্ত হয়ে বঙ্গভঙ্গের বিষবৃক্ষের ফল যে সব বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলমান খেয়েছিল, অল্প সময়ের মধ্যে তারাও বমন শুরু করলো। বিভক্তির সাময়িক চিন্তা থেকে বেরিয়ে এসে তারা ঐকতানে মিলিত হলো। বাঙালি সাময়িক বিভক্ত হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু কখনও আন্দোলন-সংগ্রামে পিছপা হয়নি।

ব্রিটিশ লর্ড কার্জন বাঙালিদের একদম পছন্দ করতেন না। তাঁর মনোজগতের ষোলআনা ছিল বাঙালি বিদ্বেষে পরিপূর্ণ। কেমন ক'রে বাঙালিকে বিভক্ত ক'রে দূর্বল করবে, বাঙালির সংগ্রামী চেতনাকে পঙ্গু করবে-সেই অসৎ উদ্দেশ্যে জনমত সৃষ্টি করতে তিনি স্বউদ্যোগে বঙ্গদেশের আনাচে-কানাচে লোক নিয়োগ করেন। তিনি নিজে পূর্ববঙ্গ সফর করেন। তার ধারাবাহিকতায় ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯০৪ সালে চট্টগ্রাম থেকে রেলপথে ফেরার সময় লর্ড কার্জন সেসময়ের ভারত সচিবকে ইংরেজিতে একটি চিঠি লিখলেন। যার বাংলা অর্থ নিম্নরূপ—

> *"বাঙালিরা, নিজেদেরকে যারা একটি জাতি বলে ভাবতে পছন্দ করে, এবং যারা এমন একটি ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে যখন ইংরেজদেরকে বিদায় করে দিয়ে কলকাতার গভর্ণমেন্ট হাউজে একজন বাঙালি বাবুকে অধিষ্ঠিত করবে, তারা অবশ্যই তাদের ওই স্বপ্ন বাস্তবায়নে হস্তক্ষেপ ঘটাতে পারে এমন যে কোনো প্রতিবন্ধকের ব্যাপারে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করবে। আমরা যদি তাদের হৈচৈ-এর কাছে নতি স্বীকার করার মতো দুর্বলতা প্রকাশ করি, তাহলে আগামীতে বাংলাকে কখনোই খণ্ডিত বা দুর্বল করতে পারবো না এবং ভারতের পূর্ব পার্শ্বে আপনি এমন একটি শক্তিকে সংযুক্ত ও দৃঢ় করবেন যেটি ইতিমধ্যেই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে এবং ভবিষ্যতে তা ক্রমবর্ধমান গোলযোগের নিশ্চিত উৎস হয়ে দাঁড়াবে।"*[১]

লর্ড কার্জন ভারত উপমহাদেশে এসে সচেতনভাবে লক্ষ্য করলেন ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি আন্দোলন করছে বাঙালি। বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে একটি শক্তিশালী জাতি হিসেবে বাঙালি জাতীয়তা বহু বছর পূর্বে গড়ে উঠেছে। আবার এ বাংলা ভাষাভাষির মধ্যে মূলতঃ দু'ধরণের ধর্মাবলম্বীর বসবাস। ধর্মানুসারে একটি শ্রেণি হিন্দু বাঙালি ও অন্যটি মুসলমান বাঙালি। হাজার বছরে গড়ে ওঠা

সাংস্কৃতিক পরিচয়ে তারা বাঙালি হিন্দু এবং বাঙালি মুসলমান। ইতোমধ্যে ইংরেজ ছত্রছায়ায় বেড়ে ওঠা বাঙালির তথাকথিত একটি অংশ গুঞ্জন শুরু করলো তারা তাদের জাতীয় পরিচয়ে ধর্ম কী আগে আনবে, নাকি নৃতাত্ত্বিক- সাংস্কৃতিক পরিচয় আগে আনবে? একজন মুসলিম তার ধর্ম নিয়ে গভীর চিন্তা ভাবনা না করেই নিজেকে জিজ্ঞেস করলো সে কী মুসলমানবাঙালি নাকি বাঙালিমুসলমান? একজন হিন্দুও ঠিক তেমনি প্রশ্ন করলো সে কী হিন্দুবাঙালি নাকি বাঙালিহিন্দু? সৃষ্টি হলো এ এক জাতিগত আত্মপরিচয়ের অভিনব সংকট। এভাবে সৃষ্টি হলো নতুন সামাজিক-সাংস্কৃতিক-ধার্মিক দ্বন্দ্ব।

সুযোগ-সৃষ্টির নেপথ্যকারিগর ইংরেজ এভাবে নতুন নতুন বিষয়ে বিভেদ সৃষ্টি ক'রে বঙ্গদেশের জনগোষ্ঠিকে নিয়ে উন্মাদনায় মেতে উঠলো। তিলোত্তমায় গড়ে ওঠা বাঙালির হাজার বছরের নৃতত্ত্ব-কৃষ্টি-সাহিত্য-সংস্কৃতিকে খণ্ড-বিখণ্ড করতে কাজে লাগালো 'ধর্ম' নামক তীক্ষ্মতলোয়ার। দিনে দিনে তা আরও শাণিত ক'রে শুধু বঙ্গদেশকে নয়, বার বার পাঁঠাবলি করা হলো বাঙালির শুভ চেতনার সমস্ত শুভ আয়োজনকে। পোড় খাওয়া কিছু সচেতন বাঙালি ঢাল হিসেবে হাজার বছরে গড়ে ওঠা শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিকে সামনে নিয়ে এলো। তারা কখনও মৃদু ভঙ্গিতে, কখনো চিৎকারে, কখনোবা মিছিলে বলতে শুরু করলো- আমাদের প্রথম পরিচয় 'আমরা বাঙালি'। কিন্তুব্রিটিশের ষড়যন্ত্রের ফসল 'ধর্ম' নামক তীক্ষ্ম তলোয়ারের কাছে সব বাদ-প্রতিবাদ বারবার খণ্ড-বিখণ্ড হলো।

ইংরেজ শাসকগোষ্ঠি এখানেই ক্ষান্ত হল না। হিন্দু-মুসলিম বিদ্বেষ আরও তীব্র করার মানসে ১৯০৬ সালে 'কংগ্রেস'-এর প্রতিপক্ষ হিসেবে এবং কিছুটা ইংরেজ ছায়ায় প্রতিষ্ঠিত হলো 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ'। দল গঠনে এবং নামকরণে চলে এলো ধর্ম পরিচয়। সাদাচোখে লক্ষ্য করলে দেখা যায় ১৯০৬ এর পূর্বে ভারতবর্ষে শুধু দু'টি শক্তির অস্তিত্ব ছিল। শক্তি দু'টো হলো শাসক শ্রেণি ব্রিটিশ, শাসিত শ্রেণি ভারতীয় জনতা। দুঃখজনক হলেও মেঘমুক্ত দিবালোকের মতো সত্যি, ১৯০৬ সালে 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' সৃষ্টির পর ভারতবর্ষে বিরাজমান দু'টি শক্তি থেকে নতুন আরেকটি শক্তির উত্থান হলো। পূর্বের ন্যায় শাসক শ্রেণি ব্রিটিশ বহাল থাকলেও শাসিত শ্রেণি দু'ভাগে বিভক্ত হলো। একটি ভারতীয় হিন্দু জনতা অপরটি ভারতীয় মুসলিম জনতা।

ব্রিটিশের শাসন পদ্ধতির অনেক কৌশলের অন্যতম কৌশল ছিল বিভক্তিকরণ রাজনীতি। ভারতবর্ষে তারা সর্বপ্রথম বেছে নিলো ধর্মতত্ত্বকে। ইতিহাস সচেতন ব্রিটিশ জানতো হিন্দু শাসকদের পরাজিত করে মুসলিমরা ভারতবর্ষে ক্ষমতার মসনদে বসেছে। এজন্য তারা শত্রুর শত্রুকে বন্ধু করার কৌশলে প্রথমেই বেছে নিলো ক্ষমতাচ্যুত হিন্দু ধর্মাবলম্বী গোষ্ঠীকে। ভারতবর্ষের শুভ্র আকাশে, শুদ্ধ বাতাসে পূর্বেও সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়িয়ে ১৮১৭ সালে 'হিন্দু কলেজ' সৃষ্টি করা হয়েছিল। সাম্প্রদায়িক বিষবৃক্ষের পুষ্টাঙ্কুর 'হিন্দু কলেজ' অনেক সমালোচনায় বিদ্ধ হয়ে অবশেষে ১৮৫৪ সালে এসে হলো 'প্রেসিডেন্সি কলেজ'।

১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধের পর থেকেই ব্রিটিশ ক্ষমতায় টিকে থাকতে নানা পদক্ষেপ নেয়। ইতিহাস সচেতন ব্রিটিশ ইতিহাস থেকে নিখুঁত পাঠ নিয়ে পাখির চোখে ভারতবর্ষের আদি-অন্ত পর্যবেক্ষণ করলো। এজন্যে তারা ক্ষমতার মসনদ পাঁকা-পোক্ত করতে প্রথম থেকেই স্বগোত্র 'ইংরেজ বণিক শ্রেণির' স্বার্থরক্ষাকে অগ্রাধিকার দিলো। ব্রিটিশ শুরুতে বাণিজ্য করতে এসে, বাণিজ্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে, ধীরে-ধীরে, ধাপে-ধাপে প্রশাসনিক ক্ষমতা করায়ত্ব ক'রে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে উঠলো। প্রথম থেকেই তারা বুঝেছিলো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে না পারলে বাণিজ্যে পসার-প্রসার করা বেশ কঠিন হয়ে পড়বে। বাণিজ্যস্বার্থসহ অন্যান্য স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্রে তারা বিভক্ত-বিভাজনের দেয়াল গড়ে তুললো। তাদের সৃষ্ট দেয়ালগুলো-কৃষ্টির বিরুদ্ধে কৃষ্টি, সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংস্কৃতি, ভাষার বিরুদ্ধে ভাষা, ধর্মের বিরুদ্ধে ধর্ম, ভূমির বিরুদ্ধে ভূমি, সমতলের বিরুদ্ধে সমতল, পাহাড়ের বিরুদ্ধে পাহাড়। আবার কখনও সমতলের বিরুদ্ধে পাহাড়, পাহাড়ের বিরুদ্ধে সমতল, জলের বিরুদ্ধে স্থল, স্থলের বিরুদ্ধে জলরাশি।

ব্রিটিশের অদৃশ্য ইশারায় ভারতবর্ষে হাজার বছরের বিরাজমান শুভচেতনার অস্তিত্ব এবং অনুসঙ্গগুলো এভাবে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেলো। এই কৌশলে ব্রিটিশ ভারতবর্ষে ১৯০ বছর সরাসরি ক্ষমতার মসনদে টিকেছিল। দীর্ঘ সময়ের সিঁড়ি বেয়ে এখনও ভারতবর্ষে ব্রিটিশের ছায়া পরোক্ষভাবে শতশত উৎসমুখ থেকে কালো মেঘের মতো ছেয়ে আছে। যাপিত জীবনে ভারতবাসীর অস্তিত্বে ব্রিটিশের প্রভাব যতই অনাকাঙ্খিত-অযাচিত হোক তা আজও প্রাত্যহিক জীবন ধারায় অনিবার্য হয়ে ফুটে ওঠে। ব্রিটিশের রেখে যাওয়া কর্মগুলো ইতি-নেতির বাছ-বিচারে তা কখনও অনিষ্টে ইষ্ট লাভের মতো আমাদের জীবনে ধরা দেয়। সর্বোপরি ব্রিটিশের ১৯০ বছরের দীর্ঘ

শাসন-শোষণের ইতিহাস আমাদের ভাগ্যাকাশে এখনও সন্ধ্যাতারার মতো, শুকতারার মতো জ্বলজ্বল করে। আবার কখনও বা অমাবশ্যার মতো গ্রাস করে।

বছর গণনায় ১৮৫৭ সালে ভারতবর্ষের পরাধীনতার সেঞ্চুরীতে কিছু ভারতীয় সন্তান স্বঅধীনতায় ফিরে আসতে চেয়েছিলো। শুরু করলো তারা একটি অপরিকল্পিত বিদ্রোহ। পরিনামে সিপাহি বিপ্লবে ভারতমাতা চেয়ে দেখলো রক্তগঙ্গা। শাসক ব্রিটিশ এবং শাসিত ভারতীয়রা বিভক্তির রোষানলে রক্ত স্নাত হলো।

তপোবনে এলেন তপস্বী অতঃপর মেডিয়েশনের ইঙ্গিত

প্রতিদ্বন্দ্বী-প্রতিপক্ষের রক্তের মিলিত স্রোতে একসময় বিবেক জেগে উঠলো। হানাহানিও থেমে গেলো। জেগে উঠতে শুরু করলো মনুষ্যত্ববোধ। রক্তপিপাসী সিপাহী বিদ্রোহের একযুগ পর ভারতবাসী অবশেষে পেলো একটি স্বর্ণখোচিত দিন। দিনটি ছিলো ১৮৬৯ এর ২ অক্টোবর। গ্রহ-নক্ষত্রের হিসেব মতে দিনটিতে ছিল না অমাবশ্যার অন্ধকার। ছিল ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষ। এই কৃষ্ণপক্ষই একদিন ভারতে নিয়ে এলো শুক্লপক্ষ, নিয়ে এলো পূর্ণ পূর্ণিমার স্নিগ্ধ আলো। এদিন ভারতমাতার কোলে জন্ম নিলো বৈষ্ণব পরিবারে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। হাতের লেখা অসুন্দর হওয়ার অধিকারী বালকটি জ্ঞান হওয়ার পর থেকে সবসময় সুন্দরের স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন। সহসা পথভ্রষ্ট হতেন না। চলার পথে সাময়িক বিচ্যুতিতেও অনুশোচনার কষ্টিপাথরে নিজেকে পরখ করে কষ্ট পেতেন।

একটি ঘটনা। মাধ্যমিকে প্রথম বছর পরীক্ষা চলাকালে শিক্ষা বিভাগের ইন্সপেক্টর মহোদয় বিদ্যালয় পরিদর্শনে এসে ছাত্রদের পাঁচটি শব্দ লিখতে বললেন। পাঁচটি শব্দের মধ্যে একটি শব্দ কেট্‌ল্ (Kettle)। মোহনদাস 'Kettle' ভুল বানানে লিখলেন। মাস্টার মশাই এতে বিব্রত হলেন। জুতোর শব্দে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, সে যেনো সামনের ছাত্রটির শ্লেট দেখে শুদ্ধভাবে লেখে। মাস্টার মশাই এর- জুতোর শব্দের ভাষা গান্ধীজি সঠিকভাবে না বুঝে উল্টো বুঝলো। সে বুঝলো মাষ্টার মশাই জুতোর শব্দে তাকে চুরি ক'রে বানান ঠিক করতে নিষেধ করেছেন। ফলশ্রুতিতে মোহনদাস ব্যতীত ক্লাশের সবাই ইন্সপেক্টরের দেওয়া পাঁচটি বানান শুদ্ধভাবে লিখতে

পেরেছিল। জুতোর শব্দের ভাষা পরবর্তীতে মাস্টার মশাই মোহনদাসকে বুঝিয়ে বললে তাতেও তাঁর কোন পরিবর্তন হয়নি। মোহনদাস অন্য ছাত্রের নিকট থেকে নকল ক'রে কোন কিছু লিখতে হবে এমন অনৈতিক কাজে কখনও প্রবৃত্ত হতে শিখেননি।

এ ঘটনাটি মধ্যস্থতা, সমঝোতা অথবা মেডিয়েশনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে। মধ্যস্থতার জন্যে সাধারণত তিনটি পক্ষের প্রয়োজন। এখানেও জোরালোভাবে তিনটি পক্ষের অস্তিত্ব বিরাজমান। ইন্সপেক্টর মহোদয় একটি পক্ষ হলে অপর দুটি পক্ষ মাস্টার মশাই এবং গান্ধীজি। ইন্সপেক্টরের দেওয়া 'Kettle' বানান গান্ধীজি ভুল লিখার কারণে মধ্যস্থতা করার জন্যে মাস্টার মশাই স্বউদ্যোগে এগিয়ে এলেন। জুতোর শব্দকে প্রতীকী অর্থে তিনি ব্যবহার ক'রে গান্ধীজিকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন তিনি যেন অন্য ছাত্রের শুদ্ধ বানানে লেখা 'Kettle' শব্দটি অগোচরে দেখে তার নিজের বানানটি শুদ্ধ করেন। স্বপ্রণোদিতভাবে এগিয়ে এসে মাস্টার মশাই সঠিক বানান লিখতে যেভাবে গান্ধীজিকে উদ্বুদ্ধ করলেন তা সম্পূর্ণ অনৈতিক। সাদা চোখে মধ্যস্থতার (Mediation) সমস্ত উপাদান বিদ্যমান থাকা সত্বেও অনৈতিকতার একটু ছোঁয়া থাকায় এ ঘটনাটি কোন মেডিয়েশন নয়। মেডিয়েশনের আলো পেতে হলে সমাজ জীবনে শতভাগ শুদ্ধ থেকে তা অর্জন করতে হয়। গান্ধীজি অবচেতন মনে এ ঘটনায় শুদ্ধ হলেও মাস্টার মশাই তা ছিলেন না। মেডিয়েশন জগতে সবসময় 'ইতি'র জয়জয়কার। এখানে 'নেতি'র বিকশিত হওয়ার বিন্দুপরিমাণ সুযোগ নেই। এজন্যে 'নেতি' থেকে শিক্ষা নিয়ে 'ইতি'র হাত ধরে গান্ধীজি সারাজীবন মেডিয়েশন জগতে পরিশুদ্ধ থেকে মধ্যস্থতার বলয়ে হেঁটেছেন। আদিকাল থেকে এপর্যন্ত অনৈতিকতার উপর ভর ক'রে কোন পক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতা হলে তা মেডিয়েশনের দৃষ্টিতে কোন কল্যাণ বয়ে আনেনি। শিক্ষা জীবনের শুরুতে বালক বয়সে গান্ধীজি সেদিন মাস্টার মশাই-এর জুতোর প্রতীকী শব্দে সঠিক অর্থ খুঁজে পেলে তা হতো মেডিয়েশনের কলঙ্কযুক্ত অধ্যায়। এভাবেই গান্ধীজি অবচেতন শিশুমনে প্রকৃত মধ্যস্থতার সঠিক পাঠ নিয়েছিলেন।

প্রাইমারি থেকে মধ্যস্কুল পেরিয়ে হাইস্কুলে প্রবেশ করার সময় মোহনদাসের বয়স বারো স্পর্শ করলো। মোহনদাস লাজুক প্রকৃতির হওয়ায় স্কুলে কারো সাথে তিনি মিশতে পারতেন না। অপ্রয়োজনীয় গল্প-কথাবার্তা বলতে তাঁর একদম অপছন্দ ছিল। বন্ধুদের হাসি-ঠাট্টার ভয়ে স্কুল ছুটি হলে সরাসরি বাড়ি চলে আসতেন।

লেখা-পড়া এবং বই-পত্র ছিল মোহনদাসের একমাত্র সঙ্গী-সাথী। সুযোগ পেলে বালক মোহনদাস চিন্তাজগতকে বিকশিত করতে পাঠ্য বইয়ের বাইরে অন্যান্য বই পড়তেন। বিশেষ করে বালক বয়সে দু'টি নাটক তাঁর চিন্তাজগতে আলোড়ন তুললো। আমৃত্যু তিনি নাটক দু'টির চেতনা ফেরিওয়ালার মতো বয়ে বেড়াতেন। নিজের জীবনেও নাটক দু'টির অন্তর্নিহিত চেতনা প্রতিষ্ঠিত করতে সর্বতোভাবে চেষ্টা করলেন। নাটক দু'টি হলো 'শ্রবণের পিতৃভক্তি' এবং 'হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান'। বাবার কিনে আনা বই 'শ্রবণের পিতৃভক্তি' পড়বার পর মোহনদাসের আরেকটি সুযোগ এলো। বাড়িতে এলো লণ্ঠন ছবি দেখানোর লোক। তিনি পর্দায় দেখালেন 'শ্রবণের পিতৃভক্তি'। মোহনদাস মনের মাধুরী মিশিয়ে পঠিত বই এবার পর্দায় দেখে নতুন করে অনুপ্রাণিত হলেন। চিরদিনের জন্যে স্বর্গীয় অনুভূতির মতো মোহনদাসের কোমলচিত্তে প্রবেশ করলো 'শ্রবণের তীর্থযাত্রা'। পরম বিস্ময়ে অবলোকন করলেন শ্রবণ বাবা-মাকে কীভাবে কাঁধে ঝুলিয়ে বন্ধুর পথ অতিক্রম করছে। 'শ্রবণের কাঁধে বাবা-মা' দৃশ্যটি গান্ধীজি কোনদিন ভুলতে পারেননি। পরিণত বয়সেও বারবার মনে পড়েছে। শ্রবণের মতো 'বাবা-মা' জ্ঞান ক'রে জন্মভূমি ভারতমাতাকে গান্ধীজি সারাজীবন কাঁধে নিয়ে বেড়িয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন স্বদেশ হচ্ছে বাবা-মায়ের মতো। তার সন্তানরা হলো এক একজন 'শ্রবণ'। এজন্যে তিনি কখনো চাইতেন না বাবা-মার মতো জন্মভূমি ভারতমাতা দীর্ঘদিন বিদেশীদের কাঁধে থাকুক। স্বদেশকে কাঁধে নেওয়ার জন্যে তিনি তৈরি হতে শুরু করলেন। অবশেষে জ্ঞাতিচ্যুত হওয়ার আশংকাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে তিনি কালাপানি পর্যন্ত অতিক্রম করলেন। নানা চড়াই-উৎড়াই পেরিয়ে নির্ধারিত সময়ে তিনি বিলেত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে ভারতে ফিরে এলেন।

ফিরে এসে জানতে পারলেন তাঁর মা আর ইহজগতে নেই। শত প্রতিকূলতায় 'মাংস-মদ-অন্যনারী' পরিহার করে মায়ের দেয়া শর্ত তিনটি বিলেতে কঠিনভাবে মেনে আদর্শ সন্তান হয়ে তিনি আর মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারলেন না। মাকে হারানোর কষ্ট-বেদনা আর হাহাকারের ঢেউ তাঁকে নতুন ক'রে প্লাবিত করলো। মনে পড়লো তাঁর বাবাকে হারানোর সেই কলুষিত রাতের ঘটনা। মনে পড়লো অল্প বয়সে কস্তুরীবাঈকে বিয়ে ক'রে সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ উন্মাদনার কথা। তীব্র কষ্টানুভূতিতে আরও মনে পড়লো তাঁর পিতৃদেবকে সেবা-শুশ্রূষা না ক'রে সে রাতে স্ত্রী কস্তুরীবাঈ-এর সান্নিধ্যের কথা। পিতৃদেব না ফেরার দেশে চিরদিনের জন্যে চলে

যাচ্ছেন- সেদিকে তাঁর খেয়াল নেই। কামাসক্তের কারণে সে'দিন তাঁর মুখ্য হয়েছিল স্ত্রীসান্নিধ্য। মুখ্য হয়েছিল কস্তুরীবাঈকে কাছে টানার তীব্র লালসা। প্রায় অশীতিপর দীর্ঘ জীবনে গান্ধীজি কখনো এ কষ্ট বেদনা ভুলতে পারেননি। গান্ধীজির সারাজীবনের কষ্ট-বেদনাকে অনুভবে স্পর্শ করার জন্যে তাঁর লেখা থেকে ঋণ নিয়ে তুলে ধরছি—

"So all was over! I had but to wring my hands. I felt deeply ashamed and miserable. I ran to my father's room. I was that if animal passion had not blinded me, I should have been spared the torture of separation from my father during his last moments. I should have been massaging him, and he would have died in my arms. But how it was my uncle who had had this honour. He was so deeply devoted to his elder brother, that he had earned the honour!"

গান্ধীজির ইংরেজি লেখাটি আশীষ লাহিড়ী এভাবে অনুবাদ করেছেন—

"সব তাহলে শেষ! আমার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করল। লজ্জায় অপমানে আমি এতটুকু হয়ে গেলাম। ছুটে গেলাম বাবার ঘরে। উপলব্ধি করলাম যে, জান্তব কামনা যদি আমাকে গ্রাস না করত, তাহলে বাবার জীবনের এই শেষ মুহূর্তটিতে তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার যন্ত্রণা আমায় ভোগ করতে হত না। আমার তো উচিত ছিল ওঁর পা টিপেই চলা। তাহলে তো আমার হাতের ওপরেই উনি ঢলে পড়তেন। কিন্তু এখন সেই সম্মানটা পেয়ে গেলেন কাকা। দাদার প্রতি তাঁর যে এত ভক্তি, তারই জোরে তিনি এ সম্মান জিতে নিলেন।"[২]

'বাবা-মা' হারিয়ে কষ্ট-বেদনায় নীল হলেন করমচাঁদ। এবার শপথ নিলেন- তিনি জন্মভূমি ভারতমাতাকে 'বাবা-মা'জ্ঞান ক'রে কৈশোরে দেখা নাটকের নায়ক 'শ্রবণ' হবেন। 'শ্রবণ' হয়ে সারাজীবন 'ভারত'-কে সেবা দিবেন। কাঁধে নিয়ে বেড়াবেন। শপথ নিলেন অন্যের কাঁধে থাকা ভারতকে উদ্ধার করবেন। ভারতকে সেবা দেবার মানসে প্রাথমিক স্তরে বীজতলা হিসেবে তিনি বেছে নিলেন দক্ষিণ আফ্রিকাকে।

সেখানে ভারতীয়দের উজ্জীবিত করতে, তাদের স্বার্থরক্ষা করতে ভিন্ন ভিন্ন আন্দোলনের ডাক দিলেন। তাঁর আন্দোলন-সংগ্রামে থাকতো না কোন হিংসা-বিদ্বেষ। থাকতো না কোন হানাহানি-মারামারি। থাকতো না কোন জ্বালাও-পোড়াও। তিনি সবসময় বিশ্বাস করতেন ন্যায্য স্বার্থ-অধিকার আদায় করতে কার্যকর ব্যবস্থা হলো যৌক্তিক আলাপ-আলোচনা।

তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় এসে দেখলেন ভারতীয়দের করুণ দশা। এখানেও তারা ইংরেজ দ্বারা শাসিত-শোষিত হচ্ছে। বিভিন্নভাবে অত্যাচারিত হচ্ছে। ইংরেজরা পৃথিবীর নানা প্রান্তে কখন, কবে, কোন্ প্রয়োজনে সাম্রাজ্যবাদী থাবা মেরেছে তা একমাত্র ইংরেজরাই জানে। তবে এটা স্বীকার্য যে ভারতবর্ষে তারা এসেছিল ব্যবসা-বাণিজ্য করতে। আর দক্ষিণ আফ্রিকার নাতালে তারা এসেছিল উন্নতমানের চা, কফি, আখ চাষ করতে। ব্যবসা করতে করতে ভারতবর্ষে যেমন ইংরেজরা সাম্রাজ্যবাদী থাবা মেরেছিল। একই কায়দায় নাতালেও কৃষি কাজ করতে করতে সুযোগ পেয়ে সাম্রাজ্যবাদী থাবা মারলো। চা, কফি, আখ চাষে প্রয়োজন হলো হাজার হাজার শ্রমিকের। ইতোমধ্যে দাশপ্রথা বিলুপ্ত হওয়ায় শ্রমিক পেতে তাদের সমস্যা হলো। শ্রমিকের কাজে ইংরেজরা প্রথমে নিগ্রোদের অনুরোধ করলো। সাড়া না পেয়ে অবশেষে ধমক দিয়েও তাদের কার্যসিদ্ধি হলো না। নিগ্রোদের কাজ করার ধরণ ভিন্ন। সারাবছর কাজ না করে বছরে ছ'মাস কাজ করলেই তাদের চলে যায়। ইংরেজরা নাতালে চাষ অব্যাহত রাখতে অবশেষে ভারত সরকারের সাহায্য চাইলো। তাদের প্রয়োজনে সাড়া দিলো ভারত সরকার। ভারত ১৮৬০ সালে ১৬ নভেম্বর চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক 'গিরমিট' নাতালে প্রেরণ করলো। চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক 'গিরমিট' দক্ষিণ আফ্রিকায় না এলে সত্যাগ্রহের বীজ রোপণ করার জন্যে তেইশ বছর পর ১৮৯৩ সালের এপ্রিলে গান্ধীজির সেখানে যাওয়ার প্রয়োজন পড়তো না। অত্যাচার-নিপীড়ণে জর্জরিত গিরমিটরা (চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় শ্রমিক) দক্ষিণ আফ্রিকায় তাদের আগমনের 'রজতজয়ন্তী' উৎসব হয়তো আনন্দে উৎযাপন করতে পারলো না। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় অত্যাচারিত-নিপীড়িত গিরমিটের পাশে গান্ধীজি পরম মমতায় পূর্ণ পূর্নিমার স্নিগ্ধ আলোয় সত্যাগ্রহের চেতনা নিয়ে দাঁড়ালেন।

কৈশোরে দেখা গান্ধীজির দ্বিতীয় নাটক 'হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান'। বালক মোহনদাস বারবার দেখেছেন এ নাটকটি। মুগ্ধতায় মনে মনে শতবার হরিশ্চন্দ্রের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। হরিশ্চন্দ্রের জন্যে আবেগ-ভালোবাসায় অনেক বিনিদ্র

রজনী কাটিয়েছেন। তন্দ্রাচ্ছন্ন মোহনদাস অসংখ্যবার স্বপ্নে দেখেছেন হরিশ্চন্দ্রকে। স্বপ্নভঙ্গের পর বালক করমচাঁদ আত্মজিজ্ঞাসা করেছে-'হরিশ্চন্দ্রের মতো সত্যবাদী সকল মানুষ কেন হয় না'। কেউ হোক, না হোক মোহনদাস শপথ নিলেন শত-সহস্র বিপদেও তিনি সত্যে অবিচল থাকবেন, নিমগ্ন থাকবেন মানুষ এবং প্রকৃতি জয় করতে। হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যানে হরিশ্চন্দ্রের কষ্টে বালক গান্ধী ডুকরে-ডুকরে কাঁদতেন। তিনি মনে মনে নিজেকে একজন হরিশ্চন্দ্র ভাবতে শুরু করলেন। এমনকি পরিণত বয়সে এসে শ্রবণ এবং হরিশ্চন্দ্র ঐতিহাসিক চরিত্র নয় জেনেও গান্ধীজি তাদের কর্ম-উদ্যোগ নিজের অস্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত করতে যারপরনেই সচেষ্ট ছিলেন। গান্ধীজি আত্মজীবনীতে লিখেছেন- এই দু'টি নাটক পরিণত বয়সেও যদি পড়েন তাহলেও তিনি নতুন ভাবে অনুপ্রাণিত হবেন এবং নতুন করে কষ্ট পাবেন। চোখের জলে সিক্ত হবেন।

হঠাৎ দু'টি নির্দোষ বালক-বালিকা

কল্পনা আর বাস্তবতার মিশ্র জগতের বাসিন্দা মোহনদাস করমচাঁদ মাত্র তের বছর বয়সে কস্তুরীবাঈকে বিয়ে করলেন। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী তাঁর বিয়ে নিয়ে আত্মজীবনীতে লিখলেন—

"বিবাহমঞ্চে বসিলাম, সপ্তপদী হইল, মিষ্টান্নের অংশ স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে গ্রহন করিলাম, তারপর বর-বধু, একসঙ্গেই থাকিতে লাগিলাম। সেই প্রথম রাত্রি! হঠাৎ দু'টি নির্দোষ বালক-বালিকা কিছু না জানিয়া সংসারের অন্তহীন সমুদ্রে ঝাঁপ দিল, বৌদি শিখাইয়া দিয়াছিলেন, প্রথম রাত্রে কেমন আচরণ করিতে হইবে। আমার স্ত্রীকে কে শিখাইয়া দিয়াছিল, তাহা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি নাই। আজ কি আর জিজ্ঞাসা করিব? পাঠকগণকে নিশ্চিতভাবে কেবল এইমাত্র বলিতে পারি যে, আমরা উভয়েই একে অপরকে কিছুটা ভয় করিতেছি- এই ধরনের একটা মনোভাবই তখন আমাদের ভিতর ছিল। একে অন্যকে লজ্জা করিতাম ত বটেই। কিভাবে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলিব, এবং কি বলিব, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। সে কথা কেহ শিখাইয়া দিলেও কাজে আসিতেছিল না। কিন্তু সত্যই এ ব্যাপারে শিখাইবার কিছু নাই। ধীরে ধীরে একে অন্যের পরিচয় লইতে লাগিলাম, কথা বলিতে লাগিলাম। সংকোচের বাধা দূরে সরিয়া যাইতে

লাগিল। আমরা উভয়েই এক বয়সের ছিলাম। তথাপি স্বামীর প্রভুত্ব আরম্ভ করিতে বিলম্ব হইল না।"(৩)

পুরুষশাসিত সমাজে গান্ধীজি অবচেতনে তথাকথিত পুরুষ হিসেবে শিশুবেলা পেরিয়ে কৈশোরের উষালগ্নে প্রভুত্ব ফলানোর জন্যে স্ত্রী হিসেবে পেলেন কস্তুরীবাঈকে। স্ত্রী কস্তুরীবাঈ তাঁর থেকে ছ'মাসের বড়। তাতে কী! বয়সে ছোট হলেও গান্ধীজি যে পুরুষ! সর্বোপরি গান্ধীজি যে স্বামী! জীব-জগতের পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভের পূর্বেই অল্প বয়সে কস্তুরীবাঈকে পেয়ে তার সাথে যে আচরণ করেছেন- তার জন্যে তিনি আমৃত্যু কষ্ট পেয়েছেন। বিবেকের দংশনে তিনি ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন। নিজের জীবনকে সত্যের সমীপে সমর্পন ক'রে আত্মজীবনী লিখতে তিনি বারবার আহত হয়েছেন।

গান্ধীজি ডারবানে ওকালতিতে পসার করার পর তাঁর অফিসে বেশ কয়েকজন কেরানির প্রয়োজন পরলো। নিয়মানুযায়ী গান্ধীজি অফিসের কেরানিদেরও পরিবারের সদস্য মনে করতেন। এদের মধ্যে একজন নবাগত অস্পৃশ্য খ্রিস্টান ছিল। সংসারের কাজসহ পরিবারের সদস্যতুল্য কেরানিদের কাজও কস্তুরীবাঈ বিনা দ্বিধায় করতেন। সমস্যা হলো নবাগত অস্পৃশ্য খ্রিস্টান কেরানিকে নিয়ে। কস্তুরীবাঈ অনিচ্ছায় অনেক কষ্টে তার কাজ করতেন। গান্ধীজি একদিন দেখতে পেলেন অস্পৃশ্য কেরানির ঘর থেকে কস্তুরীবাঈ চোখ-মুখ বিকৃত ক'রে রাতের শৌচভাণ্ড নিয়ে বের হচ্ছেন। গান্ধীজির বিষয়টি একদম ভাল লাগলো না। রাগে অন্ধ হয়ে গেলেন। চিৎকার করে বললেন তাঁর বাড়িতে তিনি কোন অসভ্যতা বরদাস্ত করবেন না। গান্ধীজি কস্তুরীবাঈ-এর নিকট থেকে প্রত্যাশা করতেন তিনি যেন সংসারের সকলের সমস্ত কাজ হাসি মুখে করেন। এক্ষেত্রে কস্তুরীবাঈ ব্যর্থ হলেন। অস্পৃশ্যের কাজ তিনি আনন্দে না করে, চোখ-মুখ বিকৃত করে করেছেন বলেই গান্ধীজির এতোকষ্ট, এতো রাগ, এতো অভিমান। অবশেষে রাগে কাণ্ডজ্ঞানশূণ্য গান্ধীজি কস্তুরীবাঈ-এর হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে দরজার বাইরে বের করে দিলেন। বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে কস্তুরীবাঈ অঝোরে অশ্রু ঝরালেন এবংকাঁদতে কাঁদতে গান্ধীজিকে বললেন—

"তোমার কি লজ্জাশরম বলে আর কিছু অবশিষ্ট নেই? তুমি এতটা নীচে নামাবে নিজেকে? কোথায় যাব আমি? এখানে এমন কেউ নেই যার কাছে আমি যেতে পারি। তোমার নিশ্চয়ই ধারণা, তোমার স্ত্রী বলে আমাকে তোমার লাথিঝাঁটা সব সহ্য করে যেতে হবে। দোহাই তোমার, নিজেকে

সামলাও, দরজাটা বন্ধ করো। এ দৃশ্য দেখে লোকে কী ভাববে বলো তো। এভাবে লোক হাসিও না।"(৪)

স্ত্রী কস্তুরীবাঈ-এর ঝাঁঝালো প্রতিবাদে গান্ধীজির চেতনা ফিরে এলো। ভাবলেশহীনভাবে তিনি এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকলেন যেন কিছুই হয়নি। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তিঁনি তীব্র কষ্টে মরে গেলেন। মনে মনে ভাবলেন তাঁর স্ত্রী যেমন তাঁকে ছেড়ে থাকতে পারবেন না। তেমনি তিনিও তাঁর স্ত্রীকে ছাড়া এক মুহূর্তও থাকতে পারবেন না। জীবনে বহুবার তাঁরা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে মান-অভিমান, রাগ-অনুরাগ, ঝগড়া-ঝাটি করেছেন। কিন্তু প্রতিবার তাঁরা গভীর মমত্ববোধে বোঝাপড়া করেছেন। পরস্পর পরস্পরকে গভীরভাবে বন্ধুর মতো কাছে টেনেছেন।

জেলখানায় ১৯৪৪ সালে কস্তুরীবাঈ মারা গেলে কষ্ট-বেদনায় মহাত্মাজি মুহ্যমান।তাঁর শরীর একদম ভেঙ্গে পড়লো। শৈশবের সাথি কস্তুরীবাঈকে হারিয়ে স্মৃতিকাতর মহাত্মাজি তাঁর আত্মীয়কে বলেন—

"বা (কস্তুরবা) কোনো অর্থেই আমার চেয়ে দুর্বল ছিলেন না; বরং তিনি আমার চেয়ে বেশি শক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁর সহযোগিতা না পেলে আমি ডুবে যেতাম। ওই নিরক্ষর মহিলাটিই একেবারে কড়া হাতে আমাকে আমার সমস্ত ব্রত পালনে সাহায্য করেছিলেন এবং আমায় সদাজাগ্রত রেখেছিলেন। একইভাবে, রাজনীতিতেও তিনি প্রভূত সাহসের পরিচয় দিয়ে সবকটি আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। ঐহিক বিচারে তিনি হয়তো নিরক্ষর ছিলেন, কিন্তু তিনিই ছিলেন সেই আদর্শ নারী যিনি আমার মতে প্রকৃত শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন ধর্মপ্রাণ বৈষ্ণব, নিয়মিত তুলসি পুজো করতেন, নিয়ম মেনে পালন করতেন পবিত্র দিনগুলি এবং একবারে মৃত্যুকাল অবধি গলায় কণ্ঠী ধারণ করেছিলেন। এই বালিকাটিকে সেই কণ্ঠী আমিই দিয়েছিলাম। কিন্তু মনুকে, কিংবা দেবদাসের তারাকে তিনি যতখানি ভালোবাসতেন, ঠিক ততখানিই ভালোবাসতেন একটি হরিজন মেয়েকে। বৈষ্ণবদের যেসব গুণাবলির বর্ণনা নরসিংহ মেহতা তাঁর ভজনে তুলে ধরেছিলেন, তিনি ছিলেন তার সজীব রূপ। আমি আজ যা হয়েছি সেসব তাঁরই দৌলতে। নিজে শত অসুস্থ হলেও আমার সেবায় কখনো কোনো গাফিলতি দেখাতেন না তিনি। আর আমার জীবন তো অনেক সময়েই বেশ বিপন্ন হয়ে পড়ত। ১৯৪৩-এর অনশনের সময় তো প্রায় মৃত্যুর মুখে চলে গিয়েছিলাম বলা যেতে পারে। কিন্তু তিনি কখনো চোখের জল ফেলেননি,

মনোবল হারাননি। বরং অন্যদের মনে সাহস জুগিয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছেন। আজও তাঁর মুখখানি আমি স্পষ্ট দেখতে পাই।"(৫)

গান্ধীজির ভাষ্যে বাল্যসাথী কস্তুরীবাঈ ছিলেন তাঁর আন্দোলন-সংগ্রামে চেতনার উৎসমূল। মহাত্মার অনশন ব্রত ছিল অহিংস-সত্যাগ্রহের বিশুদ্ধ আধার। কস্তুরীবাঈ মহাত্মার অনশনে সবসময় সাথে থেকেছেন, সেবা-শুশ্রুষা করেছেন এবং সাহস দিয়েছেন। নিরক্ষর কস্তুরীবাঈ প্রকৃতি থেকে শিক্ষা নিয়ে এবং মহাত্মার দীক্ষায়-দীক্ষিত হয়ে জাত-পাতে বিশ্বাসী ছিলেন না। নিজের নাতি-নাতনিকে যে স্নেহছায়ায় লালন-পালন করেছেন ঠিক একই স্নেহছায়ায় উপেক্ষিত-অবহেলিত হরিজন সমাজের মেয়েকেওলালন-পালন করেছেন। অহিংস আন্দোলনে শাসকগোষ্ঠীর সাথে আন্দোলনরত মানুষের মধ্যে আলাপ-আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি করতে গান্ধীজিকে সবসময় নেপথ্য থেকে কস্তুরীবাঈ প্রেরণা দিতেন। তাঁর প্রেরণাতেই অহিংস আন্দোলনে শাসকগোষ্ঠী এবং ভারতবাসীর মধ্যে ধাপে ধাপে মধ্যস্থতার ভিত্তি তৈরি করে গান্ধীজি প্রতিটি পদক্ষেপে ছড়ালেন মেডিয়েশনের আলো।

'রূপনারায়ণের কূলে' রবীঠাকুর জীবন সায়াহ্নে এসে যেভাবে বলেছেন- 'সত্য যে কঠিন, কঠিনেরে ভালোবাসিলাম, সে কখনো করেনা বঞ্চনা'র মতো গান্ধীজি পরিণত বয়সে আত্মজীবনী লিখতে এসে বললেন—

"এই অধ্যায়টি না লিখিতে হইলে বাঁচিয়া যাইতাম। কিন্তু আত্মকথা লিখিতে বসিয়া আমাকে এইরূপ কত তিক্ত স্বাদই না লইতে হইবে। যদি নিজেকে আমি সত্যের পূজারী বলিয়া দাবী করি, তবে এসব ঘটনা এড়াইবার কোন উপায় নাই।

বেদনার সঙ্গে জানাই, মাত্র তেরো বছর বয়সে আমার বিবাহ হইয়াছিল- আজ আমার সামনে যে সকল বারো-তেরো বছরের ছেলে রহিয়াছে তাহাদিগকে যখন দেখি ও আমার বিবাহের কথা স্মরণ করি, তখন নিজের উপর দয়া হয় এবং এই ছেলেরা আমার অবস্থায় পড়ে নাই বলিয়া উহাদিগকে অভিনন্দন জানাইতে ইচ্ছা হয়। এইরূপ অল্প বয়সে বিবাহ করার সমর্থনে একটা নৈতিক যুক্তিও আমি খুঁজিয়া পাই না।"(৬)

অপরাধে হাতেখড়ি:

আত্মোপলব্ধিতে বিচার প্রার্থনা এবং অহিংসার বীজতলা

নিষ্ঠা এবং সততায় বেড়ে ওঠা মোহনদাস শৈশবে ভীরু প্রকৃতির ছিলেন। চোরের ভয়, ভূতের ভয়, সাপের ভয়ে নিজেকে গুটিয়ে রাখতেন। রাতে কোথাও একলা যাওয়ার সাহস রাখতেন না। সারাজীবন মানবাত্মায় আলো জ্বালানো মানুষটি শিশু-কিশোরকালে অন্ধকারকে ভীষণ ভয় পেতেন। বাতি না জ্বালিয়ে ঘুমোতে পারতেন না। বিয়ের পর স্ত্রী কস্তুরীবাঈ অবচেতন মনে তাঁর ভীরু মানসিকতায় প্রচণ্ড আঘাত করলেন। কস্তুরীবাঈ তাঁর চেয়ে ছয় মাসের বড়। কারণে-অকারণে বেশী সাহস দেখাতে শুরু করলেন। সাপ-ভূতে ভয় নেই তাঁর। এমন সাহসী স্ত্রীকে কী করে গান্ধীজি বোঝাবেন দুর্বল-ভীরু স্বামীর কষ্টের কথা। স্ত্রী কস্তুরীবাঈ-এর কাছে স্বামীর দুর্বলতা অনাবিষ্কৃত থাকলেও তাঁর এক বন্ধু বিষয়টি টের পেলো। বন্ধুটি তার পৌরুষ জাহির করার জন্য করমচাঁদকে বলতো সে কখনো চোরকে ভয় করে না। জীবন্ত সাপ ধরা তার কাছে কোন বিষয়ই নয়। এমনকি সে ভূতের অস্তিত্ব পর্যন্ত স্বীকার করে না। কথাচ্ছলে সে বুঝাতো- তার এসকল সাহসের উৎসমূল মাংসাহার। আজ সে মাংসাহারী বলেই তার এই পৌরুষদীপ্ত আচরণ। করমচাঁদও মাংসাহারী হলে সে সাহসী হয়ে উঠবে। সদ্য বিবাহিত করমচাঁদ, স্ত্রী কস্তুরীবাঈ-এর কাছে আর কতদিন দূর্বল চিত্তের বিপন্ন স্বামী থাকবে। বলিষ্ঠ-সাহসী হওয়ার মানসে বন্ধুর প্রভাবে একদিন তিনি মাংসাহারে সিদ্ধান্ত নিলেন। তাতেও যদি সাহস বাড়ে, শক্তি বাড়ে, বলবান হওয়া যায়। মাংসাহারের ফলে সাহসী স্ত্রীর কাছে তিনি কারণে-অকারণে সাহস দেখাবেন! মনে মনে ভাবলেন মাংসাহারে অর্জিত শৌর্যবীর্য ইংরেজ তাড়াতেও কাজে আসবে। অবশেষে একদিন বন্ধুর পরামর্শে, পৌরুষ দীপ্ত শৌর্যবীর্যের সন্ধানে মোহনদাস মাংসাহার থেকে আর নিজেকে বিরত রাখলেন না।

একটি অপরাধ শত অপরাধের দরজা-জানালা খুলে দেয়। গান্ধীজি মাংসাহার থেকে অল্পসময়ের ব্যবধানে আরও অপরাধ করতে ঘোরলাগা অন্ধকারজগতে প্রবেশ করলেন। যে গান্ধীজি স্কুলে অন্য ছাত্রের অগোচরে শ্লেট দেখে নৈতিকতার কারণে ভুল বানান শুদ্ধ করেননি-সেই গান্ধীজি বিড়ি খাওয়ার মতো একটি বাজে নেশায় কীভাবে বিভোর হলেন! গান্ধীজির অন্তরাত্মায় অপরাধগুলোর আধার ছিল বলেই আত্মীয়ের শখের সাথে তাল মিলাতে তাঁর এ করুণ দশা। 'কাকার মুখ থেকে বিড়ির

ধোঁয়া নির্গত হচ্ছে' এই সাধারণ দৃশ্যও গান্ধীজির কাছে অসাধারণ হয়ে উঠলো। তিনিও নিয়মিত মুখ থেকে কাকার মতো ধোঁয়া বের করতে লাগলেন। পয়সা না থাকায় বিড়ি কিনতে না পারলে কাকার ফেলে দেওয়া শেষ অংশটুকু তিনি টানতে শুরু করলেন। বিড়ির অবশিষ্টাংশ না পেলে নেশার কারণে চাকরের পয়সা চুরি করতেও তাঁর আর দ্বিধা রইলো না। বিপত্তি ঘটলো চুরি করা পয়সায় বিড়ি কিনে রাখবেন কোথায়! গোপনে বিড়ি কিনলেও তো গোপনে খাওয়া যায় না। আত্মীয়-স্বজনেরা ধোঁয়া-গন্ধে টের পেয়ে যায়। বিড়ি খাওয়ার খবর জেনে যাবে এই ভয়ে গান্ধী ও তাঁর আত্মীয় বনজঙ্গলের একধরনের লতা জড়িয়ে বিড়ির মতো টানতে শুরু করলেন। কিন্তু কষ্টের কথা, ইতোমধ্যে তামাকের নেশা তাঁদের পেয়ে বসেছে। লতার বিড়িতে তাঁরা আর তৃপ্ত হলেন না।

কবি দাউদ হায়দারের 'জন্মই আমার আজন্ম পাপ' কবিতাটি তখনো রচিত হয়নি। কিন্তু গান্ধীজি পরাধীন দেশে জন্মগ্রহণ করে বুঝতে পারলেন জন্মই তাঁর আজন্ম পাপ। পরাধীনতার গ্লানি নিয়ে বেঁচে থাকার কোন স্বার্থকতা নেই। নিজের ছোট জীবনে তিনি পরাধীনতার শিকলে আবদ্ধ। সকাল থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা থেকে সকাল, অষ্টপ্রহর পরাধীনতায় থাকতে থাকতে তিনি ক্লান্ত। সামান্য বিড়ি টানবে-তাও তিনি স্বাধীনভাবে পারেন না। একষ্ট আর সহ্য হয় না। এ কোন্ সমাজে তাঁর জন্ম? বড়দের অনুমতি ছাড়া তাঁদের কিছুই করার উপায় নেই। বিড়ির মতো স্থূল ঘটনা তাঁর জীবনকে বিপন্ন করে তুললো। নিজের সাথে নিজে অনেক আলোচনা করলেন। আলোচনান্তে সিদ্ধান্ত নিলেন এ জীবন তিনি আর রাখবেন না। স্বাধীনভাবে বিড়ি টানার স্বাধীনতা যে সমাজে নেই-সে সমাজে তিনি আর বেঁচে থাকতে চান না। নিলেন চরম সিদ্ধান্ত। আত্মহত্যা ক'রে তিনি নিজেকে বিনাশ করতে মনস্থির করলেন। গান্ধীজি এবং তাঁর আত্মীয় ইতোমধ্যে জেনে গেছেন ধুতুরার বীজে বিষ আছে। জঙ্গলে গিয়ে অনেক চেষ্টায় তারা ধুতুরার বীজ নিয়ে এলেন। নিজের জীবন বিনাশ করতে পবিত্র লগ্ন হিসেবে বেছে নিলেন গোধূলিলগ্ন। কেদারজীর মন্দিরে ঘি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করলেন। মন্দিরের নির্জন কোণে বসে দেবতা দর্শন করতে করতে তাঁরা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবে-এ আশায় দু'চারটে ধুতুরার বীজ মুখে পুরে দিলেন। অল্প সময়ের জন্যে বুকে সাহস নিয়ে গান্ধীজি আত্মহননের সিদ্ধান্ত নিলেও অবশেষে তাঁর মধ্যে কৈশোরের ভয় আবার জেগে উঠলো। তাঁরা দুজন সিদ্ধান্ত নিলেন আত্মহননের জন্যে আর ধুতুরার বীজ খাবেন না। বরং মন্দিরের নির্জন কোণে

কিছুক্ষণ বসে দেবতা দর্শনে আত্মায় প্রশান্তি আনতে চেষ্টা করলেন। কীভাবে স্বাভাবিক জীবনযাপন করা যায়- সে বিষয়েও চিন্তা-ভাবনা শুরু করলেন।

আত্মহনন না ক'রে মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে এলেন গান্ধীজি। বিড়ি খাওয়ার অভ্যাস ত্যাগ করলেন। চাকরের পয়সা চুরি করার আর প্রয়োজন হলো না। বারো-তেরো বছর বয়সে গান্ধীজি বিড়ি কেনার জন্যে চাকরের পয়সা চুরি করা বন্ধ করলেও পনেরো বছর বয়সে তিনি আর একটি অপরাধ করে বসলেন। বন্ধুর সহযোগিতায় নিজের শৌর্যবীর্য আর সাহস বৃদ্ধির জন্যে ইতোপূর্বে মাংসাহার করেছেন। এসব অপকর্ম করতে তাদের প্রয়োজন ছিল টাকা-পয়সার। ধার-কর্জ করে তা তাঁরা সংগ্রহ করেন। কর্জের টাকা শোধ করতে গান্ধীজি আবারও চৌর্যবৃত্তির আশ্রয় নিলেন। এবার চুরি করলেন আপন ভাইয়ের স্বর্ণ। যে হাতে আত্মহননের জন্যে ধুতুরার বীজ খেয়েছিলেন-সেই হাতে ভাইয়ের স্বর্ণের তাগা থেকে এক তোলা স্বর্ণ কেটে নিলেন। চুরি করা স্বর্ণ বিক্রি ক'রে তাঁরা তাদের ধার-কর্জ শোধ করলেন।

এরপর গান্ধীজির অন্তরাত্মা অপরাধের গ্লানিতে পূর্ণ হয়ে উঠলো। তাঁর বিবেক জেগে উঠলো। বার বার জেগে ওঠা বিবেকের সঙ্গে পাপীতাপী বিবেকের শুরু হলো সংঘাত। স্বচ্ছ আয়নায় তিনি এবার নিজেকে দেখলেন, চিনলেন। নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করলেন তিনি আর কখনো চোরামির আশ্রয় নেবেন না। সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁর সমস্ত অপরাধ বাবার কাছে স্বেচ্ছায় বলবেন। ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। জঘন্য অপরাধের কৃতকর্মগুলোর ফিরিস্তি স্বাভাবিক অবস্থায় বাবাকে বলতে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হলো, জিভ শুকিয়ে গেলো।

অবশেষে গান্ধী সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি বাবাকে চিঠি লিখবেন। যে হাতে ভাইয়ের স্বর্ণ চুরি করেছেন, সেই পাপিষ্ট হাতে করজোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা না করে দন্ড ভিক্ষা চাইবেন। অনুশোচনায় দগ্ধীভূত গান্ধী কষ্টের অক্ষর সাজিয়ে অবশেষে অপরাধের ফিরিস্তসমৃদ্ধ একটি চিঠি লিখলেন। ক্ষমার অযোগ্য সন্তান বাবাকে লিখলেন-অপরাধের তিনি সাজা পেতে চান। বিশেষ করে বাবাকে মিনতি করে লিখলেন সন্তানের অপরাধে বাবা যেন নিজে কোন কষ্টভোগ না করেন। নিজে যেন আত্মগ্লানিতে না ডুবে সন্তানকে চরম সাজা দিতে সিদ্ধান্তহীনতায় না ভোগেন। চিঠিতে প্রতিজ্ঞা করলেন ভবিষ্যতে তিনি আর কখনো চৌর্যবৃত্তির আশ্রয় নেবেন না।

চিঠি লেখা যতো সহজ, বাবার হাতে দেওয়া ততো সহজ হলো না। আত্মদংশনে জর্জরিত গান্ধী হিমালয়ের মতো ভারী অপরাধগুলো লিপিবদ্ধ করে দুরু দুরু বুকে, কম্পমান হাতে অবশেষে অসুস্থ বাবাকে দিলেন। বাবা কাবা গান্ধী চিঠিটি পড়লেন বুকফাটা কষ্ট নিয়ে। অঝোর ধারায় অশ্রু ঝরতে শুরু করলো তাঁর বিস্ফারিত চোখ দুটো থেকে। গান্ধীজি আত্মজীবনীতে বাবার এই অশ্রুকে মুক্তাবিন্দুর সঙ্গে তুলনা করেছেন। অসুস্থ বাবার পাশে আত্মদংশনে জর্জরিত অপরাধী সন্তান দেখলেন চিঠি পড়তে পড়তে বাবার বিস্ফারিত চোখ দুটো একসময় বন্ধ হয়ে গেল। বন্ধ চোখের জলের ধারায় সন্তানের অপরাধ সমৃদ্ধ চিঠিটি ভিজে যাচ্ছে। বাবার অশ্রুজলে সেদিন শুধু সন্তানের চিঠি সিক্ত হলো না, সিক্ত হলো বেয়াড়া সন্তানের অন্তরাত্মা। অহিংসার মর্মবাণী সেদিন সুস্নাত হলো তাঁর অস্তিত্বে। অভিষিক্ত হলো তাঁর ধ্যানমগ্নতায় সত্যাগ্রহের অপূর্ব চেতনা।

পনেরো বছর বয়সী সন্তানের ক্ষমাহীন অপরাধেও বাবা কাবা গান্ধী বিচলিত হলেন না। চিৎকার-চ্যাঁচামেচি করলেন না। অপরাধী সন্তানকে সাজা দিলেন না। শাসন করলেন না। পারিবারিক পরিসরে শালিস-বৈঠক ডাকলেন না। শুধু পিতার চোখের জলে গান্ধীজির অন্তরাত্মায় ভাসিয়ে দিলেন অহিংস চেতনার পালতোলা নৌকো। আত্মদংশনে জর্জরিত গান্ধীজি এভাবেই তাঁর বাবা কাবা গান্ধীকে আবিষ্কার করলেন অহিংস তত্ত্বের জনক হিসেবে। অল্প বয়সী সন্তান গান্ধীজি সেদিন বাবার সমস্ত সত্তায় অহিংস তত্ত্বের ছাপ দেখলেন। ক্ষমাহীন অপরাধে ক্ষমা পেয়ে সেদিন সন্তান বাবার সত্তায় শুধু প্রেম দেখলেন। অন্য কিছু দেখলেন না। সন্তানের অপরাধ নিঃশব্দে ক্ষমা করতে বাবা সেদিন ভুলে গেলেন তাঁর অতীত সত্তা। ভুলে গেলেন তিনিও একদিন ইন্দ্রিয় ভোগে আসক্ত ছিলেন। তিনিও একদিন ক্রোধপরায়ণ মানুষ ছিলেন।

বাবাকে স্বেচ্ছায় স্বপ্রণোদিত লিখা সন্তানের অপরাধসমৃদ্ধ চিঠিটি পিতা-পুত্রের যোজন যোজন দূরত্বকে ঘুচিয়ে দিল। একটি চিঠিই মুহূর্তে পাল্টে দিল দু'জনের অবস্থান। অপরাধী স্বেচ্ছায় অপরাধ স্বীকার ক'রে মাথানত অবস্থায় বিচারক বাবার কাছে দাঁড়ালেন দন্ড পেতে, সাজা পেতে। বিচারক বাবাও হয়তো অপরাধী সন্তানকে দন্ড দেবার জন্যে শায়িত অবস্থা থেকে উঠে বসলেন। কিন্তু চিঠি পড়ে বাবা কাবা গান্ধী অন্যভূবনের আলো পেলেন। সন্তানের অপরাধ অপেক্ষা অপরাধ স্বীকার করার ধরণ তাঁকে মুগ্ধ করলো। সন্তানের অপরাধ সম্পর্কে পিতা বিস্তারিত জানলেন। চোখ

বন্ধ করে আত্মস্থ হলেন। অবশেষে চোখের জলে বিচারক বাবা অপরাধী সন্তানের বিচার করলেন। বাবা চোখের জলে সন্তানকে বোঝালেন—*"যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় গুরুজনের কাছে নিজের দোষ স্বীকার করে এবং দোষ না করার প্রতিজ্ঞা করে, সে শুদ্ধতম প্রায়শ্চিত্ত করে।"*[৭]

গান্ধীজির স্বেচ্ছায় অপরাধ স্বীকারের চিঠি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মেডিয়েশন। এ' চিঠি সেদিন পিতৃদেবের কাছে গান্ধীজির অবস্থানকে সুদৃঢ় করলো। এ' চিঠিতে পিতা-পুত্রের সম্পর্ক আরও বেশি নিবিড়-ঘনিষ্ঠ হলো। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এ' চিঠির শক্তিতে গান্ধীজি তাঁর পিতৃদেবের নিকট থেকে আরও বেশী মমতাপূর্ণ স্নেহ-ভালোবাসা পেলেন। এ' চিঠি স্বেচ্ছায় লিখিত না হলে পিতা-পুত্রের সম্পর্কে আরও দূরত্ব সৃষ্টি হতো। পিতা-পুত্রের সম্পর্ক সারাজীবনের জন্যে অন্ধকারে হারিয়ে যেত। এ' চিঠি সমস্ত দ্বিধা-সংকোচ-বিভেদ নিমিষে দূর ক'রে দিলো। পিতা-পুত্রের চমৎকার মমত্ববোধ সৃষ্টিতে মধ্যস্থতা করলো। বাবার কাছে সন্তানের লেখা চিঠি দ্বারা সৃষ্ট মধ্যস্থতা এখনও আমাদের আলোকিত করে। গভীর অন্ধকারে চাঁদের স্নিগ্ধ আলোয় আমাদের পথ দেখায়।

মেডিয়েশনে গান্ধীমানস নির্মানে গোখলে

পূর্বেই বলা হয়েছে গান্ধীজির ব্যারিস্টারি পড়ার কারণ। ১৮৮৭ সালে ম্যাট্রিক পাশ করার পর মাভজী দাভে নামের এক বিদ্বান-বিচক্ষণ ব্রাহ্মণের পরামর্শে ১৮৮৮ সালের ৪ সেপ্টেম্বর গান্ধীজি ব্যারিস্টারী পড়ার জন্য লন্ডনের উদ্দেশ্যে বোম্বাই ত্যাগ করেন। লন্ডনে ব্যারিস্টারী পড়া শেষ করে অল্প সময়ের জন্য তিনি ভারতবর্ষে এলেও কাজের হাতছানিতে অবশেষে ১৮৯৩ সালের এপ্রিল মাসে দক্ষিণ আফ্রিকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় শত প্রতিকূল পরিবেশে আইনজীবী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পাশাপাশি সমাজ সংস্কারক হিসেবেও তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। জন্মভূমি ভারতকে সেবা দেবার মহানব্রত নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকাকে তিনি সত্যাগ্রহের লীজতলা হিসেবে বেছে নিলেন। শোষণ-নির্যাতনে জর্জরিত ভারতীয়দের অহিংসভাবে

অধিকার আদায় করার জন্যে গান্ধীজি তাদের উদ্বুদ্ধ করলেন। গান্ধীজির অহিংস আন্দোলনের জন্যে দক্ষিণ আফ্রিকাকে আজ অনেকে তীর্থভূমি হিসেবে চেনেন। প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার বীজতলায় রোপিত সত্যাগ্রহের চারা গান্ধীজি যত্ন-আত্তি করে ভারতবর্ষে এনে বৃক্ষে পরিণত করেন। গান্ধীজির সত্যাগ্রহ আন্দোলনই ভারতকে স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে এনেছিল। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের ভোটের অধিকার নিয়ে আন্দোলন করেছেন। গিরমিটদের উদ্ভূত সমস্যা নিয়ে আন্দোলনের পাশাপাশি আইনি সহায়তা দিয়েছেন। আইনপেশায় শ্বেতাঙ্গদের প্রাধান্যের বিরুদ্ধে লড়েছেন। নানা সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে তিনি অহিংস রীতি-নীতিতে সোচ্চার হয়েছেন। নিজেকে দিনে দিনে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের ত্রাণকর্তা রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্যস্ত থেকেও ভারতবর্ষের অনেক গুণীজ্ঞানী-প্রভাবশালী ব্যক্তির সঙ্গে গভীর যোগাযোগ রাখতেন। নিয়মিত চিঠিপত্র লিখতেন। যোগাযোগের ধারাবাহিকতায় যুক্ত হলেন ভারতবর্ষের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ-শিক্ষাবিদ গোপালকৃষ্ণ গোখলে। গোখলের স্পর্শে এসে গান্ধীজি তাঁর জীবনাদর্শকে আমূল পরিবর্তন করে দিলেন।

১৯০৫ সালে ১৩ জানুয়ারী পন্ডিত গোখলেকে জোহেনসবার্গ থেকে একটি চিঠি লিখলেন গান্ধীজি। চিঠিতে গান্ধাজী লিখলেন দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনি একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করতে চান। সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্য সেবাসহ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করা হবে। সেজন্যে তিনি চিকিৎসা সেবা দেবার কৌশলগুলো জানতে চাইলেন। গান্ধীজি গোখলেকে আরও লিখলেন 'ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন' পত্রিকাটির বিষয়ে। দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থানকালে গান্ধীজির ভাবনার বিষয়গুলোকে উপস্থাপনের জন্যে পণ্ডিত গোখলেকে লেখা চিঠির নির্যাস এখানে তুলে ধরছি:

"আমার এইটিও ইচ্ছা যে যদি আমার উপার্জন চলতে থাকে তাহলে এখানে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করব। বিদ্যালয়টি প্রধানতঃ ভারতীয় সন্তানদের জন্য খোলা হবে। তারা হবে আবাসিক। তবে অন্যরাও এখানে পড়তে পারবে যদি তারা এখানে বাস করতে রাজি হয়। বিদ্যালয়টি হবে প্রথম স্তরের। এর জন্যও স্বেচ্ছাসেবী কর্মী দরকার। এইকাজে জীবনভর সময় দিতে দু-একজন ইংরেজ পুরুষ ও মহিলাকে রাজী করানো সম্ভব। কিন্তু ভারতীয় শিক্ষক পাওয়া একান্ত প্রয়োজন। আপনি কি এমন কোনো স্নাতকদের এই কাজে প্রবৃত্ত করাতে পারেন যাদের শিক্ষকতা করার দিকে ঝোঁক আছে। যাদের চরিত্র নিষ্কলুষ এবং যারা কেবল জীবন ধারণোপযোগী

বেতনে এরই কাজ করবে? যাঁরা এখানে আসবেন তাঁদের ভাল করে পরীক্ষা করে নিতে হবে এবং তাঁরা হবেন প্রথম শ্রেণীর মানুষ। আমি চাই অন্তত দুজন কিংবা তিনজনকে। তবে আরও বেশী হলেও তাঁদের নেওয়া যাবে। আর বিদ্যালয়টি ভালভাবে চলার পর আমার এখানে একটি স্বাস্থ্যনিবাস গড়ে তোলার ইচ্ছা। সেখানে স্বাস্থ্য-বিধি অনুসারে মুক্তাঙ্গনে চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকবে। যাই হোক, আমার অবশ্য লক্ষ্য হল 'ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন' সম্পর্কে। এই বিষয়ে আমি যা বলেছি তা যদি আপনি অনুমোদন করেন তাহলে আপনি এর সম্পাদকের নামে একাজের জন্য একটি উৎসাহিতকরণের চিঠি দেবেন। আর মাঝে মাঝে যত ছোটই হোক কিছু লেখা কি আপনি এর জন্য পাঠাতে পারবেন? আমি এমন পত্রলেখকদেরও পেতে আগ্রহী যাঁরা বিনা পারিশ্রমিকে অথবা দক্ষিণার বিনিময়ে ইংরেজী, গুজরাটি, হিন্দী অথবা তামিল ভাষায় প্রতি সপ্তাহে লেখা পাঠাবেন। তবে তা যদি ব্যয়বহুল হয় তাহলে কেবল ইংরেজি লেখাতেই আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। সেটির তিনটি ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করে নেওয়া হবে।"[৮]

গোখলের জ্ঞান-গরিমা-পান্ডিত্য আর নিখাদ দেশপ্রেম গান্ধীজিকে মুগ্ধ করতো। তিনি বিশ্বাস করতেন গোখলের একান্ত সান্নিধ্য পেলে দক্ষিণ আফ্রিকায় যে ভুলগুলো করেছেন- তা শোধরানোর জন্যে একটা দিক নির্দেশনা পাবেন। তিনি গোখলেকে পরশপাথর মনে ক'রে তাঁর পদতলে নিজের আশ্রয় খুঁজে পেতে চেয়েছেন। তাঁর আরও বিশ্বাস ছিল- গোখলের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা নিয়ে সেই শিক্ষার আলোয় তিনি তাঁর স্বদেশকে আলোকিত করবেন। বিষয়টি আরও স্পষ্ট করতে গোখলেকে লিখা গান্ধীজির চিঠির অংশ বিশেষ:

"মার্চ মাসে যদি একটা মীমাংসা হয়ে যায় তাহলে এপ্রিলে আমি দেশে ফেরার কথা ভাবছি, আমার সঙ্গে সম্ভবত কুড়িজন পুরুষ, মহিলা এবং শিশু থাকবে। এর মধ্যে বিদ্যালয়ের শিশুরাও আছে। তারা আমার সঙ্গে যেতে পারে। আমি জানি না যে আপনি এখনও আমার সারভেন্টস অফ ইন্ডিয়ার কোয়ার্টারে অথবা অন্য কোনভাবে থাকার কথা চান কিনা। আমার পরিবারের লোকজনদের সঙ্গে দেখা করার পরেই তার জন্য আমাকে প্রস্তুত হতে হবে। এমনও হতে পারে যে আমার পরিবারে কোনো কোনো লোক যারা আমার জীবন ও কাজের ভাগীদার হতে চাইবে তারা এই সংখ্যাটি বাড়িয়ে দেবে। সোসাইটির কোয়ার্টারে থাকতে দিতে আপনি বাধ্য- দয়া করে সে কথা যেন মনে করবেন না। আমি সম্পূর্ণরূপে আপনার হাতে, আমি আপনার পায়ের কাছে বসে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চাই।

আমি আপনার পরিচালনাধীন হয়ে যেখানেই থাকি না কেন ভারতবর্ষে পৌঁছবার পর আমি এক বছর অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে মৌনতা অবলম্বন করব। আমি যতটা বুঝেছি মৌনাবলম্বনের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার বিষয়টি যুক্ত নয় এবং যে পরিকল্পে আমরা দুজনে একমত হব সেই পরিকল্প প্রসারে আমি আপনার ইচ্ছানুসারেই তা ভঙ্গ করতে পারি।

আমার বর্তমান উচ্চাকাঙ্ক্ষা আপনি জানেন। তা হলো আপনার সেবক ও পরিচারকরূপে আপনার পাশে থাকা। আমি চাই যাঁকে আমি ভালবাসি এবং শ্রদ্ধা করি তাঁকে মান্য করার প্রকৃত শৃঙ্খলা যেন আমার থাকে। আমি জানি যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় আমি নিজেকে একজন খারাপ সেক্রেটারী রূপে উপস্থিত করেছিলাম। আমি আশা করি যে যদি আমাকে স্বীকার করা হয় তাহলে মাতৃভূমিতে আমি আরও ভালোভাবে কাজ করতে পারব।"(৯)

মহাকালের ডাকে আর সময়ের প্রয়োজনে অবশেষে গান্ধীজির আর্বিভাব হলো ভারতবর্ষে। তিনি ইতোমধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় গিরমিটদের সমস্যা সমাধানে কখনো আন্দোলন করেছেন। কখনো বা আইনজীবী হিসেবে আইনি সহযোগিতা করতে হাত বাড়িয়েছেন। তাঁর আন্দোলন ছিল সর্বতোভাবে অহিংস। গিরমিটসহ দক্ষিণ আফ্রিকায় সমস্যা জর্জরিত মানুষের পাশে থেকে গান্ধীজি তাদের প্রতিকারে নিজেকে শতভাগ উজাড় করেছেন। সমস্যা জর্জরিত মানুষদের সহযোগিতা করার পাশাপাশি তাদের জাগিয়ে তুলতে তিনি নানারকম উদ্যোগ নিয়েছিলেন। গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকায় একুশ বছর অতিবাহিত করার পর ভারতবর্ষে এসে তাঁর অর্জিত জ্ঞান-মেধা কার্যকরভাবে প্রয়োগ করার জন্যে মনস্থির করলেন। তাঁর আগমনের সংবাদে ভারতবর্ষের অনেক নেতা খুশি হলেন। আশায় বুক বাঁধলেন। তাঁরা অপেক্ষা করতে লাগলেন কোন শুভক্ষণে গান্ধীজি ভারতবর্ষে পদার্পন করবেন। দেশমাতার মুক্তির জন্য তাঁর সাথে কাজ করতে তাঁরাও তাঁর সাথে সামিল হবেন। তাঁরা অপেক্ষায় থাকলেন গান্ধীজির মন্ত্রবাণীর সুরে কবে নির্জীব ভারতাবাসী জেগে উঠবে? অবশেষে অপেক্ষার অবসান হলো। ১৯১৫ সালে গান্ধীজি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলে তাঁকে উষ্ণ হৃদয়ে বরণ করতে ছুটে গেলেন গোপালকৃষ্ণ গোখলে, জিন্নাহ সহ আরও অনেক বরেণ্য ও উদীয়মান নেতা।

গান্ধীর চে' বছর আষ্টেক বড় রবীন্দ্রনাথ দিগন্তছেদী দৃষ্টি নিয়ে গান্ধীজিকে উষ্ণ সংবর্ধনা জানাতে তখন ছুটে না এলেও ১৬ আশ্বিন ১৩৪৩ সনে শান্তিনিকেতনে বসে,

'মহাত্মা গান্ধী নামে' একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখলেন। প্রবন্ধটি প্রাসঙ্গিক হওয়ায় তার নির্যাসটুকু তুলে ধরছি—

"সম্প্রতি ইউরোপে স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার একটা চেষ্টা চলেছে। ইতালি এক সময় বিদেশীর কবলে ধিক্কৃত জীবন যাপন করেছিল; তার পরে ইতালির ত্যাগী যাঁরা, যাঁরা বীর, ম্যাজিনি ও গ্যারিবল্ডি, বিদেশীর অধীনতা-জাল থেকে মুক্তিদান করে নিজেদের দেশকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছেন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেও দেখেছি এই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করবার জন্যে কত দুঃখ, কত চেষ্টা, কত সংগ্রাম হয়েছে। মানুষকে মনুষ্যোচিত অধিকার দেবার জন্যে পাশ্চাত্য দেশে কত লোক আপনাদের বলি দিয়েছে। বিভাগ সৃষ্টি করে পরস্পরকে যে অপমান করা হয়, সেটার বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যে আজও বিদ্রোহ চলছে। ও দেশের কাছে জনসাধারণ, সর্বসাধারণ, মানব-গৌরবের অধিকারী; কাজেই রাষ্ট্রতন্ত্রের যাবতীয় অধিকার সর্বসাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। ও দেশের আইনের কাছে ধনী দরিদ্র ব্রাহ্মণ শূদ্রের প্রভেদ নেই। একতাবদ্ধ হয়ে স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার শিক্ষা আমরা পাশ্চাত্যের ইতিহাস থেকে পেয়েছি। সমস্ত ভারতবাসী যাতে আপন দেশকে আপনি নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার পায়, এই যে ইচ্ছে এটা আমরা পশ্চিম থেকে পেয়েছি। এতদিন ধরে আমরা নিজেদের গ্রাম ও প্রতিবাসীদের নিয়ে খণ্ড খণ্ড ভাবে ছোটোখাটো ক্ষুদ্র পরিধির ভিতর কাজ করেছি ও চিন্তা করেছি। গ্রামে জলাশয় ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করে নিজেদের সার্থক মনে করেছি, এবং এই গ্রামকেই আমরা জন্মভূমি বা মাতৃভূমি বলেছি। ভারতকে মাতৃভূমি বলে স্বীকার করার অবকাশ হয়নি। প্রাদেশিকতার জালে জড়িত ও দুর্বলতায় অনুভূত হয়ে আমরা যখন পড়েছিলুম তখন রানাডে, সুরেন্দ্রনাথ, গোখলে প্রমুখ মহদাশয় লোকেরা এলেন জনসাধারণকে গৌরব দান করার জন্যে। তাঁদের আরব্ধ সাধনাকে যিনি প্রবল শক্তিতে দ্রুত বেগে আশ্চর্য সিদ্ধির পথে নিয়ে গেছেন সেই মহাত্মার কথা স্মরণ করতে আমরা আজ এখানে সমবেত হয়েছি— তিনি হচ্ছেন মহাত্ম গান্ধী।

অনেকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন, ইনিই কি প্রথম এলেন। তার পূর্বে কংগ্রেসের ভিতরে কি আরও অনেকে কাজ করেননি। কাজ করেছেন সত্য, কিন্তু তাঁদের নাম করলেই দেখতে পাই যে, কত ম্লান তাঁদের সাহস, কত ক্ষীণ তাঁদের কণ্ঠধ্বনি।"(১০)

৭ আগষ্ট, ১৯০৫ সাল। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে কলকাতা টাউন হলে একটি স্বতঃস্ফূর্ত জনসভা। জনসভায় দেশবরেণ্য নেতৃবৃন্দ বিলেতিপণ্য বর্জনের ডাক

দিলেন। সাথে সাথে স্বদেশী পণ্য উৎপাদন করে তা গ্রহন করার জন্য দেশবাসীকে এগিয়ে আসতে অনুরোধ জানালেন। জনসভায় স্বদেশী চেতনায় উদ্বুদ্ধ কবি-সাহিত্যিকরা অনেক গান-কবিতা রচনা করলেন। রজনীকান্ত সেনের লিখা- 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' গানটি নতুন ক'রে স্বদেশী চেতনার ঢেউ সৃষ্টি করলো। নতুন ক'রে গ্রাম-বাঙলাকে প্লাবিত করলো। বিপ্লবীদের গলায় এ গানটি সেদিন দুঃখিনী মায়ের করুণ আর্তনাদের মতো বেজে উঠলো। গানটি:

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই
দীন-দুঃখিনী মা যে তোদের
তার বেশী আর সাধ্য নাই।
আয়রে আমার মায়ের নামে
এই প্রতিজ্ঞা করবো ভাই
পরের জিনিস কিনব না, যদি
মায়ের ঘরের জিনিস পাই।

মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাবস্থায় স্বদেশ সচেতন ছিলেন। ভারতীয় হিসেবে যেমন ভারতবর্ষের খোঁজ-খবর রাখতেন, তেমনি বিশ্বের নানা প্রান্তের খবর রাখতে কখনো ক্লান্ত হতেন না। তার ধারাবাহিকতায় বঙ্গ বিভাজনে ক্ষুব্ধ বাঙালির বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তিনি ছিলেন পুরোপুরি সচেতন। বঙ্গদেশের দুঃখ-বেদনা-বঞ্চনাসহ সমগ্র ভারতবর্ষের অধিকার, আন্দোলন, সংগ্রাম এবং মানুষের আবেগের জায়গাগুলো তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকেই অনুভব করলেন। এভাবেই রজনীকান্ত সেনের গানটিকে স্বদেশী আন্দোলনের মাঠে তিনি নকশী কাঁথার শৈল্পিক বুননে চমৎকার রূপ দিলেন। এই গানটি গান্ধী পরবর্তীতে বুকে ধারণ ক'রে বিলেতি পণ্য বর্জনের চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে কিছু সাহসী পদক্ষেপ নিলেন। বিদেশী শিক্ষায় শিক্ষিত মহাত্মা গান্ধী চরকা কী তা জানতেন না। পূর্বে কখনও চরকা দেখার সৌভাগ্য পর্যন্ত তাঁর হয়নি। অথচ পরিণত বয়সে এসে চরকার উপর ভর করে বণিক ইংরেজকে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করলেন। বিলেতি পণ্য বর্জন করে চরকায় বোনা কাপড় পড়তে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করলেন। বিদেশ বিভুঁইয়ে দীর্ঘদিন বাস করেও তিনি ভারতমাতার মঙ্গলের জন্যে ত্যাগ স্বীকার করে অবিরামভাবে আন্দোলন-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। পরিণতিতে জনসমাজে গান্ধীজি অন্যান্য নেতাদের থেকে বেশী গ্রহণযোগ্যতা পেলেন।

অতঃপর গান্ধীজির ভারতবর্ষের আগমন অনেকটা Veni, Vidi, Vici। তিনি এলেন, দেখলেন, জয় করলেন। তাঁর আগমন বিশুদ্ধ বায়ু প্রবাহের মতো। তাঁর দৃষ্টিতে জন্মভূমি দেখাটা ছিল নতুন দর্শনতত্ত্বে ঋদ্ধ। আন্দোলনের নতুন ধারা আবিষ্কারের নেশায় বিভোর দার্শনিকের মতো গান্ধীজি নতুন স্বদেশ ভাবনা ছড়িয়ে দিলেন। তিনি যেনো অপ্রতিরোধ্যদিগ্‌বিজয়ী সেনাপতি। তিনি এলেন আশাহীন-দিশাহীন ভারতবর্ষে সম্ভাবনার আলোকরশ্মী ছড়াতে। তিনি এলেন ভারতবাসীর অন্ধকার আত্মায় স্বর্গীয় আলো জ্বেলে দিতে। তিনি এলেন দুর্বিনীত শাসকের ছুটে চলা অন্ধ ক্ষমতার দ্রুতগামী অশ্বকে থামিয়ে দিতে। তিনি এলেন অবচেতন আত্মায় সংস্কারের মশাল জ্বেলে দেশপ্রেমের চেতনাকে শাণিত করতে।

গান্ধীজি ভারতবর্ষের মাটিতে পা রেখেই বুঝতে পারলেন ভারতের আকাশ-বাতাস আগের মত পরিশুদ্ধ নেই। ইতোমধ্যে প্রবেশ করেছে ধর্ম নিয়ে বিভাজনের বৈরী বাতাস। পন্ডিত গোখলে ভারতবর্ষের কোন কাজে সরাসরি সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে গান্ধাজীকে এক বছর অপেক্ষা করতে বলেছেন। গোখলে জানতেন কোন মানুষ যদি দেশ এবং মানুষের কল্যাণে নিজেকে শুদ্ধভাবে সমর্পিত করতে চায় তাহলে তাকে অবশ্যই সময় নিয়ে মা-মাটি-মানুষের কোমল গন্ধ অনুভব করতে হবে। এ কারণে গোখলের পরামর্শে গান্ধীজি একবছর ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ছুটে চললেন। যে প্রান্তে তিনি ছুটে গেছেন-সেই প্রান্তের প্রকৃতি আর মানুষের সাথে তিনি নিবিড় সম্পর্ক তৈরী করলেন। তাদের জীবনযাত্রার সাথে যুক্ত হতে চেষ্টা করলেন। গান্ধীজি প্রান্তজনের জীবনযাত্রায় যুক্ত হতে একবার বেছে নিলেন দাঙ্গা বিধ্বস্ত নোয়াখালীকে। তিনি নিয়মিত ছাগলের দুধ পান করতেন। দুধের প্রয়োজনে নোয়াখালীর আমকিতে লোক পাঠানো হলো। আমকিতে ছাগলের দুধ না পেয়ে কিছু পরিমাণ নারকেলের দুধ নিয়ে আসা হলো তাঁর জন্যে। দেখতে ঠিক দুধের মতো। তবে ছাগলের দুধের চে' একটু পাতলা। 'আমি, জেনে শুনে বিষ করেছি পান। প্রাণের আশা ছেড়ে সঁপেছি প্রাণ'-মন্ত্রে উজ্জীবিত গান্ধীজি প্রান্তজনের সাথে সখ্যতা তৈরি করতে খুশি মনে নারকেলের দুধই পান করলেন। কিছুক্ষণ পর তাঁর শরীর বিদ্রোহ করলো। ঘনঘন জলবৎবাহ্যত্যাগে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এমনকি বাহ্যত্যাগ অন্তে বিছানায় পৌঁছানোর আগেই তিনি ঢলে পড়লেন। প্রিয় নাতনি মনু দেখলেন শীতরাতেও গান্ধীজি ঘামছেন। প্রকৃতি আর প্রান্তজনের সাথে একাকার হতে গান্ধীজি এবার প্রায় জীবন থেকেই বিযুক্ত হতে বসলেন। অনেকের অনেক সেবা-শুশ্রূষায় এবং নিয়তির

জোরে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে এসেও অবশেষে গান্ধীজি জীবনস্পন্দনেই আরও কিছুদিন যুক্ত থাকলেন।

ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে ছুটে বেড়ানো গান্ধী- স্বদেশের প্রকৃতি এবং মানুষের সুপ্ত আত্মাকে অনুভব করতে কল্যাণধর্মী কিছু উদ্যোগ নিলেন। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে গান্ধীজি বিরামহীন ছুটে স্পর্শ করলেন ভারতের সুপ্ত পরিশুদ্ধ আত্মা। অহিংস আন্দোলনে তা জাগিয়ে তুলতে তিনি ক্রমাগত কাজ করে গেছেন কর্মীর মতো। গান্ধীজির আরেকটি বড় বৈশিষ্ট্য তিনি মানুষ এবং পরিবেশকে দ্রুত নিখুঁতভাবে পাঠ করতে পারতেন। গোখলের ইঙ্গিতপূর্ণ নির্দেশ গান্ধীজি শিরোধার্য জ্ঞানে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে এভাবে নিজেকে ঋদ্ধ করলেন।

তোমরা যদি শহীদকে খুন করতে চাও, তাহা হইলে প্রথমে আমাকে খুন কর

নানা প্রতিকূলতায় দক্ষিণ আফ্রিকায় দীর্ঘ একুশ বছর ভারতবাসীর কল্যাণে গান্ধীজি অনেক সংস্কারমূলক কাজ করেন। এজন্যই তাঁর প্রতি ভারতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সুদৃষ্টি ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় অর্জিত জ্ঞান-গরিমা থেকে শিক্ষা নেওয়ার জন্যে এবং গান্ধাজীকে উৎসাহিত করার জন্য একটি সংবর্ধনার আয়োজন করা হলো। অনুষ্ঠানে জিন্নাহ সাহেব সভাপতিত্ব ক'রে ইংরেজীতে বক্তৃতা করলেন। মহাত্মা গান্ধী অনুষ্ঠানের মূল সুরকে অনুধাবন করে অন্যান্যদের মতো ইংরেজীতে বক্তব্য না দিয়ে ভিন্ন পথে হাঁটলেন। তিনি গুজরাটী ভাষায় বক্তব্য দিলেন। সভায় উপস্থিত সকলে অভিভূত হলেন। গুজরাটী ভাষায় ভাষণ দিয়ে তিনি উপস্থিত সবাইকে বোঝালেন গান্ধী গড্ডলিকা প্রবাহে অন্যদের অনুসরণ করার জন্যে ভারতবর্ষে আসেননি। তাঁর চলার পথ ভিন্ন। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সবাইকে তিনি বুঝিয়ে দিলেন সাধারণ মানুষকে অভিভূত করার মত সহজাত ক্ষমতা তিনি রাখেন। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানটি আয়োজন করেছিল মূলতঃ হিন্দু মহাসভা। হিন্দু মহাসভায় মুসলিম হয়েও জিন্নাহ্‌র উপস্থিতি গান্ধী ভিন্ন চোখে দেখলেন এবং গুজরাটী ভাষায় তিনি জিন্নাহকে ধন্যবাদও দিলেন।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে গান্ধী কী কারণে ধর্মতত্ত্ব নিয়ে এলেন তা সে সময় কারও বোধগম্য না হলেও তিনি পরবর্তীতে বোঝালেন- ভারতবর্ষে ভারতীয় মহাজাতি সৃষ্টি করতে হলে আঞ্চলিক ভাষা যেমন পরিহার করা অনুচিত। তেমনি সংখ্যালঘুদের ধর্ম পরিচয়কে ছোট করে দেখারও অবকাশ নেই। ভারতীয় মহাজাতি সৃষ্টি করতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষাগুলোর সমাহারে এবং ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষকে একত্র ক'রে প্রীতিময় সেতুবন্ধ সৃষ্টি করতে হবে। হিন্দু মহাসভার তত্ত্বাবধানে গান্ধীজি সংবর্ধিত হলেও উপস্থিত সকলের ছিল একই সুর, একই তাল-লয়। তাঁরা সকলেই শিক্ষায়-দীক্ষায় ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান। এজন্য তাঁরা বক্তব্য দেওয়ার জন্য শিক্ষিত মানুষের বহুচর্চিত-বলিষ্ঠ ভাষা ইংরেজিকে বেছে নিলেন। বক্তাদের অভিন্ন সুরের ভেতর গান্ধীজি নতুন দুটি সুর যুক্ত করলেন। আবিষ্কার করা গান্ধীজির সুর দু'টির একটি হলো জিন্নাহ্‌কে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান হিসেবে নয়— তাঁকে চিহ্নিত করলেন হিন্দু মহাসভায় একজন মুসলিম হিসেবে। অপরটি হলো অন্যান্য ব্রিটিশ ইন্ডিয়ানের মতো ইংরেজিতে বক্তব্য না দিয়ে গান্ধীজি বেছে নিলেন আঞ্চলিক ভাষা 'গুজরাটী'কে। নিজের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে গান্ধীজি যে সুরে বক্তব্য উপস্থাপন করলেন তা অনেকে বুঝতে না পারলেও আবার অনেকে বুঝতে পারলেন- গান্ধীজি কোন্ সুদূরের ইঙ্গিত দিলেন!

১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজ পরবর্তীতে প্রেসিডেন্সি কলেজ, ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ অতঃপর ১৯১১ সালে রদ এবং ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' সবকিছুই সৃষ্টি করা হয়েছিল বিভাজনের প্রেক্ষাপট সৃষ্টি করার জন্যে। এই বিভাজিত প্রেক্ষাপটে গান্ধীর সংবর্ধনায় জিন্নাহকে ঐক্য-একতার প্রতীক হিসেবে সভাপতি করা হলো। গান্ধীজি ভারতের মাটিতে পা ফেলে জিন্নাহকে ব্যারিস্টার হিসেবে চিনলেন না। গুজরাটী হিসেবে চিনলেন না। সর্বোপরি ব্রিটিশ ভারতীয় নাগরিক হিসেবেও চিনলেন না। তিনি জিন্নাহকে চিনলেন শুধু ধর্ম পরিচয়ে, একজন মুসলিম হিসেবে। সর্বোপরি গুজরাটী ভাষায় বক্তব্য দিয়ে গান্ধীজি জিন্নাহকে ধন্যবাদ দিলেন। পারিষদকে বোঝালেন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীকে সভাপতি করায় তিনি তুষ্ট। তিনি পারিষদকে আরও বোঝালেন তাদের মতো তিনিও বর্তমানের মতো ভবিষ্যতেও ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর সাথে চলতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবেন। গান্ধীজির উদ্দেশ্য ছিল ব্যক্তিজীবনে ধর্মাচারে অভ্যস্ত কোন ভারতীয় যেন সমাজিক জীবনে ধর্মপরিচয়কে প্রাধান্য না দেন। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও আঞ্চলিক ভাষাকে গুরুত্ব দিয়ে তার চর্চা

করতে হবে। তিনি এভাবেই সমগ্র ভারতবর্ষে সংখ্যালঘু ধর্মাবলম্বি এবং সংখ্যালঘু ভাষাভাষিকে একত্র করে ভারতীয় মহাজাতি সৃষ্টি করতে চাইলেন।

ভারতীয় মহাজাতি সৃষ্টির বাসনায় ১৯১৫ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত গান্ধীজি বিভিন্ন কর্মপ্রবাহে ভাসিয়ে দিলেন তাঁর জীবনের প্রতিটি ক্ষণকে। তারপরও তিনি রোধ করতে পারেননি সাম্প্রদায়িক চেতনা। রোধ করতে পারেননি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। রোধ করতে পারেননি দেশভাগ। অদৃশ্য ইশারায় ভারতবর্ষ হেঁটে গেছে বিভাজন-বিভক্তির পথে। দৃশ্যমান ব্যর্থতার ভারে ন্যুব্জ প্রায় অশীতিপর গান্ধীজি অবশেষে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার সময় বেছে নিলেন তাঁর মুখের সেই পরিচিত হাসির শেষ রেখাটুকু। বেছে নিলেন দীর্ঘ জীবনের সমৃদ্ধ অভিধানের শব্দভান্ডার থেকে মাত্র দু'টি শব্দ 'হে রাম'। তাঁর মৃত্যুতে বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে ভেসে এলো শোকগাঁথা। ক্ষয়রোগে প্রায় ক্ষয়ে যাওয়া জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে জিন্নাহ গান্ধীজির মৃত্যুতে লিখলেন—*"He was one of the greatest of the men produced by the Hindu community."*(১১)

গান্ধীজির মৃত্যুও পারলো না জিন্নাহর হৃদয়ের ক্ষতকে মুছে দিতে। ভারতবর্ষের জাতীয় নেতা জিন্নাহ ১৯১৫ সাল থেকে অতি কষ্টে বহন করছেন গান্ধীর দেওয়া তাঁর ধর্মীয় পরিচয়। সেদিন গান্ধী জিন্নাহকে জাতীয়নেতা হিসেবে না দেখে দেখেছিলেন একজন মুসলিম হিসেবে। জিন্নাহ সেদিনের কষ্ট কখনো ভুলতে পারেননি। গান্ধীর মতো মানুষের কাছে অন্য পরিচয় না পেয়ে শুধু ধর্ম পরিচয়ে পরিচিত হয়ে সেদিন থেকে প্রতি মুহূর্তে তিনি রক্তাক্ত হয়েছেন। সেদিন থেকে তিনি নিজেকে অপাঙ্‌ক্তেয় মনে করেছেন। দীর্ঘদিন পর বুঝি তারই প্রতিশোধ নিতে গান্ধীর মৃত্যুতে তিনি শোকগাঁথার পরিবর্তেবলতে পারলেন *"ভারত একজন মহান হিন্দু হারাইল।"*(১২)

১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ হওয়ার ফলে কংগ্রেসের মধ্যে দুটি ধারা সৃষ্টি হলো। একটি উগ্র আরেকটি নম্র। গান্ধীজি ১৯১৫ সালে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করে বুঝতে পারলেন কংগ্রেসের মধ্যে ধারা দুটো অব্যাহত রেখে আন্দোলনে গতি আনা যাবে না। কোন গতিশীল কর্ম পরিকল্পনা করতেও অনেক বেগ পেতে হবে। এক পক্ষ ইতিবাচক সাড়া দিলে অন্য পক্ষ নেতির মিছিলে শামিল হবে। চলার পথে নেতির

মিছিলে আরও নতুন মুখ যুক্ত হওয়ার জন্য এগিয়ে আসবে। বিভাজনের এ ধারা চলতে থাকলে ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজদের তাড়ানো কঠিন। সমস্যা সমাধানে তিনি প্রথমে কংগ্রেসের এ দু'ধারাকে একত্রিত করার জন্যে নতুন কিছু কৌশল আর কর্মপদ্ধতি জনতার সামনে উপস্থাপন করলেন। তিনি প্রচার করলেন যে কোন ত্যাগ স্বীকারে ভারতবর্ষকে ঐক্যবদ্ধ রেখে ঐক্যের ভিত্তিতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সর্বাত্মক লড়াইয়ের বিকল্প নেই। কিন্তু এ সর্বাত্মক লড়াইয়ের ঢেউ সৃষ্টি করতে তিনি লক্ষ্য করলেন ইংরেজ ছত্রছায়ায় সৃষ্ট বিত্তবানগোষ্ঠীর সাথে শ্রমজীবী গোষ্ঠীর যোজন যোজন দূরত্ব। অনেক পরিশ্রম এবং ত্যাগ স্বীকারেও এ দু'গোষ্ঠীর মধ্যে তিনি ঐক্য সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হলেন। সর্বোপরি গোষ্ঠী বিভেদের মধ্যে আবার নতুন ক'রে ভারতবাসীর মনোজগতে প্রবেশ করেছে ধর্মীয় অন্ধত্ব। ধর্মীয় উন্মাদনার মাঝে নিখাদ বৈষ্ণব হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও গান্ধীজি খেলাফৎ আন্দোলনে নিজেকে সম্পৃক্ত করলেন এবং চলমান অসহযোগ আন্দোলনের স্রোতের সঙ্গে গান্ধীজি খেলাফৎ আন্দোলনের স্রোতধারা প্রবাহিত করার চেষ্টা করলেন। গান্ধীর ভাবনাজগতে বিশ্বাস সৃষ্টি হলো- দু'টি ভিন্ন ধারা একত্রিত হলে একই সুর-তাল-লয়ে আন্দোলনে মূর্ছনা উঠবে। দুটি ভিন্ন ধারার মিলনে ভারতের আকাশ-বাতাস আবার ঐকতানে ধন্য হবে। কিন্তু তিনি ব্যর্থ হলেন। তাঁর উর্বর মননে সৃষ্ট অসহযোগ আন্দোলন ছিলো পুরোপুরি ভারতীয় সীমারেখায় বন্দি। অপরদিকে খেলাফৎ আন্দোলন হলো ভারতীয় সীমারেখার বাইরে বহির্দেশীয়। মোদ্দাকথা একটি আন্দোলন হলো সামাজিক জীবন-যাপনে ধর্মকে নিরাপদ দূরত্বে রেখে নিরপেক্ষতার মাপকাঠিতে ব্যক্তি জীবনে ধর্মচর্চা প্রতিষ্ঠিত করা। আর অন্যটির উদ্দেশ্য ধর্মীয় অনুভূতিকে সর্বস্তরে সতেজ রেখে তার পবিত্রতা রক্ষা করার কৌশল। পুরোপুরি বিপরীত ধারার দুটি স্রোতকে গান্ধীজি আপ্রাণ চেষ্টা করেও একসাথে পরিচালিত করতে পারলেন না। পরিণামে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সৃষ্টি না হয়ে তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হলো।

'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সময় গান্ধীজি তাঁর উর্বর চিন্তা শক্তিকে যথার্থ সঞ্চালন ক'রে বৃটিশ লর্ডকে নানাভাবে প্রস্তাব দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করলেন তাঁরা যেন শর্তহীনভাবে ভারত ছেড়ে চলে যায়। ইংরেজরা চলে যাওয়ার পর ভারতের ভবিষ্যত নিয়ে ভারতবাসী নিজেরা সিদ্ধান্ত নেবে। ১৯৪৫-এর ২২ জুন গান্ধীজি প্রাঞ্জলভাষায় বললেন:

'ভাগ যদি করতেই হয় তবে সেটা হোক দু'ভাইয়ের মধ্যে।' দ্বিজাতি তত্ত্বে বিশ্বাস না-করেও দেশভাগ কেমন করে মেনে নিচ্ছেন এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন—

"I agreed on the basis of members of a family desiring severance of the family tie in matters of conflict, but not in all matter so as to become enemies of one another as if there was nothing common between the two except enmity."(১৩)

ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া নিয়ে গান্ধীজি যখন ইংরেজদের সঙ্গে দরকষাকষি করছেন তখন মাউন্টব্যাটেন ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে গান্ধীজিকে বললেন–*"কংগ্রেস তো আপনার সঙ্গে নেই, কংগ্রেস এখন আমার সঙ্গে।"*(১৪) কথাটি মাউন্টব্যাটেন যেভাবেই বলুন না কেন তা আংশিক নয় পুরোপুরি সত্য। গান্ধীজি কংগ্রেসের ময়দান থেকে অনেক আগেই দূরে সরে এলেও শুদ্ধ রাজনীতির অঙ্গনে থেকে তিনি কখনও সরে আসেননি। গান্ধীজি কংগ্রেস থেকে প্রত্যক্ষভাবে বেরিয়ে আসার পর কংগ্রেসের দুই প্রধান কর্তাব্যক্তি হলেন জওহরলাল নেহেরু এবং সর্দার প্যাটেল। প্রয়োজন মনে করলে তাঁরা কখনো-সখনো গান্ধীজির নিকট থেকে দল পরিচালনায় আদেশ-উপদেশ গ্রহণ করতেন।

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ দেশ বিভাজন খুব কাছে থেকে দেখেছেন। তিনি মহাত্মা গান্ধী, পন্ডিত জওহরলাল নেহরু, সর্দার প্যাটেল এবং লর্ড মাউন্ডব্যাটেনের খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। সময়ের প্রয়োজনে কখনো কখনো মৌলানা আজাদ ভারতীয় রাজনীতিতে তিন মহারথির সাথে লর্ড মাউন্ডব্যাটেনের বন্ধনের সেতু নির্মাণে দক্ষ কারিগরের ভূমিকায় থাকতেন। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষকে অবাক করে দেওয়া ভারতবর্ষ বিভাজণের নেপথ্য কুশীলবদের তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন এবং চিনেছেন। 'ভারত স্বাধীন হলো' বই-এ মৌলানা আজাদ তাঁদের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। তাঁর বই থেকে প্রয়োজনীয় নির্যাসটুকু এখানে তুলে ধরা হলো–

"লর্ড মাউন্টব্যাটেন অতি বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁর ভারতীয় সহযোগীদের কার মনে কী আছে ধরতে পারতেন। যে মুহূর্তে তিনি টের পেলেন যে, তাঁর কথা প্যাটেলের মনে দাগ কেটেছে, অমনি তিনি তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব খাটিয়ে আর মন কাড়ার যাদু দিয়ে সর্দারকে দলে ভেড়াতে লেগে গেলেন। ব্যক্তিগত কথাবার্তায় সব সময়ই প্যাটেলকে আখরোট বলে উল্লেখ করতেন - যার বাইরের খোলাটা শক্ত কিন্তু সেটা ভাঙলে ভেতরের

শাঁসটুকু নরম। অনেক সময় হালকা মেজাজে আমাকে তিনি বলতেন, আখরোটের সঙ্গে কথা বলেছেন, আখরোট তাঁর সঙ্গে সব প্রশ্নেই একমত।

সর্দার প্যাটেলকে যখন বোঝানো হয়ে গেল, লর্ড মাউন্টব্যাটেন তখন জওহরলালকে নিয়ে পড়লেন। জওহরলাল প্রথমটায় তাঁর কথায় কান দিতে চান নি এবং দেশবিভাগের কথায় তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছিলেন। লর্ড মাউন্টব্যাটেন লেগে থেকে থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁকে বাগে আনলেন। জওহরলাল ছিলেন দেশবিভাগের ঘোর বিরোধী, কিন্তু লর্ড মাউন্টব্যাটেন আসার একমাসের মধ্যে তার সমর্থক নাও যদি হন, অন্তত মৌনং সম্মতি লক্ষণম্-এর দলে ভিড়ে গেলেন।

আমি অনেক সময় অবাক হয়ে ভেবেছি কিভাবে লর্ড মাউন্টব্যাটেন জওহরলালকে হাত করলেন। জওহরলাল নীতিনিষ্ঠ লোক, কিন্তু সেইসঙ্গে ভাবপ্রবণ এবং বড় বেশি ব্যক্তিগত টানে বাঁধা পড়েন। আমি মনে করি, জওহরলালের ভোল বদলের পেছনে একটা কারণ লেডি মাউন্টব্যাটেনের ব্যক্তিত্ব। ভদ্রমহিলা যেমন অতীব বুদ্ধিমতী তেমনি ভারি মায়াবী আর বন্ধুভাবাপন্ন। তিনি ছিলেন তাঁর স্বামীর খুব গুণগ্রাহী এবং বহুক্ষেত্রে তাঁর স্বামীর সঙ্গে যাদের গোড়ায় মতের অমিল হত তাদের কাছে তিনি স্বামীর বক্তব্য ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেন।"(১৫)

দুই প্রধান কর্তাব্যক্তি জওহরলাল নেহরু ও সর্দার প্যাটেল লর্ডমাউন্টব্যাটেনের বুদ্ধিমত্তার মারপ্যাঁচে আটকা পড়েছেন, গান্ধীজি তা টের পেলেন।গান্ধীজি বুঝতে পারলেন দেশভাগ এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। পরিস্থিতির আলোকে ১ জুন ১৯৪৭-এ তিনি ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ে রোগশয্যা থেকে স্বগতোক্তির মতোবললেন–*"আজ আমি নিঃসঙ্গ বোধ করছি। এমন কি সরদার এবং জওহরলালও মনে করে যে পরিস্থিতি সম্পর্কে আমার বোধটি ভ্রান্ত এবং পার্টিশনই শান্তি আনবে। পুর্ণ প্রতিক্রিয়া এখনই হয়তো বোঝা যাবে না, কিন্তু আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, যে মূল্য আমাদেরকে পরিশোধ করতে হবে তাতে স্বাধীনতার ভবিষ্যত অন্ধকারাচ্ছন্ন।"*(১৬)

জিন্নাহ সাহেব ২৯ জুলাই, ১৯৪৬-এ বোম্বে শহরে অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ কাউন্সিলে ঘোষণা করলেন আগামী ১৬ আগষ্ট ভারতবর্ষ ব্যাপী 'ডাইরেক্ট এ্যাকশন ডে' পালন করা হবে। এদিন সারা পৃথিবী অবাক বিস্ময়ে দেখল ধর্মের নামে মানুষ কতো নিষ্ঠুর হতে পারে। সারা পৃথিবী দেখল অন্ধ ধর্মত্ব কীভাবে অস্বীকার করে প্রীতির বন্ধনকে। কীভাবে অস্বীকার করে মনুষ্যত্ববোধের সামান্যতম

অনুভূতি-সহানুভূতিগুলো। সারা পৃথিবী দেখল ধর্মের নামে কীভাবে পরিচিত মানুষ অপরিচিত হয়ে যায়। শান্তশিষ্ট মানুষ কীভাবে হিংস্র-শ্বাপদ হয়ে ওঠে। ১৯৪৬ এর ১৬ আগষ্ট 'ডাইরেক্ট এ্যাকশন ডে' কত যে ভয়াবহ আকার নিয়েছিল তা বাংলাদেশের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে লিখেছেন:

"আমরা কলেজ স্ট্রিট থেকে বউবাজার হয়ে আবার ইসলামিয়া কলেজে ফিরে এলাম। কলেজের দরজা ও হল খুলে দিলাম। আর যদি আধা ঘন্টা দেরি করে আমরা বউবাজার হয়ে আসতাম তবে আমার ও নূরুদ্দিনের লাশও আর কেউ খুঁজে পেত না। ভাবসাব যে খারাপ আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যখন ফিরে আসি। নূরুদ্দিন আমাকে কলেজে রেখে লীগ অফিসে চলে গেল। বলে গেল, শীঘ্রই ফিরে আসবে।

বেকার হোস্টেল থেকে মাত্র কয়েকজন কর্মী এসে পৌঁছেছে। আমি ওদের সভাকক্ষ খুলে টেবিল চেয়ার ঠিক করতে বললাম। কয়েকজন মুসলিম ছাত্রী মন্নুজান হোস্টেল থেকে ইসলামিয়া কলেজে এসে পৌঁছেছেন। এরা সকলেই মুসলিম ছাত্রলীগের কর্মী ছিলেন। এর মধ্যে হাজেরা বেগম (এখন হাজেরা মাহমুদ আলী), হালিমা খাতুন (এখন নূরুদ্দিন সাহেবের স্ত্রী), জয়নাব বেগম (এখন মিসেস জলিল), সাদেকা বেগম (এখন সাদেকা সামাদ) তাদের নাম আমার মনে আছে। এরা ইসলামিয়া কলেজে পৌঁছার কয়েক মিনিটের মধ্যে দেখা গেল কয়েকজন ছাত্র রক্তাক্ত দেহে কোনোমতে ছুটে এসে ইসলামিয়া কলেজে পৌঁছেছে। কারও পিঠে ছোরার আঘাত, কারও মাথা ফেটে গেছে। কি যে করব কিছুই বুঝতে পারছি না। কারণ, এ জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। মেয়েরা এগিয়ে এসে বললেন, "যারা জখম হয়েছে, তাদের আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেন। পানির বন্দোবস্ত করেন"। কোথায় এরা কাপড় পাবে ব্যান্ডেজ করতে? যার যার ওড়না ছিড়ে, শাড়ি কেটে ব্যান্ডেজ করতে শুরু করল। কাছেই হোস্টেল, তাড়াতাড়ি খবর দিলাম। এদের ব্যান্ডেজ করেই একজন পরিচিত ডাক্তার ছিলেন তাঁর বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে শুরু করলাম।

একজন ছাত্র বলল, দল বেঁধে আসলে হিন্দুরা আক্রমণ করছে না, তবে একজন দু'জন পেলেই আক্রমন করছে। আরও খবর এল, রিপন কলেজে ছাত্ররা পতাকা উত্তোলন করতে গেলে তাদের উপর আক্রমণ হয়েছে।

ইসলামিয়া কলেজের কাছেই সুরেন ব্যানার্জি রোড, তারপরেই ধর্মতলা ও ওয়েলিংটন স্কয়ারের জংশন। এখানে সকলেই প্রায় হিন্দু বাসিন্দা।

আমাদের কাছে খবর এল, ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মসজিদে আক্রমন হয়েছে। ইসলামিয়া কলেজের দিকে হিন্দুরা এগিয়ে আসছে। কয়েকজন ছাত্রকে ছাত্রীদের কাছে রেখে, আমরা চল্লিশ পঞ্চাশজন ছাত্র প্রায় খালি হাতেই ধর্মতলার মোড় পর্যন্ত গেলাম। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা কাকে বলে এ ধারণাও আমার ভাল ছিল না। দেখি শত শত হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক মসজিদ আক্রমন করছে। মৌলভী সাহেব পালিয়ে আসছেন আমাদের দিকে। তাঁর পিছে ছুটে আসছে একদল লোক লাঠি ও তলোয়ার হাতে। পাশেই মুসলমানদের কয়েকটা দোকান ছিল। কয়েকজন লোক কিছু লাঠি নিয়ে আমাদের পাশে দাঁড়াল। আমাদের মধ্যে থেকে কয়েকজন 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' দিতে শুরু করল। দেখতে দেখতে অনেক লোক জমা হয়ে গেল। হিন্দুরা আমাদের সামনা সামনি এসে পড়েছে। বাধা দেওয়া ছাড়া উপায় নাই। ইট পাটকেল যে যা পেল তাই নিয়ে আক্রমনের মোকাবেলা করে গেল। আমরা সব মিলে দেড়শত লোকের বেশী হব না। কে যেন পিছন থেকে এসে আত্মরক্ষার জন্য আমাদের কয়েকখানা লাঠি দিল। এর পূর্বে শুধু ইট দিয়ে মারামারি চলছিল। এর মধ্যে একটা বিরাট শোভাযাত্রা এসে পৌঁছাল। এদের কয়েক জায়গায় বাধা দিয়েছে, রুখতে পারে নাই। তাদের সকলের হাতেই লাঠি। এরা এসে আমাদের সঙ্গে যোগদান করল। কয়েক মিনিটের জন্য হিন্দুরা ফিরে গেল, আমরাও ফিরে এলাম। পুলিশ কয়েকবার এসে এর মধ্যে কাঁদানে গ্যাস ছেড়ে চলে গেছে। পুলিশ টহল দিচ্ছে। এখন সমস্ত কলকাতায় হাতাহাতি মারামারি চলছে। মুসলমানরা মোটেই দাঙ্গার জন্য প্রস্তুত ছিল না, একথা আমি বলতে পারি।

আমরা রওয়ানা করলাম গড়ের মাঠের দিকে। এমনিই আমাদের দেরি হয়ে গেছে। লাখ লাখ লোক সভায় উপস্থিত। কালীঘাট, ভবানীপুর, হ্যারিসন রোড, বড়বাজার সকল জায়গায় শোভাযাত্রার উপর আক্রমন হয়েছে। শহীদ সাহেব বক্তৃতা করলেন এবং তাড়াতাড়ি সকলকে বাড়ি ফিরে যেতে হুকুম দিলেন। কিন্তু যাদের বাড়ি বা মহল্লা হিন্দু এরিয়ার মধ্যে তারা কোথায় যাবে? মুসলিম লীগ অফিস লোকে লোকারণ্য। কলকাতা সিটি মুসলিম লীগ অফিসেরও একই অবস্থা। বহু লোক জাকারিয়া স্ট্রিটে চলে গেল। ওয়েলেসলী, পার্ক সার্কাস, বেনিয়া পুকুর এরিয়া মুসলমানদের এরিয়া বলা চলে। বহু জখম হওয়া লোক এসেছে; তাদের পাঠাতে হয়েছে মেডিকেল কলেজ, ক্যাম্বেল ও ইসলামিক হসপিটালে। মিনিটে মিনিটে টেলিফোন আসছে, শুধু একই কথা, 'আমাদের বাঁচাও, আমরা আটকা পড়ে আছি। রাতেই আমরা ছেলেমেয়ে নিয়ে শেষ হয়ে যাব'। কয়েকজন ফোনের কাছে বসে আছে, শুধু টেলিফোন নাম্বার ও ঠিকানা লিখে রাখবার জন্য। লীগ অফিস রিফিউজি ক্যাম্প হয়ে গেছে, ইসলামিয়া কলেজও খুলে দেওয়া

হয়েছে। কলকাতা মাদ্রাসা যখন খুলতে যাই, তখন দারোয়ান কিছুতেই খুলতে চাইছে না। আমি দৌড়ে প্রিন্সিপাল সাহেবের কাছে গেলে তিনি নিজেই এসে হুকুম দিলেন দরজা খুলে দিতে। আশেপাশে থেকে কিছু লোক কিছু কিছু খবর দিতে লাগল। বেকার হোস্টেল, ইলিয়ট হোস্টেল পূর্বেই ভরে গেছে। এখন চিন্তা হল টেইলর হোস্টেলের ছেলেদের কি করে বাঁচাই। কোন কিছুই জোগাড় হচ্ছে না। কিছু ছাত্র দুপুরে চলে এসেছে। কিছু আটকা পড়েছে। বিল্ডিংটা এমনভাবে ছিল যে, একটা মাত্র গেট। চারপাশে হিন্দু বাড়ি, আগুন দিলে সমস্ত হিন্দু মহল্লা শেষ হয়ে যাবে। রাতে কয়েকবার গেট ভাঙবার চেষ্টা করেছে, পারে নাই। সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে ধরতে পারছি না। ফোন করলেই খবর পাই লালবাজার আছেন। লালবাজার পুলিশ হেডকোর্য়াটার। নূরুদ্দিন অনেক রাতে একটা বড় গাড়ি ও কিছু পুলিশ জোগাড় করে তাদের উদ্ধার করে আনার ব্যবস্থা করেছিল। অনেক হিন্দু তালতলায়, ওয়েলেসলী এরিয়ায় ছিল। তাদের মধ্যে কিছু লোক গোপনে আমাদের সাহায্য চাইল। অনেক কষ্টে কিছু পরিবারকে আমরা হিন্দু এরিয়ায় পাঠাতে সক্ষম হলাম, বিপদ মাথায় নিয়ে। বেকার হোস্টেলের আশেপাশে কিছু কিছু হিন্দু পরিবার ছিল, তাদেরও রক্ষা করা গিয়েছিল। এদের সুরেন ব্যানার্জি রোডে একবার পৌঁছে দিতে পারলেই হয়।

... ...
... ...

কলকাতা শহরে শুধু মরা মানুষের লাশ বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে আছে। মহল্লার পর মহল্লা আগুনে পুড়ে গিয়েছে। এক ভয়াবহ দৃশ্য! মানুষ মানুষকে এইভাবে হত্যা করতে পারে, চিন্তা করতেও ভয় হয়।

... ...
... ...

একটা কথা সত্য, অনেক হিন্দু মুসলমানদের রক্ষা করতে যেয়ে বিপদে পড়েছে। জীবনও হারিয়েছে। আবার অনেক মুসলমান হিন্দু পাড়াপড়শিকে রক্ষা করতে যেয়ে জীবন দিয়েছে। আমি নিজেই এর প্রমাণ পেয়েছি। মুসলিম লীগ অফিসে যেসব টেলিফোন আসত, তার মধ্যে বহু টেলিফোন হিন্দুরাই করেছে। তাদের বাড়িতে মুসলমানদের আশ্রয় দিয়েছে, শীঘ্রই এদের নিয়ে যেতে বলেছে, নতুবা এরাও মরবে, আশ্রিত মুসলমানরাও মরবে।

একদল লোককে দেখেছি দাঙ্গা-হাঙ্গামার ধার ধারে না। দোকান ভাঙছে, লুট করছে, আর কোনো কাজ নাই। একজনকে বাধা দিতে যেয়ে বিপদে পড়েছিলাম। আমাকে আক্রমণ করে বসেছিল। কারফিউ জারি হয়েছে, রাতে কোথাও যাবার উপায় নাই। সন্ধ্যার পরে কোন লোক রাস্তায় বের হলে আর রক্ষা নাই। কোন কথা নাই, দেখামাত্র শুধু গুলি। মিলিটারি গুলি করে মেরে ফেলে দেয়। এমনকি জানালা খোলা থাকলেও গুলি করে। ভোরবেলা দেখা যেত অনেক লোক রাস্তায় গুলি খেয়ে মরে পড়ে আছে। কোনো কথা নেই শুধু গুলি।

... ...
... ...

কলকাতার অবস্থা খুবই ভয়াবহ হয়ে গেছে। মুসলমানরা মুসলমান মহল্লায় চলে এসেছে। হিন্দুরা হিন্দু মহল্লায় চলে গিয়েছে। বন্ধু বান্ধবদের সাথে দেখা করার জায়গা ছিল একমাত্র এ্যাসপ্লানেডে, যাকে আমরা চৌরঙ্গী বলতাম। এখন অবস্থা হয়েছে আরও খারাপ। বেশ কিছুদিন কোনো গোলমাল নাই। হঠাৎ এক জায়গায় সামান্য গোলমাল আর ছোরা মারামারি শুরু হয়ে গেল। শহীদ সাহেব সমস্ত রাতদিন পরিশ্রম করছেন, শান্তি রক্ষা করবার জন্য। কলকাতায় চৌদ্দ-পনের শত পুলিশ বাহিনীর মধ্যে মাত্র পঞ্চাশ-ষাটজন মুসলমান, অফিসারদের অবস্থাও প্রায় সেই রকম। শহীদ সাহেব লীগ সরকার চালাবেন কি করে? তিনি আরও এক হাজার মুসলমানকে পুলিশ বাহিনীতে ভর্তি করতে চাইলে তদানীন্তন ইংরেজ গভর্ণর আপত্তি তুলেছিলেন। শহীদ সাহেব পদত্যাগের হুমকি দিলে তিনি রাজি হন। পাঞ্জাব থেকে যুদ্ধ ফেরত মিলিটারি লোকদের এনে ভর্তি করলেন। এতে ভীষণ হৈচৈ পড়ে গেল। কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার কাগজগুলি হৈচৈ বেশি করল।"[১৭]

বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৪৬ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রত্যক্ষ সাক্ষী। ছাব্বিশ বছর বয়সী শেখ মুজিব 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার যে বিবরণ দিয়েছেন- তা কোন সাহিত্যিকের নয়, কথা শিল্পীর নয়। তাঁর লেখা উঠে এসেছে অগ্নিগর্ভ সময়ের দগ্ধ হাওয়া থেকে, রক্তাক্ত মাঠ-ঘাট-রাজপথ থেকে। তিনি ঘটনাকে নির্মোহভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং ঘটনার প্রয়োজনে নিজের জীবন বিপন্ন করে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা প্রতিহত করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। রাজনীতির তরুন কর্মী শেখ মুজিব সেদিন ধর্মান্ধতার দৃষ্টিতে কোন কাজ করেননি। সব্যসাচির মতো বিপন্ন হিন্দুকে তিনি যেমন

বাঁচিয়েছেন তেমন অসহায় মুসলিমের পাশেও প্রতিরোধের দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়েছেন। সচেতনতায় নির্মোহ থেকে পরবর্তীতে 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে করুণ আর্তনাদে ব্যবচ্ছেদ করেছেন।

বাঙালি সংস্কৃতির তীর্থভূমি এবং দীর্ঘসময় ভারতবর্ষের রাজধানী 'কলকাতা' সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় যখন ক্ষত-বিক্ষত, সাম্প্রদায়িক রক্তের ঢেউয়ে গঙ্গা-মেঘনার জল যখন উদ্বেলিত, তখন যুক্তবাংলার প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী। তিনি কলকাতার জনৈক ইউরোপীয় অফিসারের নিকট থেকে কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব নিয়ে দাঙ্গা দমনে সমস্ত ব্যবস্থা নিজেই পরিচালনা করলেন। দাঙ্গা পীড়িত এলাকার বিপন্ন মানুষ উদ্ধারের সাহায্য চেয়েছে অথচ পায়নি এরকম অভিযোগে প্রাথমিকভাবে তিনি অভিযুক্ত হলেও পরবর্তীতে নিরপেক্ষতার দাঁড়িপাল্লায় তাঁকে অনেকেই এ'অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। ঘটনা প্রবাহ সাক্ষ্য দেয় - সাহায্য চাওয়া মাত্র সামান্য কালক্ষেপন না ক'রে তিনি তাদের উদ্ধার করতে পুলিশ পাঠিয়েছেন। ভারত বিভক্তির মঞ্চ তৈরীর জন্যে সে সময় লর্ড মাউন্টব্যাটনের ছায়াতলে থেকে অনেকেই সোহরাওয়ার্দীর বিরুদ্ধে মিথ্যার বেসাতি ছড়ালো। তাদের মিথ্যাপ্রচার-প্রপাগন্ডায় সোহরাওয়ার্দীর সময়োপযোগী ঐতিহাসিক ভূমিকা কিছুটা হলেও কলঙ্কিত হলো। জ্ঞানপাপী কিছু মানুষ ঘোলাজলে এভাবে মাছ শিকারে সফল হলো। তৃপ্তির ঢেকুর তুললো। কিন্তু সময়ের হাতধরে ছুটে চলা চলমান ইতিহাস কখনও দীর্ঘ সময়ের জন্যে অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে না। প্রকৃতির নিয়মে একসময় মিথ্যা, বানোয়াট, অসত্য কাহিনি ইতিহাসের উজ্জ্বল প্রভায় আপনা-আপনি ম্লান হয়ে যায়।

ভারত বিভক্তির দেড় যুগ পর ১৯৬৫ সালের ৫ ডিসেম্বর, শেখ মুজিব ইতিহাসের চরম সত্য আবিষ্কার ক'রে লিখলেন 'শহীদ চরিত্রের অজানা দিক' প্রবন্ধ। প্রবন্ধটির অংশ বিশেষ—

"কলকাতার রক্তক্ষয়ী দাঙ্গাকে উপলক্ষ ক'রে কেউ কেউ শহীদ চরিত্রে এই কলঙ্ক লেপনের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাদের এ অপপ্রচার যে কত মিথ্যা, তার পরিচয় মহাত্মা গান্ধী নিজেই দিয়ে গিয়েছেন। বিভাগোত্তর যুগে সমগ্র পাক-ভারত উপমহাদেশে যে ব্যক্তির স্কন্ধে ভর করে গান্ধীজি তাঁর সাম্প্রদায়িক শান্তি মিশন চালিয়েছেন, সে ব্যক্তিটি কোনও হিন্দু ছিলেন না, সে ব্যক্তি ছিলেন জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। দিল্লির বিড়লা ভবনে যে আততায়ীর গুলিতে গান্ধীজি নিহত হন, তাদের লক্ষ্য যে শহীদ সাহেবও

ছিলেন, গান্ধী হত্যা মামলার রাজসাক্ষীর সাক্ষ্যেই তার প্রমাণ মিলে। বস্তুত, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রশ্নে গান্ধীজির আন্তরিকতায় যাঁরা বিশ্বাসী, তাঁদের প্রত্যেকেই স্বীকার করবেন যে, সাম্প্রদায়িক শান্তি মিশনে গান্ধীজি যদি কায়া হন, তবে শহীদ সাহেব ছিলেন তাঁর ছায়া।"[১৮]

বাংলাদেশের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোহরাওয়ার্দীকে যে দৃষ্টিতে মূল্যায়ণ করেছেন সমসাময়িক পত্রপত্রিকাগুলো ঠিক তার বিপরীত দৃষ্টিতে মূল্যায়ণ করেছে। ১৯৯০ সালে জয়া চ্যাটার্জীর 'কেম্ব্রিজ ডক্টরাল থিসিস' উপস্থাপনা যা পরবর্তীতে বাঙলা অনুবাদে 'বাঙলা ভাগ হল' নামে প্রকাশিত। তাঁর গবেষণার নির্যাস হচ্ছে—

"এই প্রেক্ষাপটে কুখ্যাত কলকাতা হত্যাযজ্ঞ (Great Calcutta Killing) সংঘটিত হয়। এই দাঙ্গায় কমপক্ষে পাঁচ হাজার লোক নিহত হয় - ঐ দাঙ্গা স্বতঃস্ফূর্ত ও অপরিচিত উন্মত্ত জনতার আক্রমণের ব্যাখ্যাতিরিক্ত হঠাৎ বহিঃপ্রকাশ ছিল না। উভয় পক্ষই যথেষ্ট প্রস্তুতি নিয়ে একে অপরের মুখোমুখি হয়। হত্যাযজ্ঞ শুরু হওয়ার চার দিন পর স্টেটসম্যান পত্রিকা তার পাঠকদের অবহিত করে—

এটা দাঙ্গা নয়। এজন্য প্রয়োজন মধ্যযুগের ইতিহাস থেকে একটা শব্দ খুঁজে আনা—ক্রোধোন্মত্ততা (a fury); তবু 'fury' শব্দটির মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ততা আছে—এই ক্রোধোন্মত্ততাকে নিজের পথ ঠিক করে দেওয়ার জন্য অবশ্যই প্রয়োজন কিছুটা চিন্তা ও সংগঠন। আট ফুট লম্বা লাঠি নিয়ে পঙ্গপালের মতো অসংখ্য লোক (the horde) অন্যকে আঘাত করছিল ও খুন করছিল - ঐসব লাঠি তারা আশপাশের স্থান থেকে কুড়িয়ে পেয়েছে বা তাদের নিজের পকেট থেকে বের করেছে, এ কথা বিশ্বাস করা কষ্টকর।

অন্য একজন প্রত্যক্ষদর্শী কলকাতা হত্যাযজ্ঞকে 'দাঙ্গা' হিসেবে দেখেননি, দেখেছেন 'গৃহযুদ্ধ' হিসেবে—

'উভয় পক্ষ থেকেই ঠাণ্ডা মাথায় মানুষ খুন করা হয়েছে। উভয় পক্ষ থেকেই এ দাঙ্গা ছিল সু-সংগঠিত। সোহরাওয়ার্দী নির্মমভাবে এ দাঙ্গা সংগঠিত করেন এটা দেখানোর জন্য যে, ... (মুসলমানেরা) কলকাতা অধিকারে রাখবে। হিন্দু পক্ষে এটা ছিল বাঙলা ভাগের জন্য লড়াইয়ের একটা অংশ বিশেষ। এর সংগঠকদের মধ্যে ছিল হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেসের সদস্য, বিশেষ করে পুরনো সন্ত্রাসী কংগ্রেস নেতা যারা

কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেয়নি। মাড়োয়ারিরা প্রচুর সাহায্য করেছিল; তারা অর্থ দেয় ও দেশ-বিভাগের আন্দোলনের জন্য তহবিল সংগ্রহ করে। আনুষ্ঠানিকভাবে ঐ আন্দোলন তখন শুরু না হলেও প্রত্যেকে জানত যে, এটা এ জন্যেই করা হয়েছে।

কলকাতা 'ডাইরেক্ট এ্যাকশন ডে' একটা আকস্মিক ঝলকের মতো বিষয় ছিল না, এটা ছিল উদ্ভূত বিভিন্ন ঘটনার ফল যা দীর্ঘদিন থেকে সংকটময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করে রেখেছিল। অংশত এটা ছিল মুসলিম লীগের নেতৃত্ব ও কর্মী-সমর্থকদের ক্রমবর্ধমান ঔদ্ধত্যের পরিণতি, সাম্প্রতিক নির্বাচনে তাদের সাফল্যের উন্মাদনা এবং বাঙলাকে যে কোনো কাঠামোর পাকিস্তান বানানোর ব্যাপারে তাদের ক্ষমতার ওপর দৃঢ় আস্থা; অংশত এটা ছিল তথাকথিত 'মুসলিম স্বেচ্ছাচার'কে প্রতিরোধ করার হিন্দু সংকল্প। এই রক্তক্ষরণের দায়িত্বের অনেকটাই বহন করেন সোহরাওয়ার্দী নিজে; কারণ তিনি হিন্দুদের প্রতি খোলা চ্যালেঞ্জ দেন এবং দাঙ্গা শুরু হওয়া মাত্রই তা দমনে সন্দেহজনক অবহেলার (ইচ্ছাকৃত বা অন্য কারণে) কারণে ব্যর্থ হন। পরিস্থিতি আয়ত্তে আনার পর দেখা যায়, উভয় পক্ষের হাজার হাজার লোক নৃশংসভাবে নিহত হয়েছে। হত্যা শুরু হওয়ার দশ দিন পর এই ভয়ঙ্কর রাতের শহরের (city of dreadful night) ফুটপাতে তিন হাজারের বেশি মৃতদেহ পড়ে থাকে। মৃতদেহ পোড়ানোর জন্য শহরে যে ব্যবস্থা ছিল মৃতদেহের সংখ্যা তার তুলনায় অনেক বেশি ছিল। ফলে মৃতদেহ সংগ্রহ ও তা গণকবরে স্তূপীকৃত করার জন্য সরকারকে নিম্ন শ্রেণীর ডোমদের জড়ো করতে হয়।"[১৯]

মহাত্মাজি বিভক্ত ভারতের রক্তস্নাত মাটিতে দাঁড়িয়ে ভগ্নহৃদয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দমনে সোহরাওয়ার্দীকে কাছে টেনে নিলেন। তিনি জানতেন রাজনীতির ময়দানে সোহরাওয়ার্দী অনেক সংগ্রামের সফল নায়ক। নানা ষড়যন্ত্র অতিক্রম করে রাজনীতিতে টিকে আছেন। তাঁর বিরুদ্ধে যত কুৎসা রটানো হোক না কেনো তিনি তা প্রতিহত করে গণমানুষের হৃদয়ে ভালোবাসার আসন পেতেছেন। ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষে বাঙলায় চল্লিশ লক্ষ লোকের মৃত্যুর জন্য সোহরাওয়ার্দীকে দায়ী করা হয়। যদি এই অভিযোগ সত্য হতো তাহলে প্রশ্ন - বাঙলার মানুষ ১৯৪৬ সালে তাঁকে আবার কেনো প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করলো?

মহাত্মাজি জানতেন ভারতবর্ষে বিশেষ করে বাঙলার এই উত্তাল সময়ে সোহরাওয়ার্দীর বিকল্প কেউ নেই। সম্প্রীতির সৌরভ ছড়াতে গান্ধীজি

সোহরাওয়ার্দীকে কাছে টানলেন। সোহরাওয়ার্দীকে সাথে-পাশে রেখে হিন্দু-মুসলিমের প্রীতিময় সেতুবন্ধ তৈরী করতে চেষ্টা করলেন। তিনি জানতেন সোহরাওয়ার্দী পাশে থাকা অর্থ বাঙালির শুভ বিবেককে পাশে পাওয়া। কলকাতার দাঙ্গা দমনে হিন্দু-মুসলিমকে শান্ত করার জন্যে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় গান্ধীজি স্বউদ্যোগে নিজে এলেন এবং সোহরাওয়ার্দীকে আনলেন। দাঙ্গা দমনে তাঁরা কিছুটা সফলও হলেন। কিন্তু তেমন আশাব্যঞ্জক সাড়া পেলেন না।

গান্ধীজি সম্মোহনীয় ব্যক্তিত্ব দ্বারা অত্যন্ত জটিল সমস্যার সহজ সমাধান বের করতে পারতেন। নানা বিপদ ও বিপর্যয়ের ভেতর দিয়ে গান্ধী সারাজীবন অগ্রসর হয়েছেন সামনের দিকে। চলার পথে কোন দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ দেখতে পেলে তিনি উভয় পক্ষের মধ্যে আলোচনা করে মধ্যস্থতা করতেন। কখনো ব্যর্থ হলে তিনি হতাশায় ভেঙ্গে পরতেন না। 'ভারত ছাড়' আন্দোলন ডাক দেওয়ার পূর্বে নানা ষড়যন্ত্র ও দ্বন্দ্ব ভারতের রাজনৈতিক আকাশে প্রকট আকার ধারণ করলো। বিশেষ করে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের বিরোধ তখন চরম পর্যায়ে। এ অবস্থায় মহাত্মাকে দু'জন আমেরিকান সাংবাদিকের কাছে সাক্ষাৎকার দিতে হয়েছিল। সাক্ষাৎকারে সাংবাদিকদের গান্ধীজি তাঁর অবস্থান পরিষ্কার করলেন এবং বললেন—

"ব্রিটিশকে আমি বলি নি যে ক্ষমতা কংগ্রেস বা হিন্দুদের কাছে হস্তান্তর করতে হবে। ক্ষমতা তারা ঈশ্বর বা আধুনিক পরিভাষায় যাকে নৈরাজ্য বলে তার হাতে অর্পণ করুক। তখন সবগুলো দল মিলে কুকুরের মতো কামড়াকামড়ি করবে অথবা যখন দায়িত্ব বুঝবে তখন যুক্তিসঙ্গত সবঝোতায় পৌঁছবে। আমার আশা বিশৃঙ্খলা থেকে অহিংসা বের হয়ে আসবে।"[২০]

১৯৪২-এ 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে ডাক দিয়ে অনেক প্রতিকূল অবস্থায় পড়েও অসীম সাহসে তিনি তা প্রতিহত করেছেন। কিন্তু ১৯৪৭ এর ১৪ ও ১৫ আগস্টের মধ্যরাতে সদ্য সৃষ্ট পাকিস্তান ও ভারত রাষ্ট্রে হঠাৎ নেমে এলো বিনা মেঘে বজ্রপাত। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় রক্তাক্ত হলো কলকাতা, দিল্লি এবং পাঞ্জাব। ক্ষত-বিক্ষত-বিবর্ণ স্বাদে তিক্ত হলো সদ্য অর্জিত স্বাধীনতার স্বাদ-আহ্লাদ। মানুষ আজন্ম লালিত শুভবোধ হারিয়ে সাম্প্রদায়িক চেতনায় উল্লম্ফন শুরু করলো। তারা ভুলে গেল তাদের সম্প্রীতির ধ্রুপদী ইতিহাস। হিংসা-প্রতিহিংসায় বিশ-ত্রিশ হাজার উন্মত্ত জনতা জঙ্গী মিছিল নিয়ে ছুটে এলো সোহরাওয়ার্দীকে হত্যা করতে। সংখ্যায় এতো বিপুল উন্মত্ত

জনতার সামনে মহাত্মা এবং সোহরাওয়ার্দী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলেন না। তাঁদের চিন্তা জগতে তখন সাহস ভর করলো— যেভাবেই হোক সর্বাগ্রে উন্মত্ত জনতার সাথে তাদের কথা বলতে হবে। তাদের বুঝতে এবং বোঝাতে হবে। সুযোগ সৃষ্টি করে তাদের সাথে সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে হবে। তাঁদের বিশ্বাস ছিল উন্মত্ত জনতা যতই হিংস্র প্রতিশোধের প্রজ্জ্বলিত শিখায় ছুটে আসুক না কেন আলোচনার সুযোগ পেলে সমস্ত ভুল বোঝাবুঝির অবসান হবে। কলকাতার উথাল-পাতাল রাজনীতির সাথে জড়িত সেদিনের তরুণ রাজনৈতিক কর্মী পরবর্তীতে বাংলাদেশের জাতির জনক শেখ মুজিব ১৯৬৪ সালে লিখলেন—

> *"দেশ বিভাগের পর কলকাতায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত থাকার সময় জনাব সোহরাওয়ার্দী গান্ধীজীর সঙ্গে বেলিয়াঘাটার একটি জরাজীর্ণ বাড়িতে অবস্থান করিতেন। তখনও কলকাতার মুসলিম-নিধনযজ্ঞ পুরাদমে চলিতেছিল। একদিন প্রায় বিশ সহস্র লোকের একটি জনতা তাঁহাকে হত্যা করিতে আসিল। কিন্তু ভয় পাওয়ার পাত্র তিনি নন। তাই, তিনিও বুক ফুলাইয়া তাহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'তোমরা যদি আমাকে হত্যা করিতে চাও, তবে এখনই কর। কিন্তু তৎপূর্বে আমাকে এই প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে যে, আমার পরে তোমরা আর কোনও মুসলমানকে হত্যা করিবে না।' সোরগোল শুনিয়া গান্ধীজীও বাহির হইয়া আসিয়া জনাব সোহরাওয়ার্দীর পাশে দাঁড়াইলেন এবং উন্মত্ত জনতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—'তোমরা যদি শহীদকে খুন করিতে চাও, তাহা হইলে প্রথমে আমাকে খুন কর।' একথা জনতার উপর যাদুমন্ত্রের ন্যায় কাজ করিল এবং তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া চলিয়া গেল।"*(২১)

সাহস সঞ্চয় ক'রে মহাত্মা এবং সোহরাওয়ার্দী সেদিন যদি উন্মত্ত জনতার সাথে কথা না বলতেন, আলোচনা না করতেন তাহলে হয়তো উন্মত্ত জনতার চেতনায় শুভবোধ জেগে উঠতো না। তাঁরা হয়তো নির্মম-নিষ্ঠুরতায় হত্যা করতো সোহরাওয়ার্দীকে। হয়তো হত্যা করতো মহাত্মাকে। একটি অথবা দু'টি হত্যার প্রতিশোধে কলকাতা তথা ভারতবর্ষে দাবানলের মতো জ্বলে উঠতো শত-সহস্র জিঘাংসা, শত-সহস্র অপরাধ। সদ্য স্বাধীন ভারতের থানা-কোর্ট-কাচারি ব্যস্ত হয়ে পরতো এই সকল অপরাধ থেকে সৃষ্ট হওয়া মামলা-মোকদ্দমায়।

জীর্ণশীর্ণ শরীরে মহাত্মা সেদিন উন্মত্ত জনতার সাথে একটি বাক্য বিনিময়ে যে সমঝোতা করলেন সেটি হলো মেডিয়েশনের প্রকৃত দীপ্তময় আলো। এ আলোয় সেদিন কলকাতার রাজপথে বিশ হাজার উন্মত্ত-উচ্ছৃঙ্খল জনতা আর একটি অপরাধও করলো না। উন্মত্ত-উচ্ছৃঙ্খল জনতার ছত্রভঙ্গের চেহারায় সেদিন ছত্রভঙ্গ হলো সাম্প্রদায়িক সকল অপরাধ। সেদিন শুধু অসীম শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হলো একটি সাহসী বাক্য— "তোমরা যদি শহীদকে খুন করিতে চাও, তাহা হইলে প্রথমে আমাকে খুন কর।" মহাত্মার এই সাহসী বাক্যটি হচ্ছে মেডিয়েশনের শক্তি।

বিশ হাজার উন্মত্ত জনতাকে মেডিয়েশনের শক্তিতে জয় করতে পারলেও এ জয় ছিল সাময়িক। সর্বোপরি কলকাতার রাজপথ, অলিগলিসহ বিস্তীর্ণ এলাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়াবহতা ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। এমনকি বেলেঘাটা (বেলিয়াঘাটা) বাসভবনে গান্ধীজির অবস্থানকালে ১৯৪৭-এর ৩১ আগস্ট বিক্ষুব্ধ জনতার মাঝ থেকে একটি ইট ছুটে এসেছিল গান্ধীজির দিকে। ছুটে আসা ইট বাঙলার মাটিকে অপবিত্র করতে ব্যর্থ হলো। সামান্যর জন্য গান্ধীজি রক্ষা পেলেন। দাঙ্গা নিরসনে সমঝোতা অথবা শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে নতুন কোন পথ না পেয়ে অবশেষে মহাত্মা বেছে নিলেন তাঁর বহুদিনের চর্চিত শান্তি ও সমঝোতা স্থাপনে অনন্য শক্তির আধার 'অনশন'। স্বাধীন ভারতে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক শান্তি ফেরাতে শুরু হলো মহাত্মার অনশন। জীর্ণশীর্ণ শরীরে এ অনশন তিনি টেনে নিয়ে গেলেন তিয়াত্তর ঘন্টা। গান্ধীজির অনশনে সেদিন কলকাতায় অসাধারণ প্রতিক্রিয়াহলো। মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় শান্তি মিছিলে ছুরিকাঘাতে নিহত হলেন গান্ধীবাদী কর্মী শচীন মিত্র, স্মৃতিশ বন্দোপাধ্যায়, বীরেশ্বর ঘোষ এবং সুশীল দাশগুপ্ত। হঠাৎ শুরু হওয়া দাঙ্গা চারটি অমূল্য জীবনের বিনিময়েহঠাৎই থেমে গেল। বের হলো সম্প্রীতির মিছিল। এ মিছিলে যুক্ত হলো হাজার হাজার চেনা-অচেনা হিন্দু-মুসলিম। ৫০ জনের সাহসী নেতৃত্বে সফলতার দিকে এগিয়ে চললো শান্তির এ মিছিল। ধর্মান্ধ উচ্ছৃঙ্খল জনতা আর মহাত্মার সাথে সমঝোতার জন্যে তারা অবশেষে ৪ সেপ্টেম্বর ছুটে গেলেন বেলেঘাটা বাসভবনে। মহাত্মাকে বললেন— ৩১ আগস্ট গান্ধীভবনে যারা হামলা করেছিল তারা প্রত্যেকেই গান্ধীর কাছে আত্মসমর্পন করবে। গান্ধীজি যে শাস্তি দেবেন তারা মাথা পেতে নেবে। তাদের প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে তারা তাঁকে অনশন ভাঙতে অনুরোধ জানালো। গান্ধীজি সহজে তাদের কথায় অনশন ভাঙলেন না। তিনিবললেন— সারা দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধ হলে

তিনি অনশন ভাঙবেন। গান্ধীজিরতিয়াত্তর ঘন্টার অনশনই অবশেষে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হলো অভিনব মেডিয়েশনের ধারণা। মৃত্যুর সন্নিকটে দাঁড়িয়েও মহাত্মার ঘোষনা হিন্দু-মুসলিমসম্প্রীতিতে না এলে তিনি অনশন চালিয়ে যাবেন।একজন মহামানুষের তিয়াত্তর ঘন্টার অনশনই থামিয়ে দিলো কলকাতার কলঙ্কজনক কালো অধ্যায়। থামিয়ে দিলো হিন্দু-মুসলিমের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। থামিয়ে দিলো ধর্মবিদ্বেষী সকল আয়োজন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেগবান করার জন্যে অনেক কষ্ট-সাধনায় ইতোমধ্যে সংগ্রহ করা অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ সমর্পণ করে অবশেষে তারাও গান্ধীজির নিকট সমর্পিত হলো। মহানায়ক মহাত্মার তিয়াত্তর ঘন্টারঅনশন কলকাতায় আবার ফিরিয়ে আনলো সুখ-শান্তি। কলকাতার বুকে মহাত্মার অনশনের প্রভাবে মুগ্ধ লর্ড মাউন্টব্যাটেন লিখলেন—

> *"In the Punjab we have 55000 soldiers and large-scale rioting on our hands. In Bengal our forces consist of one man, and there is no rioting. As a serving officer, as well as an administrator, may I be allowed to pay my tribute to the One-man Boundary Force."*(২২)

পাঞ্জাবে ৫৫ হাজার সৈন্য দিয়েও দাঙ্গা রোখা যায়নি, একা গান্ধী বাংলায় সেই অসাধ্যসাধন করেছেন। তাই দিল্লির দাঙ্গা থামাতে গান্ধীকে দিল্লি যেতে হল। যাওয়ার বেলায় একটি বাণী চাইলে বাংলায় লিখে দিলেন— "আমার জীবনই আমার বাণী।"

একজন মহাত্মা এবং তাঁর অনশন কলকাতাকে আলোর পথে নিয়ে এলো। থেমে গেল সকল হিংসা-প্রতিহিংসা। ভারত শুধু নয় এখন সারা পৃথিবী মেনে নিয়েছে মহাত্মার অনশনে পৃথিবীর বুকে অনেক ঝগড়া-বিবাদের অবসান হয়েছে। যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে গান্ধীর জন্মের সার্ধশতবর্ষে আমরা কী তাঁর 'অনশন'কে মেডিয়েশনের অপূর্ব আধার ভাবতে পারি?

***

গ্রন্থসহায়:

(১) পৃষ্ঠা: ১৫
জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও জনগণের মুক্তি১৯০৫-৪৭
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
সংহতি

(২) পৃষ্ঠা: xvi
আমার জীবনের আদিকাণ্ড
মোহনদাস করমচন্দ গান্ধী
বঙ্গানুবাদ: আশীষ লাহিড়ী
OXFORD; University Press

(৩) পৃষ্ঠা: ১১
আত্মকথা অথবা সত্যের প্রয়োগ
মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী
ইংরেজী থেকে অনুবাদ সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত
নবজীবন পাবলিশিং হাউস; আমেদাবাদ

(৪) পৃষ্ঠা: ৯৭
মোহনদাস করমচন্দ গান্ধী
বঙ্গানুবাদ: আশীষ লাহিড়ী
প্রাগুক্ত

(৫) পৃষ্ঠা: ৯৮-৯৯
মোহনদাস করমচন্দ গান্ধী
বঙ্গানুবাদ: আশীষ লাহিড়ী
প্রাগুক্ত

(৬) পৃষ্ঠা: ৮-৯
মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী
ইংরেজী থেকে অনুবাদ সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত
প্রাগুক্ত

(৭) পৃষ্ঠা: ২৪
মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী
ইংরেজী থেকে অনুবাদ সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত
গ্রাগুক্ত

(৮) পৃষ্ঠা: ৪-৫
মহাত্মা গান্ধীর নির্বাচিত রচনা *VOL. IV*
মূল সম্পাদক: শ্রীমান নারায়ণ
নবজীবন পাবলিশিং হাউস: আমেদাবাদ

(৯) পৃষ্ঠা: ৬
মূল সম্পাদক: শ্রীমান নারায়ণ
প্রাগুক্ত

(১০) পৃষ্ঠা: ১৯-২০
মহাত্মা গান্ধী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বিভাস

(১১) পৃষ্ঠা: ২৬০
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
প্রাগুক্ত

(১২) পৃষ্ঠা: ২৩৬
আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর
আবুল মনসুর আহমদ
প্রথমা প্রকাশন

(১৩) পৃষ্ঠা: ২১৩
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
প্রাগুক্ত

(১৪) পৃষ্ঠা: ২০৭
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
প্রাগুক্ত

(১৫) পৃষ্ঠা: ১৮০-১৮১
ভারত স্বাধীন হল
মৌলানা আবুল কালাম আজাদ
অনুবাদ: সুভাষ মুখোপাধ্যায়
ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান

(১৬) পৃষ্ঠা: ২০৭
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
প্রাগুক্ত

(১৭) পৃষ্ঠা: ৬৩-৬৮
অসমাপ্ত আত্মজীবনী
শেখ মুজিবুর রহমান
দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড

(১৮) ০৫ ডিসেম্বর, ১৯৬৫
দৈনিক ইত্তেফাক; সোহরাওয়ার্দী সংখ্যা

(১৯) পৃষ্ঠা: ২৭০-৭১
বাঙলা ভাগ হল
হিন্দু সাম্প্রদায়িতা ও দেশ-বিভাগ ১৯৩২-৪৭
জয়া চ্যাটার্জী
দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড

(২০) পৃষ্ঠা: ২১২
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
প্রাগুক্ত

(২১) সূত্র: ইত্তেফাক, সোহরাওয়ার্দী সংখ্যা, মার্চ ১৯৬৪। ১৯৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বরের ইত্তেফাক এ-লেখাটি পুনঃমুদ্রিত হয়।

(২২) পৃষ্ঠা: ১৭০
গান্ধী
কানাইলাল দত্ত
দে'জ পাবলিশিং

শান্তির ললিতবাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস

সব ধর্মই সত্য

গান্ধীজির জন্ম-মৃত্যু-বিয়ের সন-তারিখ কবে, কটা সন্তান হল, গ্রাম-সাকিনের নামসহ বাবা-মা-স্ত্রীর নাম, দক্ষিণ আফ্রিকায় কবে গেলেন, কতদিন দক্ষিণ আফ্রিকায় ছিলেন, ভারতবর্ষে কত বছর বয়সে, কোন্ সনে স্থায়ীভাবে ফিরে এলেন— এসবকিছুই মুখস্ত বলতে পারবেন—এরকম মানুষের সংখ্যা ভারতবর্ষে কম নেই। এমনকী সারা পৃথিবীর নানা প্রান্তেও এরকম অনেক অগুনতি মানুষ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছেন। এখন প্রশ্ন হলো গান্ধীজিকে পরিপূর্ণভাবে অনুধাবন করে তাঁর চেতনাগুলো হৃদয়ে ধারণ করার মতো ক'জন মানুষ আছেন পুরো পৃথিবীতে? কিংবা ভারতবর্ষে?

২০২১ সনে এসে পাহাড়-পর্বত, আকাশ-বাতাস যদি মানুষ নামক অক্সিজেন গ্রহণকারী আর কার্বণডাই-অক্সাইড ত্যাগকারী প্রাণীকে জিজ্ঞেস করে— গান্ধীজি প্রকৃত অর্থে কে ছিলেন? তিনি পৃথিবীতে এসে মানুষের জন্য কী করতে চেয়েছিলেন? মানুষের আত্মাকে বিকশিত করতে তাঁর কী ব্রত ছিল? গান্ধীজি প্রচলিত সত্যের বাইরে এসে প্রকৃত সত্যান্বেষণে শুধু কী সত্যের বিপরীতে "মিথ্যা"-কে জেনেই ক্ষান্ত হয়েছিলেন? নাকি সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে সত্যাগ্রহের মতো দুরূহ অথচ অপূর্ব পৃথিবীতে প্রবেশ

করেছিলেন? নাকি তিনি তাঁর যাপিত জীবনে যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তার মধ্যে কোন অসত্যের বীজ রোপন করেছিলেন?

গান্ধী চেতনায় প্রতিষ্ঠিত আশ্রমগুলো দীর্ঘপথ হেঁটে একবিংশ শতাব্দীতে এসে গান্ধীজিকে কি পূর্ণভাবে অনুধাবন করতে পেরেছে? স্পর্শ করতে পেরেছে কি তাঁর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো? আত্মস্থ করতে পেরেছে কি গান্ধীজির পরিশুদ্ধ—নির্ভেজাল সত্যাগ্রহ'র মর্মবাণীকে? গান্ধী আশ্রমগুলো আজ নিষ্প্রাণ, অস্থিমজ্জা ভঙ্গুর-করুণ, ব্যর্থতার শত পাহাড়ে পরিবেষ্টিত, কোনোরকম দাঁড়িয়ে আছে। আশ্রমগুলোতে নেই কোন গবেষণা। অন্ধকার দূর করতে নেই কোন শুদ্ধ ব্রতের আয়োজন। বিপন্ন মানবতাকে পুনরুজ্জীবিত করতে ভগ্নসদৃশ আশ্রমগুলোতে গান্ধীর চেতনা-সাহস আজ খুবই প্রয়োজন। অন্ধকার এ পৃথিবীতে গান্ধীজির আশ্রমগুলো চেতনার বাতিঘর হলে সারা পৃথিবী আজ আলোকিত হতো। দুঃখজনক হলেও সত্য গান্ধীজির মৃত্যুর পর সময়ের আহ্বানে তাঁর চেতনাপুষ্ট আশ্রমগুলো মানবতার আশ্রম হয়ে আর উঠতে পারেনি। প্রশ্ন হলো, তাহলে কি গান্ধীর জীবনব্যাপী কর্মযজ্ঞ, সমস্ত শুভ উদ্যোগ স্বাভাবিকভাবে শেষ হয়ে গেলো? নাকি তাঁর ত্যাগী আয়োজনগুলোর অপমৃত্যু ঘটলো? গান্ধীজি কী তাহলে মৃত্যুর ৭০-৮০ বছরের মধ্যেই মহাকালের গর্ভে হারিয়ে গেলেন?

১৯১৫ সালে গান্ধীজি ভারতবর্ষে এসে বুঝতে পারলেন ভারতের আকাশ আর স্বচ্ছ নেই। এ আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে সাম্প্রদায়িক হিংসা-বিদ্বেষ। চতুর ইংরেজ তাদের শাসনকালকে আরও প্রলম্বিত করতে বিভিন্ন ধরণের উদ্যোগ নিচ্ছে। কখনও ভূ-রাজনীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কৌশলে ভৌগোলিক অবস্থানকে খন্ড-বিখন্ড করছে। কখনও ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাকে ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত করছে। কখনও ভ্রষ্টনীতির কদর্যতায় ধর্মকে কলুষিত করতে হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলিম, মুসলিমের বিরুদ্ধে হিন্দু অথবা শিখের বিরুদ্ধে জৈন, জৈনের বিরুদ্ধে শিখকে লেলিয়ে দিচ্ছে। ষড়যন্ত্রের এ অন্ধকার সময়ে গান্ধীজি ১৯২৮ এর জানুয়ারীতে ফেডারেশন অব ইন্টারন্যাশনাল ফেলোশীপে নিজের ধর্মপরিচয়কে এভাবে তুলে ধরলেন:

"দীর্ঘকালের চর্চা ও অভিজ্ঞার ফলে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি—

১. সব ধর্মই সত্য

২. সব ধর্মেই কিছু না কিছু ত্রুটি আছে

৩. আমার হিন্দু ধর্ম আমার যত প্রিয়, সকল ধর্মের প্রতিই আমার প্রায় সেইরূপ অনুরাগ। আমার নিজ ধর্মে আমার যেরূপ ভক্তি, অন্য ধর্মের প্রতিও তাই। ফলে, ধর্মান্তরকরণের চিন্তাও আমার পক্ষে অসম্ভব -------- ফলে, 'ঈশ্বর আমাকে যে আলোক দেখিয়েছো অন্যদেরও সেই আলোক দেখাও এ' প্রার্থনা আমাদের নয়। আমাদের প্রার্থনা হওয়া উচিত ঃ 'আত্মার শ্রেষ্ঠ বিকাশের জন্য যে আলোক ও সত্যের সাক্ষাৎ প্রয়োজন তাই সকলকে দাও।"[১]

ভারতবর্ষের দু'জন মানুষ সত্যিকার বিশ্বমানব হতে পেরেছিলেন। তাদের প্রথমজন হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং দ্বিতীয়জন মহাত্মা গান্ধী। ব্যক্তি জীবনে মহাত্মা গান্ধী ছিলেন ত্যাগী-সন্ন্যাসী। তিনি ছিলেন সাধারণ মানুষের কাছেরজন, ঘনিষ্ঠজন। কৃষক-শ্রমিকের শত হতাশায় তিনি ছিলেন নির্ভেজাল আশ্বাসের উৎসমূল। জীবনের প্রায় পুরোসময় তিনি ব্যয় করেছেন মানুষের কল্যাণে।

১৯২৮ সাল। যৌবনের শেষ প্রান্তে গান্ধীজি। দেশি-বিদেশি শিক্ষার স্নিগ্ধ আলোয় দেখতে পেলেন কিছু না কিছু ত্রুটি সব ধর্মেই থাকে। শতভাগ খাঁটি বৈষ্ণব-হিন্দু পরিবারে জন্ম নেওয়া গান্ধীজি ধর্মাচারের হিমালয়ে দাঁড়িয়ে আবিষ্কার করলেন 'সব ধর্মই সত্য'। যাপিত জীবনের সকল স্তরে শতভাগ ধর্মাশ্রয়ী একজন মানুষ হিসেবে গান্ধী ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন— ঈশ্বর তাঁকে যে আলোয় আলোকিত করেছেন সেই আলোয় যেন সবাই আলোকিত না হন। কারণ তাঁর বিশ্বাস তাঁর প্রাপ্য আলোয় অন্ধকারের ছায়া থাকতে পারে। তাই তিনি প্রার্থনা করলেন— আত্মার শ্রেষ্ঠ বিকাশের জন্য যে আলো এবং সত্যের প্রয়োজন তাই যেন ঈশ্বর সকলকে দান করেন।

যাপিত জীবনে হিন্দুত্ববাদে শতভাগ বিশ্বাসী গান্ধীজি মানুষের মুক্তির জন্যে মৌল হিন্দুত্বে কখনো বিশ্বাস রাখতেন না। গান্ধীজি ধর্মাশ্রয়ী অন্ধ মৌলবাদী হলে কখনো বলতে পারতেন না— 'সব ধর্মেই কিছু না কিছু ত্রুটি আছে'। এজন্যেই তিনি তাঁর জীবনকে 'খোলা বই' বলতে পেরেছেন। মূর্খজনের কাছে খোলা বই আর মলাটবদ্ধ বইয়ের কোন পার্থক্য নেই। আসলে গান্ধীর বিপরীতে এখন কে কতো দ্রুত দৌড়াতে পারে- সে প্রতিযোগিতায় সবাই ব্যস্ত। গান্ধীর দিকে ছুটে আসার মানসিকতা থাকলে সকলের ধর্মচিন্তা নিরপেক্ষ হতো। কেউ কখনো বিদ্বেষ বুকে নিয়ে কলুষিত হাতে ধর্মান্ধতার পতাকা উড়াতো না। আজ পৃথিবীর বুক থেকে সর্বাবস্থায় অহিংস বাষ্প হয়ে উড়ে গেছে। সেই বাষ্পায়িত জল কবে শুদ্ধ বাতাসের স্পর্শে এসে মেঘ করবে? কবে বৃষ্টি নামবে? তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই।

প্রথম চোখ ফুটল নোয়াখালিতে

বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন—

প্রথম চোখ ফুটল নোয়াখালিতে। .. ..
প্রথম যে জনপদের নাম জানলুম তা নোয়াখালি .. ..
এমন কোনো পথ ছিল না নোয়াখালির, যাতে হাঁটিনি,
এমন মাঠ ছিল না যা মাড়াইনি
.. .. শহর ছাড়িয়ে, বনের কিনারে, নদীর এবড়োখেবড়ো পাড়িতে .. ..
.. .. নোয়াখালির সর্বস্ব ঐ নদী, নোয়াখালির সর্বনাশ .. ..
.. .. একে তো সমস্ত বাংলাই পাণ্ডববর্জিত, তার উপর বাংলার মধ্যেও অনার্যতর হল বাঙালদেশ, আবার সেই বাঙালদেশেও সবচেয়ে দূর, বিচ্ছিন্ন, মিশ্রিত, অশ্রুত এই নোয়াখালি।
.. .. এতদিনে প্রতিশোধ নিয়েছে নোয়াখালি, ভীষণ প্রতিশোধ; ছড়িয়ে দিয়েছে
তার নাম বড় বড় অক্ষরে, শুধু বাংলার বা ভারতের নয়,

লন্ডন ন্যুয়র্কের খবর-কাগজে, এঁকে দিয়েছে তার নাম
আরক্ত অক্ষরে .. ..
রামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, শ্রীরামপুর .. .. তুচ্ছ ভেবেছি
এই সব না, অতি তুচ্ছ, আর আজ তারা কত বড়, কী
মারাত্মক রকম বড়। .. ..
গান্ধী আজ সেখানে,
আর গান্ধীর চেয়ে বাঞ্ছনীয় আজকের দিনে পৃথিবীতে আর
কী আছে? .. ..

সমস্ত জীবন যিনি স্বদেশের জন্য ক্ষয় করেছেন রাষ্ট্রিক
স্বাধীনতা লাভের চেষ্টায়।
.. .. যে স্বাধীনতার জন্য সমস্ত দেশকে মাতিয়ে
তুলেছিলেন,
তার প্রথমতম সম্ভাবনাতেই হিংসা উঠল উদ্বেল হয়ে।
স্তম্ভিত হয়ে রইলেন কয়েকদিন, তারপর তাঁর যাত্রা শুরু
হল। .. ..
পথের মানুষ আবার পথে নামলেন। ভেঙে দিলেন আশ্রম,
ছেড়ে দিলেন সঙ্গীদের,
.. .. একলা হলেন, মুক্ত হলেন। .. ..
এই তাঁর পূর্ণতা, তাঁর প্রায়শ্চিত্ত, যুধিষ্ঠিরের মত কঠিন,
শোকাচ্ছন্ন নিঃসঙ্গ স্বর্গারোহন।
.. .. তেমন মানুষ কমই আসেন পৃথিবীতে -
তেমনি একজনকে আজ আমরা চোখের উপর দেখছি
বিদীর্ণ বিহ্বল নোয়াখালির
জলে, জঙ্গলে, ধুলোয়।
নম্র হও, নোয়াখালি; পৃথিবী, প্রণাম কর।

বিশুদ্ধ হিন্দুত্ববাদে বিশ্বাসী মহাত্মা গান্ধী হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা সমূলে উৎপাটিত করার মানসে ৭৭-৭৮ বছর বয়সে নোয়াখালীতে এলেন। তিনি নোয়াখালীতে এলেন পথ হারানো উন্মত্ত মানুষকে এবং দাঙ্গায় বিপন্ন মানবতাকে অন্ধকারের অতল থেকে টেনে আলোমুখী করতে। তিনি এলেন আগুনের লেলিহান শিখায় নোয়াখালীর দগ্ধ উঠোনকে গোবর-মাটিতে আবার নিকানো করতে। তিনি এলেন- সন্ধ্যায় শঙ্খধ্বনি আর আজানের সুর একসাথে কোরাসে গাইতে। তিনি এলেন হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির গান

স্নিগ্ধ-নির্মল বাতাসে উড়িয়ে দিতে। তিনি বৃদ্ধ বয়সে, অশক্ত শরীরে 'ভাঙবো তবু মচকাবো না' এমন ধনুক ভাঙা পণে নোয়াখালী এবং ত্রিপুরার ৪১টি গ্রামে খালি পায়ে হাঁটলেন ৫৯ দিন। মৃত্যুর মাত্র ১০ মাস ২৯ দিন আগে তিনি হাঁটলেন ১১৬ মাইল। নোয়াখালীর গ্রাম-গ্রামান্তরে হেঁটে হেঁটে সবাইকে নিয়ে তিনি গেয়েছেন রামধনু—সম্প্রীতির গান:

"রঘুপতি রাঘব রাজারাম।
পতিত পাবন সীতারাম।।
ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম।
সব্‌কো সম্মতি দে ভগবান ।।
যো হি আল্লা সো হি রাম।
সব্‌কো সুমতি দে ভগবান ।।"[২]

এ' গান সবার কণ্ঠে। এ' সুর সবার বুকে। নোয়াখালীর আকাশ-বাতাস, ঢেউতোলা দিগন্তজোড়া ফসলি জমি, ঝিরঝিরে বাতাস, সারি সারি নারকেল-সুপারি বিথীকা সব যেন গাইছে "সব্‌কো সুমতি দে ভগবান"। এগান শুধু রামধনু নয়, এগান সম্প্রীতি-ভালোবাসার রংধনুও বটে। এ' গান গাইতে গাইতে গান্ধীজি আরো দু'টি বিধ্বস্ত গ্রাম দেখলেন। ১৪ নভেম্বর গান্ধীজি আস্তানা গাড়লেন কাজিরখিলে।

"একটি অর্ধবিধ্বস্ত হিন্দুগৃহে, বাড়ির অধিবাসীরা অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। গান্ধিজি সেখানে পর পর তিনদিন সান্ধ্য প্রার্থনায় এই মর্মে বলেছিলেন, গ্রামটির পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে শান্তি চিরবিরাজমান, কিন্তু গ্রামবাসীদের চোখে মুখে শান্তি নেই, দেখছেন শুধু আতঙ্কের ভাব। তাঁর নিজের অন্তরেও তাই নিরন্তর বয়ে চলেছে শোকের ধারা, বাইরের চোখে তা বন্ধ রাখতে সক্ষম হয়েছে, নাহলে অপরের চোখের জল মোছাবেন কিভাবে! গত পঞ্চাশ বছর তাঁর কেটেছে সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করে, বিশ বছর দক্ষিণ আফ্রিকায়, তারপর তিরিশ বছর ভারতে। কিন্তু এখন (স্বাধীনতা লাভের প্রায় মুখে এসে) এ যে গৃহযুদ্ধ, ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই! এ আরও দুঃখদায়ক। 'আমার অভিধানে নৈরাশ্যবাদের স্থান নেই। এখানে চলেছিল হিন্দুনিধন, এখন বিহারে শুরু হয়েছে মুসলিম নিধন, অকারণে নিরীহ বিধর্মীদের প্রাণে মারা। ছেলেবেলায় পড়া

একটি গুজরাটি কবিতার কথা মনে পড়ে – যে তোমার ক্ষতি করে, প্রতিশোধ নাও তার উপকার করে।' নির্মল বসুর 'My Days With Gandhi' বইতে পাই, নোয়াখালিতে গান্ধিজি তাঁকে বলেছিলেন, সব যুদ্ধেই নৃশংসতা আছে ও থাকবে। সেজন্য দাঙ্গায় কজন খুন হলো বা কতগুলি গৃহ ধ্বংস হলো তা জানার চেয়ে বেশি দরকার রাজনৈতিক কি মতলবে এই দাঙ্গা শুরু করানো হয়, কারণ তা থেকেই পাওয়া যাবে এর স্থায়ী প্রতিকার কিভাবে করা যেতে পারে।"(৩)

বিবেক জাগরণে সুমতির ফেরিওয়ালা গান্ধীজি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় কলুষিত নোয়াখালীতে এসে আহত বিবেকে কষ্টের সর্বোচ্চ মার্গে আরোহণ করলেন। তিনি বুঝলেন এবং বোঝানোর চেষ্টা করলেন ১০ অক্টোবর, ১৯৪৬-এর দাঙ্গা দেশকে দু'টুকরো করার অসৎ উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। স্টিরাপ পাম্প দিয়ে পেট্রোল ছড়িয়ে আগুন লাগানো হয়েছে। সামরিক কৌশলে রাস্তাঘাট, সেতু, ডাকঘর নষ্ট করে যোগাযোগ বিছিন্ন করা হয়েছে। বাড়িঘর লুট, হত্যা, অপহরণ, নারী নির্যাতনসহ জোর করে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে অনেককে।

নোয়াখালীতে রাস্তার দু'পাশে ভগ্নস্তূপে দাঁড়িয়ে থাকা সারি সারি হিন্দু এবং মুসলিমকে একহাতে নমস্কার, অন্যহাতে বিরামহীন সালাম দিতে দিতে এগিয়ে যাচ্ছেন গান্ধীজি। এ যেন প্রায় অশীতিপরের অনন্ত পথচলা। কোন্ মুসলিম সালাম নিচ্ছে বা নিচ্ছে না- তাঁর কোন চিন্তা নেই। দলের কোন এক সদস্য বিষয়টি লক্ষ্য করে ক্ষুব্ধ অভিমানী মুসলিমদের বললেন বাপুজি আপনাদের সালাম দিচ্ছেন, আপনারাও বাপুজিকে পাল্টা সালাম দিন। কোন দিকে শান্তির দূত বাপুজির খেয়াল নেই, বিরাম নেই। সব্যসাচীর মতো দু'হাতে নমস্কার-সালাম দিতে দিতে তিনি হাঁটছেন আপন মনে। সুকান্তের 'রানার' মতো তাঁর ছুটে চলা—

রানার চলেছে, রানার!
রাত্রির পথে পথে চলে কোনো নিষেধ জানে না
মানার।
দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছোটে রানার

তাঁর করুণ গভীরদৃষ্টি আর প্রেম-ভালোবাসায় উজাড় করা উন্মুক্ত অন্তর যুদ্ধবিধ্বস্ত নোয়াখালীর শত-সহস্র ক্ষত জায়গায় এক অনুপম অনুভূতি জাগিয়ে তুললো। মনে হলো গান্ধীজির সকাতর দৃষ্টিতে সেদিন নোয়াখালীর ধূলিকণা পর্যন্ত ধন্য হলো।

গান্ধীজির অন্তরাত্মায় মানুষের প্রতি বিশ্বাস ছিল প্রগাঢ়। দুর্বল শরীর তাঁর। হৃদয় কোমল। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে দৃঢ় তাঁর চিত্ত। তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষ কখনও মানুষের ক্ষতি করতে পারে না। হোক সে হিন্দু, হোক সে মুসলিম, হোক সে অন্য ধর্মের। এ বিশ্বাসে আশাবাদী তিনি অবিভক্ত বাঙলায় সাম্প্রদায়িকতাকে সম্প্রীতির বন্ধনে আনতে চেষ্টা করলেন। রাজনীতিতে নোয়াখালীর কালো মেঘ ঢাকা আকাশ, কলুষিত বাতাস, ক্ষত-বিক্ষত মাঠঘাট, রক্তাক্ত মেঠোপথ, কষ্টজর্জরিত মানুষের মন- সবই যেন তাঁর আগমনে নির্মলস্নিগ্ধতার পরশ পেলো। আলোর সন্ধান পেয়ে মরে যাওয়া মনুষ্যত্ব আবার জেগে উঠতে শুরু করলো।

১৯৪৭-এর জানুয়ারির ২ তারিখ থেকে ১ মার্চ পর্যন্ত উনষাট দিন গান্ধীজির নোয়াখালীতে পথচলা। খালি পায়ে হেঁটে হেঁটে দগ্ধ ঘরে, রক্তাক্ত উঠোনে, ভগ্ন অন্তরে হারিয়ে যাওয়া মানবতাকে ফিরিয়ে আনতে শুরু হলো তাঁর মহান কর্মযজ্ঞ। আহার-নিদ্রার নেই কোনো সময়সূচী, বিশ্রামের জন্য নেই কোনো নির্দিষ্ট ঠিকানা। সাম্প্রদায়িকতাকে মাটিচাপা দিতে তাঁর সংগ্রামী সত্তাকে ইতিহাস ইতোপূর্বে কীভাবে মূল্যায়ন করেছে, বর্তমান করছে এবং ভবিষ্যৎ করবে-তা আজও গবেষণার বিষয়। মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে গান্ধীজি তাঁর ক্লান্ত শরীরকে যেভাবে সমর্পণ করলেন তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে এ' অভূতপূর্ব দৃশ্য ইতোপূর্বে কেউ কখনো দেখেছে কিনা তা সন্দেহের ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে।

বংশপরম্পরা সহাবস্থানে বসবাস ভারতবর্ষের কৃষ্টি-সংস্কৃতি। সম্প্রীতিতে বসবাসের মধ্যে সবসময়ই ভারতবাসী খুঁজে পেয়েছেসুখ-শান্তির মনোরম আধার। সুখ-সাগরে নিমজ্জিত মানুষগুলো হঠাৎ বুঝতে পারলো তাদের মধ্যে আর বিশ্বাস বেঁচে নেই। হাজার বছর পাশাপাশি বাস করে

কেউ কারও কাছে আর নিরাপদ নয়। অবিশ্বাস-সন্দেহ ক্রমাগত দানা বাঁধছে। দীর্ঘদিন একসাথে দুঃখ-কষ্ট, ভালোবাসা ভাগাভাগি ক'রে নেওয়া চেনাপড়শিগুলো অচেনা লাগছে। তারা শুধু হিন্দু অথবা মুসলিম হয়ে যাচ্ছে। কেউ আর পড়শি থাকছে না। ধর্ম পরিচয় তাদের নিকট মুখ্য হয়ে উঠলো। আগের মতো প্রফুল্লমনে কৃষ্ণের জমির ফসল মোহাম্মদ আর তার ঘরে তুলে দিচ্ছে না। মোহাম্মদের পুকুরের মাছ জাল দিয়ে ধরে কৃষ্ণ আর সানন্দে মোহাম্মদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে না। এ যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত! হঠাৎই এ কোন্ অধর্মের বেসুর চিৎকারে সবকিছু লন্ডভন্ড হয়ে গেল!

ভারতবর্ষে হাজার বছরের হিন্দু-মুসলিমের সম্প্রীতিপূর্ণ সহাবস্থান পরিহাসের চোরাবালিতে হারিয়ে যেতে বসলো। মনুষ্যত্ববোধ, মমত্ববোধ আর অবশিষ্ট থাকলো না। পারস্পরিক বোঝাপড়া হয়ে গেল এক অলীকবস্তু। হৃদয়ের সাথে হৃদয়ের থাকলো না কোন উষ্ণতা। থাকলো শুধু প্রতিহিংসার দাপাদাপি। রক্তের হোলিখেলায় মেতে উঠলো কিছু ধর্মান্ধ উন্মাদ। রক্তাক্ত হলো ভারতের মাটি। রক্তাক্ত হলো ভারতবাসীর অন্তরাত্মা।

নোয়াখালীর দাঙ্গা রোধে পাঁঠাবলির চাকুতে মেডিয়েশনের জলছাপ

এত বিভীষিকার মধ্যেও মহাত্মা গান্ধী আলোর প্রজ্জ্বলিত মশাল নিয়ে এগিয়ে এলেন। দেখতে পেলেন এক স্বর্গীয় জ্যোতি। নাম তার আব্দুস সালাম। মহাত্মা গান্ধীর আরাধ্য পতাকা তুলে ধরেছেন দৃঢ়চিত্তে। সময়ের স্রোতে এই আব্দুস সালামরা হয়ে ওঠে সাম্প্রতিককালের আন্নাহাজারী। নোয়াখালীর অন্ধকার-অমানিশায় জোনাকীর আলো জ্বালাতে আব্দুস সালাম অনশন শুরু করেছে পঁচিশ দিন আগে। অনশনে সে তখন মৃত্যুর মুখোমুখি। জীবন তাঁর কাছে তুচ্ছ। গান্ধীজি খবর পেয়ে ছুঁটে গেলেন আব্দুস সালামের কাছে। জানতে চাইলেন, তার অনশনের কারণ। আব্দুস সালাম ক্ষীণস্বরে জানালেন তাঁর অনশনে ইংরেজ ভারত ছেড়ে যাবে এমন বিশ্বাস তাঁর নেই। ভারতকে ইংরেজ স্বাধীনতা দেবে এটাও তিনি বিশ্বাস করেন না। একজন

বেকার যুবক চাকরি পাবে এমন সম্ভাবনাও নেই। ভারতবাসী শিক্ষা-দীক্ষায় আকাশ স্পর্শ করবে এমনটিও নয়। তার অনশন মানবতাকে একটু জাগিয়ে দেওয়ার জন্যে। "তার অনশন সিরাজি গ্রামের কালীবাড়িতে পাঁঠাবলির চাকু চুরি করার প্রতিবাদে।"[৪] পাঁঠাবলির চাকু উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত তিনি অনশন চালিয়ে যাবেন। গান্ধীজি উপায়ান্তর না দেখে গ্রামের মুসলমানদের ডাকলেন। বিষয়টি বোঝালেন। ভুল শুধ্‌রে নিলেন তারা। ধর্মান্ধ কিছু মুসলমানের অন্তরে অবশেষে ইসলামের প্রকৃত আলো নতুন করে জ্বলে উঠলো। পাঁঠাবলির চাকু চুরি করা ইসলামের দৃষ্টিতে গর্হিত অপরাধ- তা তাদের অন্তরে বিকশিত হলো। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার সাথে গান্ধী চেতনার সাদৃশ্যতা তারা খুঁজে পেলো। ১৯২৮-এ গান্ধীজি বলেছেন— 'আমার নিজ ধর্মে যেরূপ ভক্তি, অন্য ধর্মের প্রতিও তাই'। মুসলমানরা বুঝতে পারলো, পাঁঠাবলি হিন্দু ধর্মে একটি পবিত্র ধর্মীয় রীতি। পাঁঠাবলির চাকু চুরি ক'রে হিন্দুদের ধর্মীয় রীতিকে বাধাগ্রস্ত করা ইসলাম কখনো সমর্থন করে না। ইসলামের প্রকৃত বিধান না জেনে এটা যে করেছে সে ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধী। প্রকৃত ধর্ম এবং মানবতার মশাল প্রজ্জ্বলিত করে ইসলামের আলো জ্বালাতে একজন আব্দুস সালাম এগিয়ে এসে সেদিন নোয়াখালীর প্রত্যন্ত গ্রামে আলো জ্বেলেছিল।

গান্ধীজি আর আব্দুস সালাম। হিন্দু আর মুসলিম। তাঁদের অন্তঃমিলে সেদিন ভারত আবার সুন্দরের স্বপ্ন দেখতে শুরু করলো। তাঁরা দু'জনই হিন্দু এবং মুসলিমের বন্ধনকে প্রীতিপূর্ণ করতে পাঁঠাবলির চাকু চুরির ঘটনাকে বেশী দূরে যেতে দেননি। সাম্প্রদায়িকতাকে বিনিয়োগ ক'রে হানাহানি বাড়তে দেননি। উদ্ভূত সমস্যার সমাধান করতে সবার সামনে গান্ধীজি লিখিত খসড়া তৈরি করলেন। হিন্দু-মুসলিমের উপস্থিতিতে আপস-মীমাংসায় সমস্যার সুন্দর সমাধান হলো। মেডিয়েশনের অবারিত দরজা-জানালা দিয়ে অশান্ত-অস্থির নোয়াখালীতে সেদিন প্রবেশ করলো হিন্দু-মুসলিমের অপূর্ব সমঝোতা। ধর্মীয় আচরণে প্রতিষ্ঠা পেলো গান্ধীজির অহিংসার বেদিতে অনিন্দ্য-সুন্দর হিন্দু-মুসলিমের আপস-মীমাংসা। পাঁঠাবলির একটি চাকুকে কেন্দ্র ক'রে সেদিন অসংখ্য চাকু যদি সবার হাতে

হাতে থাকতো, একজনের চাকু যদি আরেকজনের প্রাণ সংহারে ব্যবহৃত হতো তাহলে নোয়াখালী, বিহার, কলকাতা, দিল্লি, পাঞ্জাবের দাঙ্গা সমগ্র ভারতকে সারা জীবনের জন্যে গ্রাস করতো।

মেডিয়েশনের স্বপ্ননায়ক মহাত্মার নোয়াখালীতে একখণ্ড জমি

নোয়াখালীর আরেকটি ঘটনা। ১৯৪৭-এর জানুয়ারির ২ তারিখ। বিপন্ন মানুষের গৃহহীন আস্তানায় গগনবিদারী চিৎকার-আহাজারি-আর্তনাদ। গান্ধীজি সব দেখলেন, শুনলেন, অনুভব করলেন। অত:পর সমস্যা সমাধানে সুন্দর পথ আবিষ্কারের জন্যে ধ্যানমগ্ন হলেন। অল্প সময়ের মধ্যে নতুন ক'রে বুঝলেন হিন্দু-মুসলিমের মনোজগৎ। যথারীতি জয় করতেও চেষ্টা করলেন। বিস্তৃত চিন্তার পরিসর উন্মুক্ত করে তিনি নোয়াখালীতে সৃষ্টি করলেন শান্তির ঢেউ। অন্ধের যষ্টির মতো বাপুজিকে পেয়ে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের দাবি বাপুজি নোয়াখালী ছেড়ে যেতে পারবেন না। বাকি জীবন তাঁর নোয়াখালীতেই থাকতে হবে। সুখে-দুঃখে তারা বাপুজিকে কাছে পেতে চাইলো। "নোয়াখালীর দলতা গ্রামের একজন বাপুজিকে নোয়াখালীবন্দি করতে একখন্ড জমি পর্যন্ত দান করলো।"[৫] দাঙ্গা কবলিত নোয়াখালীতে বাপুজি হিন্দুর পক্ষে কথা বললেন না। মুসলিমের পক্ষেও না। তিনি কথা বললেন মানবতার পক্ষে, মানুষের পক্ষে। হিন্দু বা মুসলিমের পক্ষে সেদিন কথা বললে নোয়াখালী চিরদিনের জন্যে নরক যন্ত্রনায় কাতরাতো। কষ্টযন্ত্রণায় ছটফট করতো। গান্ধীজি বিশ্বাস করতেন হিংসা-বিদ্বেষ ছড়াতে অল্পকিছু মানুষই যথেষ্ট। তারাই হানাহানি-হাহাকার-চিৎকার-চ্যাঁচামেচিতে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে। বিপরীতে বেশি সংখ্যক মানুষ শান্তির অন্বেষণে ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত। তারা হাঁটতে চায় সমঝোতা-সম্প্রীতির পথে। নোয়াখালীবাসীও তাই চেয়েছিলো। তারাও কষ্ট-বেদনার মহাসমুদ্রে এক টুকরো শান্তির চর জাগানোর স্বপ্ন দেখলো। স্বপ্ন নির্মাণে বাপুজিকে একখণ্ড জমি উপহার দিয়ে অবুঝ সন্তানের মতো আবদার

করলো— 'বাপুজি আপনি আমাদের ছেড়ে যাবেন না।' বাপুজিও সান্ত্বনার ভাষায় তাদের বললেন— 'নোয়াখালির বিপন্ন সময়ে সবকিছু ছেড়ে আমি বাঙালি হয়ে গেছি।'[৬]

আপসে জাতীয় পতাকা আকাশে না উড়লেও সেদিন উড়েছিল শান্তির পতাকা

৭৭-৭৮ বছর বয়সি বাপুজির অবিরাম ছুটে চলা। ছুটতে ছুটতে ১৯৪৭ এর ২৬ জানুয়ারি তিনি আস্তানা গাড়লেন বাঁংশা গ্রামে। উপযুক্ত জায়গা এ গ্রামে না থাকায় গান্ধী প্রার্থনা সভা করলেন আনাতলী গ্রামে। এ দিন ছিল স্বাধীনতা দিবস (১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারি লাহোরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এ দিনটিকে স্বাধীনতা দিবস হিসেবে উদযাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করে)। সাম্প্রদায়িক বিরোধ এড়াতে এদিন স্বাধীনতা দিবস পালন করলেও এ' গ্রামে কোন জাতীয় পতাকা তোলা হলো না।[৭] জাতীয় পতাকা সংহতির প্রতীক জেনেও তা না উড়িয়ে সেদিন মানুষের অন্তরে উড়ানো হলো শান্তির পতাকা।

কংগ্রেস ২৬ জানুয়ারিকে স্বাধীনতা দিবস ঘোষণা করলেও এ ঘোষণা অনেকে সহজভাবে মেনে নেয়নি। জনসংখ্যার একটি বড় অংশের কাছে জিজ্ঞাস্য ছিল— কিসের ভিত্তিতে কংগ্রেস এদিনটিকে ভারতের স্বাধীনতা দিবস ঘোষণা করলো। কংগ্রেসের ঘোষিত স্বাধীনতা নিয়ে সৃষ্ট হলো ধুম্রজাল। শুরু হলো বিভাজন-বিভক্তি। গান্ধীজি জানতেন ২৬ জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবসে অগ্নিগর্ভ নোয়াখালীতে পতাকা উড়াতে গেলে আবার নতুন ক'রে শুরু হতে পারে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। আবার সৃষ্টি হতে পারে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে থাকা সুযোগসন্ধানী কিছু মানুষ নামের অমানুষের তাণ্ডবলীলা। এজন্যে কংগ্রেস ঘোষিত স্বাধীনতা দিবসে এ এলাকায় পতাকা উড়ানো হলো না। উভয় পক্ষকে নিয়ে তিনি বসলেন।

বিস্তারিত আলাপ-আলোচনায় বেরিয়ে এলো আপস-মীমাংসার একটি সুন্দর-মসৃণ পথ। এপথে হেঁটে তিনি রোধ করলেন নতুন নতুন বিরোধ। রোধ করলেন নোয়াখালীর অগ্নিগর্ভে অপেক্ষায় থাকা সঞ্চিত সকল অশান্তির লেলিহান শিখা। বন্ধ করলেন মামলা-মোকদ্দমা সৃষ্টির নতুন নতুন উৎসমুখ। কংগ্রেস ঘোষিত স্বাধীনতা দিবসে আনুষ্ঠানিক পতাকা না উড়িয়ে সেদিন তিনি উড়ালেন সম্প্রীতির পতাকা। দৃশ্যহীন সম্প্রীতির এ পতাকা সেদিন কেউ নোয়াখালীর আকাশে-বাতাসে উড়তে দেখেনি। সম্প্রীতির এ পতাকা সেদিন শুধু উড়েছিল নোয়াখালীবাসীর পরিশুদ্ধ অন্তরে অন্তরে।

বিবাদ ঘটিলে পঞ্চায়েতের বলে গরিব কাঙ্গালে বিচার পাইতাম

দু'জন মুসলিমের বাড়িতে বিশ্রাম নিয়ে আলোর পথ ধরে ৩১ জানুয়ারি, ১৯৪৭-এ নবগ্রামে নক্ষত্র ভৌমিকের বাড়িতে গান্ধীজি পৌঁছালেন। 'শত্রুকে মিত্রে পরিণত করাই আমার ব্রত'-এ বিশ্বাসে এদিন মেয়েদের নিয়ে পৃথক সভা করেন গান্ধীজি। গ্রামের একজন সহজ-সরল মেয়ের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এলো একটি সরল প্রশ্ন— 'দুর্জন আমাদের আক্রমণ করলে আমরা কী করবো?' বাপুজির সময়োপযোগী তাৎক্ষণিক সাহসী উত্তর- 'ভীরুতা প্রদর্শন অপেক্ষা হিংসার পথই গ্রহনীয়'।[৮]

ইতিহাসের পাতায় আর একটি দিন স্বর্ণখোচিত জ্বলজ্বলে। দিনটি ছিল ১৯৪৬-এর ফেব্রুয়ারি মাসের ১৭ তারিখ। এ' দিন গান্ধীজি দেবীপুরে, রাজকুমার শীলের বাড়িতে। দিনের প্রার্থনা সভায় শেরে বাংলাখ্যাত ফজলুল হকসহ আরও অনেক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। গান্ধীজিকে ঘিরে শত তারকার ভিড়ে সন্ধ্যায় এলেন এক পীর সাহেব। সাধুবাদ পাওয়ার প্রত্যাশায় গান্ধীজিকে তিনি সানন্দে জানালেন, অনেক হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করে তিনি প্রাণে বাঁচিয়েছেন। তারা এখন নয়া মুসলিম। পীর সাহেবের কথা শুনে গান্ধীজি আকাশ থেকে পড়লেন। অবাক বিস্ময়ে বললেন: 'মান রক্ষার জন্য প্রাণ দেবার শিক্ষা দিলে ধর্ম গুরুর উপযুক্ত কাজ হতো'। পীর সাহেব

উত্তরে বললেন—'প্রাণ রক্ষার জন্য মিথ্যার আশ্রয় লওয়ায় কোন দোষ নেই।' পীরের উত্তরে বাপুজি কষ্ট পেলেন। সারাজীবনের কষ্ট সাধনায় গড়া ধর্মচিন্তা মুহূর্তেই কেঁপে উঠলো। পীর সাহেবের উত্তরের প্রতিউত্তরে উত্তেজিত বাপুজি বললেন—"ঈশ্বরের সহিত কখনও সাক্ষাৎ হবে কি না জানি না। কিন্তু যদি হয় তো তাঁকে জিজ্ঞাসা করব আপনার মত মানুষকে তিনি ধর্মগুরু করলেন কেন?"[৯]

বিভাজন আর সংঘাতের এরকম অনেক আয়োজন শেষে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে সারাবিশ্বকে ইংরেজ জানালো প্রায় দু'শো বছর তারা ভারতবর্ষ শুধু শাসন করেনি। এই দীর্ঘ সময় তারা ভারতীয়দের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করেছে। তাদের শাসনামলে ধর্মের নামে কুসংস্কার দূর হয়েছে। অশিক্ষা-কুশিক্ষায় জর্জরিত একটি জাতিকে আলোর ধারায় আনতে তারা অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছে। এ প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে তারা আজ প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত। তারা এখন উদারভাবে মুক্তচিন্তায় তাদের সমাজকে নতুন করে নির্মাণ করতে শিখেছে। ইংরেজ ঢাক-ঢোল পিটিয়ে আরও প্রচার করলো তাদের শাসনামলে ভারতবাসী নির্মোহভাবে ধর্মান্ধতা থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। তারা বিলুপ্ত সতীদাহ প্রথা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেনে নিয়েছে। সমাজের নানা প্রতিবন্ধকতা ডিঙ্গিয়ে বিধবা হিন্দু নারীকে বিয়ে করে তারা প্রমাণ করেছে ভারতবর্ষে ধর্মান্ধতার অবসান হয়েছে। সর্বোপরি ১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত ভারত উপমহাদেশে ইংরেজ একটি কার্যকর আইনি ব্যবস্থা গড়ে তুলে ভারতবাসীর সামাজিক জীবনে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করেছে। ইংরেজ শাসনামলে বিষয়-সম্পত্তিসহ মান-সম্মান রক্ষার জন্যেও আইন প্রনয়ণ করা হয়েছে। ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক ক্ষেত্রে স্ব স্ব ধর্মানুযায়ী আইন প্রনয়ণ করে তাদের ধর্মীয় রীতিকেও প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

তৃপ্তির ঢেকুর তুলে ইংরেজ যখন ভারতবর্ষ ছেড়ে যাচ্ছে তখনই দেশের নানা প্রান্তে শুরু হলো দাঙ্গা। দাঙ্গা দমনে ছুটে এলেন গান্ধীজি। তিনি কখনও কলকাতায়, কখনও নোয়াখালীতে, কখনও বিহারে, কখনো বা দিল্লিতে। গান্ধীজির মতো আরও দশ-পাঁচটা মহাত্মার জন্ম হলে হয়তো

ভারতবর্ষে আর যাই হোক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হতো না। গান্ধীজির প্রাণান্তকর চেষ্টায় নোয়াখালীতে বন্ধ হলো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। বন্ধ হলো কলকাতাতে, বন্ধ হলো দিল্লিতেও।

ইংরেজ তাড়াতে ভারতবাসীর একশো নব্বই বছরের দীর্ঘ লড়াই। ১৯৪৬ সালে এসে এ'লড়াই অবশেষে আর ইংরেজের বিরুদ্ধে থাকলো না। এ'লড়াই শুরু হলো ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাইয়ের, স্বজনের বিরুদ্ধে স্বজনের, পড়শির বিরুদ্ধে পড়শির। অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস; এতদিন ইংরেজ ভয়ে ছিল কখন যেন ভারতের মাটিতে ভারতের জনগণ তাদের বিচার করবে। ভারত বিভাজনের পূর্ব মুহূর্তে গণেশ উল্টে গেলো। ১৯৪৭ সালে দেখা গেল ইংরেজই বিচার করছে আত্মকলহ লিপ্ত ভারতবাসীর। প্রাণের ভয়ে তারা ধর্মকে জলাঞ্জলি দিচ্ছে। তারা বিশ্বাস করতে শুরু করলো ধর্মের চেয়ে প্রাণ বড়। প্রাণের চেয়ে ধর্ম নয়। ধর্মের দোহাই দিয়ে বিধর্মীর বিষয়-সম্পত্তি লুট করতে তারা ব্যস্ত হয়ে পড়লো। মান-সম্মান-সম্ভ্রম ছিনিয়ে নিলো। অনেক ক্ষেত্রে কেউ কেউ মামলা-মোকদ্দমা করার সাহসও পেলো না। দু'একটা মামলা হলেও ঘটনার সাক্ষী দিতে এসে সবাই সাক্ষীগোপালের ভূমিকায় চলে গেল।

গান্ধীজি বেঁচে থাকার এরকম প্রচেষ্টাতে ভীষণ কষ্ট পেলেন। সৃষ্টিকর্তার কাছে পীর সাহেবের বিরুদ্ধে নালিশ করবেন এ মনোভাবও ব্যক্ত করলেন। গান্ধীজি জীবদ্দশায় পীর সাহেবের বিরুদ্ধে নালিশ করতে সৃষ্টিকর্তার দেখা না পেয়ে–অবশেষে কিছুদিনের মধ্যেই 'হে রাম' শব্দ দুটো উচ্চারণ করতে করতে সৃষ্টিকর্তার কাছে চলে গেলেন চিরদিনের জন্যে। গান্ধীজি কি জীবনের ওপারে সৃষ্টিকর্তার সাক্ষাৎ পেয়েছেন? পীরের বিরুদ্ধে নালিশ করেছেন? ১৯৪৬-এ ধর্মান্তরের অপরাধ পীর করেছিল ঠিকই কিন্তু সেই পীরের অপকর্মের তো বিচার হলো না! সত্যি সত্যিই তার অপকর্মের বিচার হলে ১৯৭১-এ একজন সম্মানিত বিচারককে এফিডেভিট করতে হতো না। এফিডেভিটে শ্রী দীনেশচন্দ্র দেবনাথকে নও মুসলিম হয়ে আব্দুল লতিফ সাজতে হতো না। সনাতনী ধর্মে শতভাগ বিশ্বাসী স্ত্রী বেনু দেবনাথকে সুফিয়া, মেয়ে কৃষ্ণাকে হাসিনা নাম নিয়ে দুঃসহ সময় পাড়ি দিতে হতো না।

ধর্মান্ধতা সবসময়ই ধর্মান্ধতা। ১৯৪৭-এ যেমন ধর্মান্ধতাকে রোধ করা যায়নি। একাত্তরও ব্যর্থ হলো ধর্মান্ধতা রোধ করতে। ১৯৪৬-৪৭ এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা টর্নেডোর ভয়াবহতা নিয়ে আরও বেশি শক্তিতে ১৯৭১-এর বুকে আঘাত করলো।

জজিয়তির চাকরি ছেড়ে স্বাধীনদেশে দেবনাথ মহোদয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন অনুষদে অনার্স এবং মাস্টার্স-এ আইন শাস্ত্রের অনেক দুর্ভেদ্য বিষয় অতি সহজ করে ছাত্রদের পড়িয়েছেন। ছাত্রপ্রিয় শিক্ষক প্রায়ই শ্রেণিকক্ষে ছাত্রদের ৭১-এর স্মৃতি রোমন্থন করতেন। নস্টালজিয়ায় কাতর শিক্ষক মহোদয় ছাত্রদের শোনাতেন '৭১ এর অনেক ঘটনা, অনেক কাহিনি। তিনি জানতেন ছাত্রদের কাছে বলা কাহিনিগুলো একদিন হারিয়ে যাবে, মুখে মুখে বেশিদিন বেঁচে থাকবে না। ৭১-এর ঘটনাগুলো চিরদিনের জন্যে স্মরণীয় রাখতে তিনি বেছে নিলেন কাগজ-কলম। অবশেষে তাঁর লিখা 'কত কথা কত স্মৃতি'তে তিনি লিখেছেন—

"ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলো থেকে আমার অফিস পাঁচ মিনিটের পথ। এ পথেই ঠিক করে ফেললাম মুসলিম হয়ে বাঁচবার শেষ চেষ্টা নেবো, তাতেও যদি রক্ষা না পাই, তবে যা হবার তাই হবে। চেম্বারে এসে তাদের জানালাম, অনেকেই এ বিপদে মুসলিম হয়ে বাঁচবার পথ বেছে নিয়েছে, পালাবার পথ আর নেই, আমিও মুসলিম হয়ে তাদের মতো বাঁচতে চাই। প্রস্তাবটি শুনে তাদের কেউ কেউ বলে উঠলেন, স্যার, আমরা এ সম্বন্ধে কিছুই বলতে পারবো না। এভাবে মুসলিম হওয়া ইসলাম ধর্ম সমর্থন করে না, তবে আপনি যদি স্বেচ্ছায় মুসলিম হয়ে বাঁচতে চান, তবে আমরা আপনার জীবনের জন্য শেষ চেষ্টা করে দেখবো। আমি বলেছিলাম, দেখুন মুসলিম হলেই আমি রেহাই পাবো তা মনে হয় না। আপনারা সবাই আমাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য উৎকণ্ঠিত, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আমি যে মুসলিম হয়ে বাঁচতে চাই-এ সংবাদটা নিয়ে আপনাদের ক্যান্টনমেন্টে যেতে হবে। কথা বলে দেখবেন সেনা অফিসাররা কী বলেন, যদি বলেন, এসব স্রেফ ধোঁকাবাজি, তবে আপনাদের আমার জন্য কিছু ওকালতি করে

তাদের মন নরম করতে চেষ্টা করবেন, তাতেও যদি কোনো কাজ না হয়, তবে আমার জন্য আপনাদের আর কোনো দায়িত্ব থাকবে না। পরের চিন্তা আমি নিজেই করব। এ কথা শুনে তাঁদের কয়েকজন চলে গেলেন ক্যান্টনমেন্টে, ফিরে এলেন প্রায় দেড় ঘন্টা পর। ফিরে এসে বললেন, স্যার, আপনি এখনো বেঁচে আছেন শুনে সেনা অফিসার চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠেন, বলেন কী? সাব-জজ সাহেব বেঁচে আছেন? অসম্ভব! গত রাতে যে ৪০ জনকে মারা হয়েছে সে লিস্টের এক নম্বরে সাব-জজ সাহেব। গত রাতে Killing Party সেই ৪০ জনকে মেরে রিপোর্ট দিয়ে গেছে। আর আপনারা বলছেন তিনি বেঁচে আছেন, মুসলিম হয়ে বাঁচতে চান। তাজ্জব ব্যাপার। স্যার, এক্ষুনি তাঁর সঙ্গে আমরা চেম্বারে কথা বলে এসেছি।

'দেখুন এভাবে ধর্মান্তর কোনো ধর্মান্তর নয়, এটা স্রেফ ধোঁকাবাজি, বাঁচবার একটা কৌশলমাত্র। তিনি মুসলিম হবেন কী হিন্দু থাকবেন এসব আমি ভাবছি না, ভাবছি এভাবে তিনি বাঁচলেন কী করে? এভাবে কেউ বাঁচে না, তবু বেঁচে গেছেন, তখন মনে হয় Allah desires that he should live, let him live. কিন্তু বাঁচতে চাইলেই তো বাঁচবে না। আমাদের Killing Party এখন গ্রামে, রাতে ফিরবার কথা। তারা যদি শহরে পা দিয়ে শোনে যে সাব-জজ সাহেব মরেননি, তবে তক্ষুনি তার পরিবারের সবাইকে শেষ করে ক্যান্টনমেন্ট ফিরবে। কেউ তাদের ঠেকাতে পারবে না। আপনারা চলে যান। সাব-জজ সাহেবকে গিয়ে বলুন, তিনি যেন এক্ষুনি বাসায় চলে যান আর বাসার দরজা জানালা বন্ধ করে বসে থাকেন। বিকেল চারটার সময় দুজন আর্মি তাঁর পাহারায় যাবে, তারা রাত দশটা পর্যন্ত থাকবে, পরে অন্য দুজন ভোর পর্যন্ত থাকবে। তাদের কাছে আমার অর্ডার দেয়া থাকবে, Killing Party এলে সে অর্ডার দেখিয়ে তাদের ঠেকাবে।

... ...

তারপর থেকে দু-তিন দিন হিন্দু থেকেই কোর্ট করেছি কিন্তু সমস্যাটি রয়েই গেলো। হিন্দু থেকে যাবো, না মুসলিম হয়ে যাবো—এ সমস্যা। স্থানীয় মুসলিম প্রধানদের ইচ্ছে নয় যে, আমি মুসলিম হয়ে যাই, তবে বাঁচবার জন্য যদি একান্তই মুসলিম হওয়া

আবশ্যক হয়ে পড়ে, তবে তাতেও তাঁদের কোনো আপত্তি নেই, যে কোনো ভাবে আমি যেন বেঁচে যাই—এটাই তাঁরা চান। আর্মি অফিসার বলে দিয়েছে, আল্লার ইচ্ছে আমাকে বাঁচিয়ে রাখার, তাই বেঁচে গেলাম। আমি হিন্দু হয়ে থাকবো কী মুসলিম হয়ে থাকবো এটা তাদের বিবেচনার মধ্যে নেই। বোঝা গেল, এ অফিসারের কাছ থেকে আমার আর বিপদের সম্ভাবনা নেই। সর্বাধিনায়ক নিয়াজীর আদেশ শহরের হিন্দুদের খতম করবে ক্যান্টনমেন্টের সৈন্যরা। এ আদেশটি তখনও বলবৎ আছে। অফিসাররা সবসময় বদলি হয়। অন্য একজন অফিসার এসে যদি বলে, Allah desires that he should die, let him die. তখন তাকে ঠেকাবে কে? এ অবস্থায় কি অনিশ্চয়তার মধ্যে বসে থাকা উচিত? বোকামি তো অনেক করেছি, আর কত? স্রষ্টা আমাদের বুদ্ধি দিয়েছেন সৃষ্টির কল্যাণে খাটাবার জন্য, আর অন্যের ক্ষতি না করে নিজের আত্মরক্ষার জন্য। এ বুদ্ধিকে নিষ্ক্রিয় রেখে আমার বসে থাকা কি ঠিক হবে? সব ধর্মই বলে, জান বাঁচানো ফরজ। এ বাক্যটি পারসি, আরবি শব্দ দেখে মনে হয় ইসলামও তাই বলে। অনেক মুসলিমকেও আমি এ বাক্যটি বলতে শুনেছি। এ অবস্থায় বিপদে পড়ে মুসলিম হয়ে জান বাঁচানো আর ধর্মান্তরিত হওয়া কি এক কথা? ধর্মান্তরিত হওয়া বলতে আমি বুঝি জন্মসূত্রে যে যে ধর্মে আছে সে ধর্মের সব কিছু জেনেশুনে যদি সে সেই ধর্মে শান্তির সন্ধান না পায়, তার পারমার্থিক অভীষ্ট লাভের সহায়ক না হয়, তবে যে ধর্মে যেতে চায় সেটিও ভালোভাবে জানতে হবে, এভাবে উভয় ধর্মের তুলনামূলক বিচার করে সে যদি মনে করে অন্য ধর্মটি তার মনে শান্তি ও পারমার্থিক অভীষ্ট লাভে সহায়ক, তবে নিশ্চয়ই সে অন্য ধর্মে যাবে, আর তার মানেই ধর্মান্তর। এভাবে আর কজন ধর্মান্তরিত হয়? যত সব ধর্মান্তরের কথা খবরের কাগজে ওঠে বা শোনা যায়, তার সবই তো বৈষয়িক অথবা জৈবিক ব্যাপার। ধর্মের সঙ্গে তার সম্বন্ধ কোথায়? এসব ধর্মান্তরের পক্ষগণ না জানে নিজের ধর্ম—না জানে যে ধর্মে যাচ্ছে সে ধর্ম। সেসব ক্ষেত্রে তাদের তথাকথিত ধর্মান্তর বৈষয়িক বা জৈবিক চাহিদার অনুষঙ্গ মাত্র। আমি মুসলিম হলে যে মানুষটি আছি, সে মানুষটিই থেকে যাবো। এমনকি জন্মসূত্রে যদি আমি মুসলিম হতাম তাহলে আমার মনে হয় আমি মানুষ হিসেবে যেখানে এসে থেমে আছি, ঠিক সেখানে এসেই থেমে থাকতাম। এমন তো নয় যে আমি হিন্দুমতে হিন্দুদের একটি

ধর্মীয় পথ ধরে অনেক দূর এগিয়ে এসেছি, আবার সে পথ ছেড়ে নতুন পথ ধরে এগুতে হবে। মন বলে, হিন্দু থেকেও বেঁচে যাবো, কিন্তু দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাবো না, আমার বিশ্বাসে এতটা জোর নেই। তাই ঠিক করলাম, মুসলিম হয়েই দুশ্চিন্তা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার চেষ্টা করব। পড়েছি পাগলের হাতে, পাগলামি করেই এ বিপদ ঠেকাতে হবে। তা না হলে যে কোনো সময় অন্য এক পাগলা মেজর এসে বলতে পারে, Allah desires your death, get ready. মে মাসের শেষে আনুষ্ঠানিকভাবে মুসলিম হয়ে গেলাম।"(১০)

দেশ স্বাধীন হবার পর বিজয় উৎসবে বাঙলার মানুষ-প্রকৃতি যখন নাচে-গানে বিহ্বল, তখন একজন মাননীয় জজ শ্রী দীনেশ চন্দ্র দেবনাথ মহোদয় (পরবর্তীতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের শিক্ষক) ধর্মান্তরের গ্লানি মুছে দিতে ১৯ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ কষ্টের কালিতে একটি এফিডেভিট করলেন—

"১৯ ডিসেম্বর এই বলে একটি এফিডেবিট করেছিলাম যে, আসন্ন মৃত্যু আশঙ্কায়, অবস্থার চাপে পড়ে জীবন বাঁচাবার জন্য আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলাম। সুমহান ইসলাম ধর্ম এভাবে ধর্মান্তর সমর্থন করে না, সংকট কেটে যাওয়ায় আমি আবার আমার স্বধর্মে ফিরে এলাম।"(১১)

১৯৪৬-৪৭ এ গান্ধীজি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রোধ করতে অবিরাম চেষ্টা করে গেছেন। বিশেষ করে নোয়াখালীতে গান্ধীজির প্রচেষ্টার কথা ছড়িয়ে পড়লে পাঞ্জাব থেকে আহ্‌মেদিয়া মুসলিম সম্প্রদায় পাঁচ হাজার টাকা পাঠিয়েছিল। এগারোজন মুসলিম ও একজন ইউরোপীয়ান আসাম থেকে দেড়'শ টাকাসহ দু'শ শাঁখা ও এক পাউন্ড সিঁদুর পাঠিয়েছিল। গান্ধীজির আদর্শ এবং প্রচেষ্টা কাছে থেকে দেখে ধন্য হওয়ার জন্যে এবং তাঁর সাথে কাজ করার ব্রত নিয়ে দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন নোয়াখালীতে আসতে শুরু করলো। সুদূর গুজরাট থেকে একজন মুসলমান গান্ধী দর্শনে এসে নোয়াখালীতে সর্বস্বান্ত পর্যন্ত হলো। পাঞ্জাব থেকে আরেকজন মুসলিম এসেও শিকার হলো অনুরূপ পরিস্থিতির।

গান্ধীজি দাঙ্গা বিধ্বস্ত নোয়াখালী থেকে বিহার হয়ে দিল্লিতে কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় আর নোয়াখালীতে আসতে পারেননি। এসময় নোয়াখালীর এক দরিদ্র মুসলিম সতীশ দাশগুপ্তের সঙ্গে দেখা করে জানতে চাইলেন গান্ধীজি আবার কবে নোয়াখালীতে আসবেন। গরিব মুসলিমকে সান্ত্বনা দিয়ে সতীশ দাশগুপ্ত বললেন— দিল্লির কাজ শেষ হলে তিনি আবার আপনাদের কাছে আসবেন। সতীশের সান্ত্বনায় গরিব মুসলমান অনেক কষ্ট নিয়ে বললেন—আমাদের দুঃখ গান্ধীবাবা ছাড়া আর কে বুঝবে।

১৯৪৭-এর মে মাসের প্রথম সপ্তাহের পর গান্ধীজি কলকাতা এলেন। তাঁকে ঘিরে সকলের প্রশ্ন- ভারত ব্যবচ্ছেদ হবে কি হবে না? বঙ্গভঙ্গ হবে কি হবে না? হিন্দু ও মুসলিমের সম্প্রীতি থাকবে কি থাকবে না? এত লোকের এত প্রশ্নের ভিড়ে নিয়মিত গান্ধী ও সোহরাওয়ার্দীর সাক্ষাৎ হচ্ছে। সাক্ষাতের ধারাবাহিকতায় ১২ মে গান্ধীজি সোহরাওয়ার্দীকে বললেন—

"তিনি যদি আন্তরিকভাবে এবং কেবল অহিংস উপায়ে বাংলাকে অখণ্ডিত রাখতে চান, তাহলে তাঁর সঙ্গে একত্র থেকে যতদিন প্রয়োজন একান্ত সচিবের কাজ করতে গান্ধীজি প্রস্তুত। শুনে ঘরের সকলেই স্তম্ভিত হয়ে যান। ঘর থেকে বেরিয়ে সোহরাওয়ার্দী নির্মল বসুকে বলেন—'what a mad idea!' মহামানবের আবির্ভাব কি আমরা সকলে এত সহজে টের পাব, অনেক দুঃখ নিয়েই তবে না বুঝবো কে এসেছিলেন, কেন এসেছিলেন।"(১২)

আসলে আমাদের দুঃখের রজনি সেই শুরু হয়েছে ১৯৪৭-এর মধ্য আগস্ট থেকে। তখন থেকেই আমাদের সুখ-শান্তিতে সূর্যগ্রহণ লেগেছে। আমরা এখন অন্ধকারে। আমাদের কোন আলো নেই। মহামানবের Mad idea তো ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাহলে কেন আমাদের দেশে, আমাদের সমাজে আমাদের মধ্যেই বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে এতো মামলা-মোকদ্দমা? বিষয়-সম্পত্তিকে গ্রাস করার মানসিকতায় আমরা কি ধর্মকে সামনে টেনে আনি নি? ক্ষমতার মসনদ পাকাপাকি করার জন্যেই কি দেশ

ভাগাভাগির নাটকে আমরা দেশপ্রেমের মেকি অভিনয় করি নি? আসল কথা হলো ধর্মের অজুহাতেই দেশ ভাগ হয়েছে। ধর্মের অজুহাতেই কেউ জন্মভিটা ছাড়তে বাধ্য হয়েছে বা কাউকে ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে— আমরা ধর্মভিরু কেউ কেউ ধর্ম বাঁচাতে, কেউবা প্রাণের ভয়ে প্রাণ বাঁচাতে জন্মভিটা ছেড়েছি। অথচ ভাগ্যের নির্মম পরিহাস রাষ্ট্রের শতভাগ ব্যর্থতায় নাগরিকরা ছেড়ে যাচ্ছে তার আজন্ম ভালোবাসার আধার ভিটামাটি। অথচ রাষ্ট্রই নাগরিকের সম্পত্তি গ্রাস করার জন্যে তার নাগরিককে শত্রু ঘোষণা করছে। নাগরিকের ফেলে যাওয়া সম্পত্তিকে শত্রুর সম্পত্তি ঘোষণা করছে সরকার তথা রাষ্ট্র।

"দেশভাগ বা স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় প্রাণভয়ে পালিয়ে যাওয়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ফেলে যাওয়া সম্পত্তি সরকার নিজের দখলে রাখার জন্যে ওই সম্পত্তিগুলো 'ক', 'খ' তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করে অধিগ্রহণ করে। 'ক' তফসিলভুক্ত সম্পত্তি নিয়ে এখন ৮৮ হাজার ৮৮২টি মামলা বিচারের অপেক্ষায় প্রহর গুনছে। অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির মামলা নিয়ে অসংখ্য মানুষ বছরের পর বছর খেয়ে—না খেয়ে কোর্ট-কাচারিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পূর্বপুরুষের সম্পত্তি ফেরত পেতে মামলা করা যেন তাদের অপরাধ। আজ তারা অসহনীয় হয়রানি ও দুর্ভোগের মধ্যে দিনাতিপাত করছে। অনেকে বংশ পরম্পরা ঘুরছে এইসব মামলার পেছনে। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর 'ডিফেন্স অব পাকিস্তান রুল্‌স ১৯৬৫' অনুসারে ওই বছরের ৯ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৬৯ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত যেসব নাগরিক পাকিস্তান ছেড়ে ভারতে চলে গিয়েছিল, তাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তি 'শত্রু সম্পত্তি' হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭৪ সালে 'শত্রু সম্পত্তি'র নাম পরিবর্তন করে 'অর্পিত সম্পত্তি' রাখা হয়। 'অর্পিত সম্পত্তি'র মূল মালিক বা তাদের বৈধ উত্তরাধিকারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে ২০০১ সালে 'অর্পিত সম্পত্তি' প্রত্যর্পন আইন করা হয়। তখন থেকে 'অর্পিত সম্পত্তি'র তালিকা 'ক' ও 'খ' তফসিলে অন্তর্ভুক্ত। দু'টি তফসিলভুক্ত সম্পত্তি অবমুক্ত করতে লাখ লাখ মামলা হলে তার চাপে পরবর্তীতে সরকার 'খ' তফসিলের সম্পত্তি অবমুক্ত করতে বাধ্য হয়। জনসাধারণের দখলে থাকা 'খ' তফসিল সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়ার পর এখন 'ক' তফসিলের সম্পত্তি নিয়ে মামলা চলছে। 'ক' তফসিলে অর্পিত সম্পত্তির পরিমান প্রায় দুই লাখ একর। দ্রুত মামলা শেষ না হওয়ায় ভুক্তভোগীরা আর্থিক ক্ষতিসহ বিভিন্ন ধরণের হয়রানির শিকার হচ্ছে।"[১৩]

মানুষের আনন্দ-বেদনার আধার তার জন্মভূমি, তার ভিটামাটি। চোখের জলে ত্যাগ করা জায়গা-জমিগুলো আজ দীর্ঘশ্বাসে পরিপূর্ণ। আমরা স্বীকার করি বা না করি এসব সম্পত্তি দখলের পাঁয়তারার ফসল হলো স্বাধীন দেশে এতো মামলা-মোকদ্দমা। এ' মানুষগুলো দ্বিজাতি তত্ত্বের শিকার না হলে হয়তো এখনো তারা আমাদের পড়শি থাকতো, স্বজন থাকতো, ভালোবাসার মানুষ থাকতো। সামাজিক জীবনাচারে আমাদের মধ্যে কখনো খুনশুটি হতো, কখনো ঝগড়া ফ্যাসাদ হতো, আবার কখনো বা কোনো অনুষ্ঠানে প্রীতি বন্ধনে আমরা বাউলের মতো গেয়ে উঠতাম—

আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম,
... ...
গ্রামের নওজোয়ান হিন্দু মুসলমান,
মিলিয়া বাউলা গান আর ঘাটু গান গাইতাম'
... ...
বিবাদ ঘটিলে পঞ্চায়েতের বলে গরিব কাঙ্গালে বিচার পাইতাম
মানুষ ছিল সরল
ছিল ধর্মবল
এখন সবাই পাগল
কেমনে বড়লোক হইতাম
আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম।

গান্ধীজির ভাবনায় কিন্তু ছিল— বিবাদ ঘটিলে পঞ্চায়েতের বলে গরিব কাঙ্গালের বিচারসুনিশ্চিত করা। এ' ভাবনাতেই লুকিয়ে আছে প্রকৃত মেডিয়েশনের ভাবনা।

* * *

গ্রন্থসহায়

(১) পৃষ্ঠা: ৩১৬
ভারত সন্ধানে
জওহরলাল নেহরু
আনন্দ

(২) পৃষ্ঠা: ১১
নোয়াখালীর পথে পথে
কমলা দাশগুপ্ত
গান্ধী পরিক্রমা
সম্পাদনা: শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়: ব্যারাকপুর

(৩) পৃষ্ঠা: পৃষ্ঠা: ১১১
তাঁর শেষ-নোয়াখালি ও পরের দিনগুলি
আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়
শ্রয়ণ
বার্ষিক সংখ্যা: ২০১৫
সম্পাদনা: পথিক বসু

(৪) পৃষ্ঠা: ৩৯৩
গান্ধী
কানাইলাল দত্ত
দে'জ পাবলিশিং

(৫) পৃষ্ঠা: ৩৯৩
কানাইলাল দত্ত
প্রাগুক্ত

(৬) পৃষ্ঠা: ৪০০
কানাইলাল দত্ত
প্রাগুক্ত

(৭) পৃষ্ঠা: ৩৯৪
কানাইলাল দত্ত
প্রাগুক্ত

(৮) পৃষ্ঠা: ৩৯৪
কানাইলাল দত্ত
প্রাগুক্ত

(৯) পৃষ্ঠা: ৩৯৬
কানাইলাল দত্ত
প্রাগুক্ত

(১০) পৃষ্ঠা: ২২৩-২২৪; ২২৬-২২৭
কত কথা কত স্মৃতি
শ্রী দীনেশ চন্দ্র দেবনাথ
শুদ্ধস্বর

(১১) পৃষ্ঠা: ২৩৫
শ্রী দীনেশ চন্দ্র দেবনাথ
প্রাগুক্ত

(১২) পৃষ্ঠা: ১৪০
আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়
প্রাগুক্ত

(১৩) আমার সংবাদ; ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২০

মানস-হ্রদের স্বচ্ছ সূর্যালোক

অবশেষে তিনটি গুলি

"মহাত্মা গান্ধী এমন মুনি-ঋষিতুল্য মহৎ ব্যক্তি ছিলেন যেআফ্রিকার জঙ্গলেযদিতিনি খালি গায় খালি পায় খালি হাতে বেড়াইতেন, তবে সেখানকার বাঘ-ভাল্লুক ও সাপ-বিচ্ছুও তাঁকে আঘাত করিত না।"(১)

মহাত্মা গান্ধীর নৃশংস হত্যাকাণ্ডেলেখক রাজনীতিবিদ আবুল মনসুর আহমেদ-এর লেখাটি ছিল আবেগী প্রতিবাদ। তিনি প্রতিবাদের লেখনিতে তীব্র-কণ্ঠে জানিয়ে দিলেন- মানুষ কতো নৃশংস, কতো ভয়ংকর!মানুষের ক্ষেত্রে 'অ, কু' এবং পুরুষের ক্ষেত্রে 'কা' শব্দ জুড়ে দিলে যে অর্থ দাঁড়ায় তা বাঘ-ভাল্লুক ও সাপ-বিচ্ছু থেকেও ভয়ংকর। মানুষ শব্দের প্রথমে 'অ' জুড়ে দিলে অমানুষ, 'কু' জুড়ে দিলে কুমানুষ। আবার পুরুষ শব্দের পূর্বে 'কা' জুড়ে দিলে কাপুরুষ। মহাত্মার হত্যাকারী এবং ষড়যন্ত্রকারীরা কী তাহলে অমানুষ-কুমানুষ-কাপুরুষ ছিল? নাকি অন্যকিছু? নাকি আরও ভয়ংকর-বেপরোয়া? মহাত্মা এবং তাঁর হত্যাকারীরা প্রকৃতপক্ষে সনাতনী হিন্দুত্ববাদে বিশ্বাসী। প্রথমপক্ষ মহাত্মা ভিকটিম হলে দ্বিতীয়পক্ষ হলো আসামী গং। প্রথমপক্ষ ধর্মকে জেনেছেন— প্রাণমনআত্মা ঢেলে, ন্যায়-নিষ্ঠায় শত ধারায় প্রবাহিত স্বচ্ছ জলে সুস্নাত হয়ে। দ্বিতীয়পক্ষ জেনেছে— ধর্মের নামে

অশিক্ষা-কুশিক্ষা-অপশিক্ষার বলয়ে, মৌলবাদের ভ্রান্ত ধারণার দূষিত জল আকণ্ঠ পান করে। তাদের শিক্ষায় ছিল না কোনো ন্যায়-নিষ্ঠা, ছিল না কোন মানব মঙ্গলের বার্তা। ছিল শুধু জন্মসূত্রে পাওয়া অন্ধ হিন্দুত্ব এবং হিন্দুত্বের প্রচলিত মৌলিক স্বার্থ রক্ষা করার কলুষিত ধ্যান-ধারণা।

ভারতবাসীর ভাগ্যাকাশে অন্ধকার-অমানিশা নেমে এলো— ১৯৪৮ এর ৩০জানুয়ারি।বাবা-মামহাত্মার হত্যাকারীসন্তানের পরমায়ু প্রত্যাশায় কান দু'টো ফুটো ক'রে, নাকে নথ পরিয়ে কন্যার মতো লালন-পালন শুরু করল। ঈশ্বরের কাছে পরমায়ু ভিক্ষা চেয়ে সন্তানটির নামকরণও করলো। বাবা-মায়ের প্রার্থনায় পরমায়ু পেয়ে সন্তানটি গায়ে-গতরে বড় হওয়ার সময় কোন এক ফাঁকে উভযৌন আচরণে বেড়ে উঠলো। পরবর্তীতে শক্ত-সমর্থ পুরুষ হওয়ার বাসনায় ব্যায়াম-শরীরচর্চা-ধর্মচর্চায় ব্যস্ত জীবনে সেই সন্তানের আর ম্যাট্রিক পাশ করা হলো না। পরমায়ু পেয়ে সেই সন্তান ধীরে ধীরে একটি পোশাকি নামে পরিচিতিও পেলো। বিশ্ববাসীর কাছে উভযৌন আচরণে অভ্যস্ত সন্তানটি সাহসী-বাগ্মীতায় ভারতের চলমান কলঙ্কিত ইতিহাসকে কদর্যরুপে লিখতে বাধ্য করলো। কলঙ্কিত ইতিহাসে ঢুকে গেলো পয়েন্ট থ্রি এইট বোরের বেরেট্টা এম পিস্তল। সভ্যতার ইতিহাসকে বিদীর্ণ ক'রে পৃথিবীর শৌর্যবীর্যকে সেদিন চিরদিনের জন্যে স্তব্ধ করলো তিনটি গুলি। গুলি তিনটির নিশানা ব্যর্থ হলে সারা পৃথিবী সেদিন আনন্দে নেচে উঠতো। নিশানায় সফল হয়ে অবশেষে গুলি তিনটি আশ্রয় পেলো পূণ্যতায় ঋদ্ধ বাপুজির তীর্থ-শীর্ণ শরীরে। 'তিনটি গুলি'-কে প্রেমেন্দ্র মিত্র কবিতায় চিহ্নিত করলেন এভাবে—

প্রথম গুলির নাম অন্ধ, মূঢ়, ভয়
দ্বিতীয়টি আমাদের
নিরালোক মনের সংশয়
বিবর বিলাসী হিংসা
তৃতীয় গুলির পরিচয়।

১৯৪৮-এ মহাত্মা গান্ধীজির নৃশংস হত্যাকাণ্ডে আবুল মনসুর আহমেদ-এর মতো মুহ্যমান-হতাশায় প্রতিক্রিয়া জানালেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু- 'মহাত্মার মৃত্যুতে মনে হচ্ছে পৃথিবীর সমস্ত আলো নিভে গেল'। আলোনিভা অন্ধকার পৃথিবীতে এলবার্ট আইনস্টাইন এবং রোমাঁ রোলাঁ গান্ধীজিকে দেখেছেন দমিত মানবজাতির মুক্তির জন্যে। দেখেছেন আত্মনির্ভর ভারত গড়ার জন্যে লোভ-আসক্তি-চাতুর্য পরিহার করা একজন জ্যোতিষ্ককে। আইনস্টাইন এবং রোমাঁ রোলাঁ দু'জন মনীষীই বিশ্বাস করতেন রাজনীতিজ্ঞ-সমাজসংস্কারক-ধর্মপ্রচারক-ঋষিসদৃশ মহাত্মা সারাজীবন মানুষের নিভুনিভু অন্তরে শুদ্ধ আলো জ্বালাতে আমৃত্যু চেষ্টা করেছেন। গান্ধীজিকে তাঁদের দেখা এবং মূল্যায়ন ছিল এরকম—

"গান্ধীজি রাজনৈতিক ইতিহাসে অনন্য। তিনি এক দমিত জাতির মুক্তির সংগ্রামের জন্য সম্পূর্ণ নতুন এবং মানবীয় প্রয়োগ-কৌশল আবিষ্কার করেছেন এবং সেটিকে প্রচণ্ডতম শক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করেছেন। সভ্য জগতের মধ্যে দিয়ে চিন্তাশীল মানুষদের উপর তিনি যে প্রভাব বিস্তার করেছেন তা পাশব শক্তির আতিশয্যে পূর্ণ বর্তমান যুগে যতটা মনে হয় তার চেয়েও বেশি টেকসই। কারণ একজন রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তির কাজ তখনই স্থায়ী হয় যখন তিনি তাঁর ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত এবং শিক্ষণীয় প্রভাবের দ্বারা তাঁর জনগণের নৈতিক শক্তিকে জাগ্রত ও সংগঠিত করতে পারেন।

আমরা সৌভাগ্যবান এবং আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত এইজন্য যে আমাদের অদৃষ্ট এই রকম একজন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ককে আমাদের সমসাময়িক করেছে—যে জ্যোতিষ্ক অনাগতকালের মানুষদের কাছে এক আলোক বর্তিকারূপে বিরাজ করবে।"

—এলবার্ট আইনস্টাইন

"গান্ধী কেবল ভারতবর্ষের পক্ষে ইতিহাসের এক জাতীয় নায়ক মাত্র নন। তাঁর কাল্পনিক স্মৃতি বহু সহস্রাব্দ ধরে উজ্জ্বল থাকবে। তিনি কেবল সক্রিয় জীবনের সত্তা মাত্র নন, যা ভারতবর্ষের জনগণের গৌরবময় একতা, তাদের শক্তি এবং তাদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার মধ্যে জীবন্ত হয়ে আছে। তিনি পশ্চিমের মানুষদের কাছে যীশু খ্রীষ্টের বাণীকে নবীকরণ করেছেন- যে বাণীকে ভুলে

যাওয়া হয়েছে অথবা যার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। তিনি তাঁর নামকে মানবতার 'জ্ঞানী ও ঋষিদের' মধ্যে ক্ষোদিত করে দিয়েছেন এবং তাঁর বিশিষ্ট চরিত্রের প্রভা বিশ্বের সকল ধর্মের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছে।"

—রোমাঁ রোলাঁ

মহাত্মা হত্যাকাণ্ডে মনীষীদের প্রতিক্রিয়ার মূল সুর হচ্ছে রোগে-শোকে, জরাগ্রস্ত, অশক্ত শরীরে তাঁর বেঁচে থাকা আর নশ্বর পৃথিবীতে বিশাল-বিশুদ্ধ আলোকপিণ্ড থেকে অবিরাম আলো বিকিরণ করা -একই কথা। মনীষীরা মনে করতেন পৃথিবীর জল-হাওয়া-মাটিকে বেশি পরিশুদ্ধ করতে আরও কিছুকাল তাঁর বেঁচে থাকা প্রয়োজন ছিলো। একদিকে জ্ঞানী-গুনী বরেণ্য মনীষীদের মনোভাব-ভাবনা। অপরদিকে মহাত্মাকে হত্যাকারী এবং হত্যাযজ্ঞের দোসরদের উত্থান। তারা কিন্তু মনীষীদের পথে হাঁটলেন না। তাঁদের মতো ভাবলেন না। তাঁদের সাথে একমত-সহমত পোষণ করলেন না। তারা যুক্তিবিহীন-বিকল্পকিছু মনে করতো বলেই নিজের কৃতকর্মে বিচলিত না হয়ে ফাঁসিমঞ্চে নির্দ্বিধায় বলতে পারলেন—

"জাতির পিতা হিসাবে দায়িত্ব পালনে গান্ধী ব্যর্থ। কার্যতঃ তিনি পাকিস্তানের পিতা বলে পরিগণিত হয়েছেন। শুধু এই কারণেই ভারতমাতার সন্তান হিসাবে তথাকথিত জাতির পিতার জীবন শেষ করার দায়িত্ব বলে মনে করি। তিনি আমাদের মাতৃভূমি খন্ডনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন।"(২)

গান্ধীজির প্রতি হত্যাকারীদের বিদ্বেষের আরও অনেক কারণ ছিল। তারা মনে করতো হাজার বছরব্যাপী মুসলিম এবং খ্রিষ্টান শাসকরা হিন্দু সনাতন ধর্মকে এবং সেই ধর্মানুসারীদের পদদলিত করেছে। তারা আরও বিশ্বাস করতো হিন্দু ধর্মের সনাতন বিশ্বাসকে বিধর্মী শাসকরা শাসনের নামে দুঃশাসনের লাল-কালোঘোড়া দাবড়িয়ে- নগ্নতলোয়ার চালিয়ে টুকরো টুকরো করেছে। রক্তাক্ত করেছে। তাদের মনে-প্রাণে বিশ্বাসের দানায় অঙ্কুরিত ছিল- মুসলিম-খ্রিস্টান শাসকরা সনাতন ধর্মের জন্যে সবসময় বিরুদ্ধ শক্তির বিরূপ বাতাস। তাদের মতো তথাকথিত দেশপ্রেমিকরা ভারতকে

'ভারতমাতা' মনে করে এইসব মুসলিম এবং খ্রিস্টান শাসককে প্রতীকী মায়ের ইজ্জত লুণ্ঠনকারী ধর্ষক মনে করতে শুরু করলো। গোড়া সনাতনী ধর্মবিশ্বাসের ভ্রান্ত পাহাড়ে দাঁড়িয়ে তারা মনে করতো সুন্দর-গরিব-দুর্বল মাকে দুর্বৃত্তরা যেমন নির্যাতন-ধর্ষণ চালায় ঠিক তেমনি এইসব বিধর্মী শাসকরা ভারতমাতাকে দীর্ঘকাল শাসন-শোষণের নামে ক্রমাগত ধর্ষণ-নির্যাতন করছে। তারা তাদের চিন্তা-কল্পনা-ভাবনায় এইভাবে বিদ্বেষের বীজ রোপন করলো। পর্যাপ্ত মাটি-পানি-হাওয়া পেয়ে ভাবনাজগতে বিদ্বেষের বীজগুলো বৃক্ষে পরিণত হয়ে অবশেষে ডালা-পালা মেলতে শুরু করলো। বিদ্বেষের শিকড় প্রথিত করলো অনেক গভীরে। তাদের অশনি কাজে-কর্মে-সংগ্রামের শিকার হলো মহাত্মাজি। বাধাগ্রস্ত হলো সত্যাগ্রহ-অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের মতো শুভ চেতনাবোধ। অবশেষে একমাত্র লক্ষ্যতে পরিণত হলো সত্যাগ্রহ-অহিংস-চেতনার ধারক-বাহক মহাত্মাজি।

গান্ধীজির অহিংস আন্দোলনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সক্রিয় রাজনীতিতে হাতেখড়ি নেওয়া যুবকটি অবশেষে রাজনৈতিক জীবনের ইতি টানলো গান্ধীজিকে হত্যা করে। ফাঁসিমঞ্চে দাঁড়িয়ে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার পূর্বমুহূর্তে হত্যাকারী যুবকটি বললো—

"গান্ধীবাদী রাজনীতি আত্মিক শক্তি, অন্তরের বাণী, অনশন, প্রার্থনা ও মনের পবিত্রতার মতো সংস্কারের ভিত্তিতে পরিচালিত। আমি মনে করি, গান্ধীর অবর্তমানে ভারতীয় রাজনীতি বাস্তববাদী হবে। প্রতিশোধ গ্রহণে ও সামরিক শক্তিতে বলীয়ান হবে।..... লোকে হয়ত আমায় নির্বোধ বা মুর্খ বলবে, কিন্তু দেশ স্বাধীনভাবে যুক্তির পথ অনুসরণ করবে, জাতি গঠনের পক্ষে এটা দরকার।"(৩)

ফাঁসির আসামি যুবকআবেগঘন বক্তৃতা দেওয়ার সময় তার যুক্তিকে অকাট্য প্রমাণের জন্যে দৃষ্টান্ত দিলেন। দৃষ্টান্ত টেনে বললেন—*"গান্ধীকে হত্যার পর সামরিক অস্ত্রবলেই হায়দ্রাবাদে সমস্যার সমাধান হলো।"*(৪)

যুবকটি বিশ্বাস করতো গান্ধী বেঁচে থাকলে বর্তমান সরকার এই বাস্তব রাজনীতির পথ বেছে নিয়ে হায়দ্রাবাদের সমস্যা সমাধান করতে পারতো

না। বাবাকে লেখা অন্তিমপত্রে সে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লিখলো—"*কৃষ্ণ যেমন শয়তান রাজা শিশুপালকে বধ করেছিলেন, একই কারণে তিনি গান্ধীকে হত্যা করেছেন।*"(৫)

মনে হইল যেন কোর্ট ঘুরিতেছে

লন্ডন থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে স্বদেশে ফিরে এসে গান্ধীজি সংসার সাগরে হাবুডুবু খেতে লাগলেন। ইতোমধ্যে তাঁর উপর আত্মীয়-স্বজন, পরিবার-পরিজনের চাহিদা বেড়ে গেছে। তাঁর বড়ভাই ধন-মান-পদের প্রতি খুব লোভাতুর। গান্ধীজিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে তিনি উঠেপড়ে লাগলেন। তার বিশ্বাস-ওকালতিতে সফলতা পাওয়ার প্রথম শর্তই হচ্ছে মামলা পাওয়া। এই মামলা জোগাড় করতে তিনি বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় স্বজনের সাথে যোগাযোগ বাড়িয়ে দিলেন। কারণে-অকারণে তাদের ডেকে এনে আদর-আপ্যায়ন শুরু করলেন। তাদের পেছনে খরচ বাড়িয়ে তিনি ওকালতির ক্ষেত্র তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কালাপানি অতিক্রম ক'রে লন্ডন যাওয়ায় কিছু জ্ঞাতিগোষ্ঠী গান্ধীজিকে জাতচ্যুত করেছিল। ওকালতিতে প্রচার-প্রসারের বাসনায় জ্ঞাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ-কলহ দীর্ঘদিন পুষে রাখা ঠিক নয় ভেবে তিনি আরেকটি বড়ভাইসুলভ কাজ করলেন।গান্ধীজিকে তীর্থস্নান করালেন।বিরাগভাজন আত্মীয়-স্বজনকে ডেকে রাজকোটে প্রীতিভোজন পর্যন্ত করালেন। এসবই তিনি করলেন গান্ধীজিকে ওকালতিতে প্রতিষ্ঠিত করতে। বড়ভাই যখন শত চেষ্টায়, অনেক অর্থ খরচে, ব্যাপক আয়োজনে গান্ধীজির ওকালতির ক্ষেত্র তৈরি করতে ব্যস্ত, তখন গান্ধীজি ওকালতিতে সফলতার আশা ছেঁড়ে অশ্বডিম্ব পাড়তে শুরু করলেন। ওকালতির শুরুতে গান্ধীজির করুণ পরিণতি তাঁর লেখাতেই আমরা পাই—

> "*প্রতি মাসেই খরচ বাড়িতে লাগিল। বাড়ির বাহিরে ব্যারিস্টারের নামে বিজ্ঞাপন প্লেট আঁটিয়া রাখা, আর ভিতরে ব্যারিস্টারীর জন্য তৈরি হওয়া- এ আমি বরদাস্ত করিতে*

> *পারিতেছিলাম না। সেইজন্য আমার পড়াশুনাও অশান্ত চিত্তে চলিতেছিল। 'সাক্ষ্য-আইন'এ আমি কিছু রসবোধ করিতেছিলাম বলিয়াছি। মেইনের 'হিন্দু ল' খুব আগ্রহের সহিত পড়িলাম। কিন্তু কেস্ চালাইবার সাহস আসিল না। আমার দুঃখের কথা কাহাকে বলিব? শ্বশুরবাড়ির নূতন বধূর মত আমার অবস্থা হইয়াছিল।*"(৬)

ব্যারিস্টার গান্ধী দেওয়ানী মোকদ্দমায় আনন্দ না পেলেও অবসরে 'সাক্ষ্য-আইন' মুখস্ত করে ফেললেন। গান্ধীজির ওকালতির ক্ষেত্র তৈরিতে চেষ্টারত আপন বড়ভাই একদিন ফল পেলেন। ভায়ের চেষ্টায় অবশেষে প্রথম ধরা দিলো একটি মামলা। দালালকে কমিশন না দিয়েও 'স্মলকজ কোর্টে'-র মামলায় গান্ধীজি তিরিশ টাকা ফি পেলেন। আদালতে প্রথমদিন গান্ধীজির অবস্থা পাঠককে বোঝাতে তাঁর লেখা থেকে সংক্ষিপ্ত পরিসরে উপস্থাপন করছি—

> "*'স্মলকজ কোর্টে' সেই আমার প্রথম প্রবেশ। আমি প্রতিবাদী তরফ হইতে নিযুক্ত হইয়াছিলাম। সেইজন্য আমাকে জেরা করিতে হইল। আমি ত উঠিলাম, কিন্তু গা কাঁপিতে লাগিল, মাথা ঘুরিতে লাগিল, মনে হইল যেন কোর্ট ঘুরিতেছে! প্রশ্ন করার মত বোধ-শক্তি রহিল না। জজ হাসিয়া থাকিবেন। উকিলেরা অবশ্যই হাসিয়া লুটাইয়াছিলেন। কিন্তু আমি কি কিছু চোখে দেখিতেছিলাম?*
>
> *আমি বসিয়া পড়িলাম, দালালকে বলিলাম যে,'আমি এ মামলা চালাইতে পারিব না, পাটেলকে নিযুক্ত কর— আমাকে যে ফি দিয়াছ তাহা ফেরত লও।' পাটেলকে সে দিনের জন্য একান্ন টাকায় নিযুক্ত করা হইল। তাহার কাছে এ মামলা খেলার সামিল।*
>
> *আমি ফিরিলাম। মক্কেল জিতিল কি হারিল তাহা জানি নাই। আমার লজ্জা হইল। পুরা সাহস না আসা পর্যন্ত কেস্ না লওয়া স্থির করিলাম এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় না যাওয়া পর্যন্ত আর কেস্ লই নাই। ইহা স্থির করায় আমার কোন বাহাদুরি ছিল না। পরাজিত হইবার জন্য কে আমাকে কেস্ দেওয়ার মত বোকামি করিবে? আমি স্থির না করিলেও, কোর্টে যাওয়ার কষ্ট কেহ আমাকে দিত না।*"(৭)

বোম্বাই, রাজকোর্টে ওকালতিতে আশার আলো জ্বালাতে ব্যর্থ গান্ধীজি পঁচাত্তর টাকার বেতনে ইংরেজির শিক্ষক পর্যন্ত হতে পারলেন না। কারণ তিনি গ্রাজুয়েট নন। অবশেষে চাকরি না পেয়ে ভগ্নহৃদয়ে চলে গেলেন দক্ষিণ আফ্রিকায়। তাঁর যাতায়াত ছিল শুল্কমুক্ত। থাকা-খাওয়া নিখরচায়। এছাড়া ১০৫ পাউন্ডের বার্ষিক চুক্তি হলো কোম্পানির সাথে। চুক্তি অনুযায়ী গান্ধীজি দাদা আব্দুল্লাহ এন্ড কোম্পানির দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্ত মামলা-মোকদ্দমার তদারকি করতে সম্মত হলেন এবং ইংরেজিতে প্রয়োজনীয় চিঠিপত্র লেখার দায়িত্বও তিনি পেলেন।

শপথের কাঠগড়ায় ইতিহাসকে দাঁড় করালে আমাদের সামনে জ্বলজ্বল করে ১৮৯৩ সাল। এবছরের এপ্রিলে জাহাজে সাগরের জলে ভেসে অবশেষে মে মাস থেকে শুরু করলো হিংসা-বিদ্বেষমুক্ত জীবনাচার- ভারতীয় যুব ব্যারিস্টার, দক্ষিণ আফ্রিকায় কুলিব্যারিস্টার খ্যাত মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। শুরু থেকেই টগবগে রক্তে, ভারতমাতার বিশুদ্ধ সংস্কৃতি বুকে ধারণ ক'রে দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনি তাঁর কর্মজীবন শুরু করলেন আদালতকে কেন্দ্র করেই। তিনি অপার বিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন ভারতের মতো দক্ষিণ আফ্রিকাতেও আনাচে-কানাচে, বনে-বাদাড়ে, রাস্তা-ঘাটে, জলে-স্থলে যেখানেই যে অপরাধ হোক তা জড়ো হয় আদালত চত্বরে। ভাবটা এমন আদালত হয়তো দাদন দিয়ে রেখেছে- পৃথিবীতে যতো বেশী অপরাধ, অত্যাচার, মারপিট, খুন-জখম-ধর্ষণ, অপকর্ম, দ্বেষ-বিদ্বেষ, মান-অভিমান হবে- তার সকল বিষয় নিষ্পত্তি হবে আদালতে! আদালত যেনলাভের অংশীদারিত্ব নিয়ে বসে আছে! আদালত যেন জজ-ব্যারিস্টার-উকিল-মোক্তার, পাইক-পেয়াদা সমৃদ্ধ বিশাল বাণিজ্যালয় খুলে আছে! এছাড়া বুঝি কোন পদ্ধতি নেই, গতি নেই, বিকল্প নেই! গান্ধীজি আরও গভীরভাবে দেখলেন এবং বুঝলেন আদালতের এহেন সাম্রাজ্যবাদী থাবা সকল সমস্যার সহসা সমাধান দিতে পারে না। উল্টো সমস্যাকে আরও ঘনীভূত করে। অনেক ক্ষেত্রে আদালতে প্রচলিত আইনি ব্যবস্থা একটি সমস্যা থেকে আরেকটি নতুন সমস্যা সৃষ্টি করে। নতুন হিংসার বীজ রোপণ করে। ফলে মানুষের সমস্যা লাঘব না হয়ে বরং সমস্যা কবলিত মানুষ অবশেষে প্রচলিত আইনি পদ্ধতির কারণে সমস্যার মিছিলে হাঁটতে শুরু করে। গান্ধীজি মনে

মনে সিদ্ধান্ত নিলেন প্রচলিত আইন ব্যবস্থায় তিনি হাঁটবেন না। বিকল্প পন্থায় সমস্যা জর্জরিত মানুষকে মুক্ত করা যায় কী না- ভাবতে শুরু করলেন।

গান্ধীজি দেখলেন ভারতবর্ষের ন্যায় দক্ষিণ আফ্রিকার কয়েকটি প্রদেশে শাসক হিসেবে তখন ইংরেজরা ক্ষমতার মসনদে। ইংরেজ রাজ্যে কখনও সূর্য ডোবে না- প্রচলিত কথাকে গান্ধীজি এবার বিশ্বাস করলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় এসে তিনি বুঝতে পারলেন ইংরেজ শাসনের ফলে ভারতবাসীরা ভারতবর্ষে নির্যাতন-নিপিড়নে যেমন ভালো নেই। আবার ভারতীয়রা দক্ষিণ আফ্রিকায় এসেও ভালো থাকছে না। এখানে এসে তারা পাচ্ছে কুলি পরিচয়। এ যেন তপ্ত কড়াই থেকে জ্বলন্ত উনুনে পড়ার মতো অবস্থা। হোক সে বিলেত ফেরত ডিগ্রিওয়ালা, হোক সে রাজপুত্র। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীদের একমাত্র পরিচয় 'তাহারা কুলি'। কুলি ছাড়া তাদের অন্য পরিচয় নেই। কলকাতার লেখক-শিল্পী কবীর সুমনের বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে লেখা গানের সাথে দক্ষিণ আফ্রিকায় তখন বসবাসরত ভারতীয়দের অবস্থা তুলনা করা যেতে পারে:

প্রথমত; আমি তোমাকে চাই
দ্বিতীয়ত; আমি তোমাকে চাই
তৃতীয়ত; আমি তোমাকে চাই
শেষ পর্যন্ত তোমাকে চাই।

ভারতবর্ষে ভারতীয়দের সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকার যেভাবে পেয়ে অভ্যস্ত ঠিক সেভাবেই দক্ষিণ আফ্রিকায় তারা ভারতীয়দের পেতে চাইলো। দক্ষিণ আফ্রিকায় তারা ভারতীয়দের কুলি হিসেবে চেয়েছে এবং কুলি হিসেবে পেয়েছে। শেষ পর্যন্তও তারা ভারতীয়দের কুলি হিসেবে পেতে চায়। তারই ধারাবাহিকতায় মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী এবার দক্ষিণ আফ্রিকায় হলেন কুলিব্যারিস্টার।

এই কুলিব্যারিস্টারের স্পর্ধিত সাহস ডারবানের মানুষ দু'তিন দিনের মধ্যে টের পেলো। বাঙালিদের পাগড়ি পড়ে তিনি আদালতে প্রবেশ

করলেন। গান্ধীজি জানতেন 'যেমন দেশ, তেমন বেশ।' কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। আচরণ ছিল উদ্ধত। পাগড়ি খুলে তাঁকে আদালতে আসতে বলায় তিঁনি তা অপমানজনক মনে করলেন। আদালতে প্রবেশ করলেন না। মাথার পাগড়ি মাথায় রেখে, সাহস বুকে নিয়ে তিনি এবার প্রতিবাদের কলম ধরলেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এই ঘটনার বিরুদ্ধে তিনি লিখতে শুরু করলেন। উপেক্ষিত-অবহেলিত ভারতবাসী টের পেলো অনেকদিন পর দক্ষিণ আফ্রিকায় একজন মানুষ এসেছেন। দৃশ্যমান উচ্চতায় মানুষটি ৫'৫"হলেও ইতোমধ্যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে তাঁর মাথা ছুঁয়েছে আকাশ। মানুষটি কালো। কিন্তু একেবারে খাঁটি। এই মানুষটি নির্লিপ্তভাবে উপেক্ষা করতে শুরু করলো শ্বেতাঙ্গদের অবৈধ নিয়ম-কানুনগুলো। তিনি নিজে বুঝলেন এবং মানুষকে বোঝাতে পারলেন আদালতে প্রবেশের জন্যে মাথা থেকে পাগড়ি খোলার কোন বিধান নেই। ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে পাগড়ি খুলতে বলেছে তাঁকে অপমান করার জন্যে। তিনি সকলকে বোঝালেন- এটা তাঁর ব্যক্তিগত অপমান নয়, এ' অপমান সকল ভারতবাসীর। সকল কালো মানুষের।

ভারতে বসবাসের সময় গান্ধীজি লক্ষ্য করেছিলেন ইংরেজ শাসকের সামনে কোনো ভারতীয় জুতো পায়ে যেতে পারতো না। ধুতি পরা কোন ভারতীয়কে ট্রেনে ইন্টারক্লাসে উঠতে দেওয়া হতো না। নিষিদ্ধ ছিল কলকাতার অনেক সড়কে ভারতীয়দের বাহন প্রবেশ। ভারতীয়রা এসব অনিয়ম-অনাচার সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের মতো নিত্যদিনের প্রাকৃতিক ঘটনা মনে করতো। উপেক্ষা-অবহেলার মধ্যে আজন্ম বেড়ে ওঠা গান্ধীজি পাগড়ি খোলার অপমান হয়তো সহ্য করতে পারতেন। কিন্তু বাদসাধলো ডারবান আদালতে ঘটে যাওয়া ঘটনার দিন সাতেক পর আরেকটি ঘটনা।

এদিন গান্ধীজি প্রিটোরিয়া যেতে ট্রেনে উঠলেন। তাঁর টিকিট ছিল প্রথম শ্রেণির। রাত নটায় তাঁর কামরায় প্রবেশ করল এক শ্বেতাঙ্গ। গান্ধীজির গায়ের রঙ দেখে অগ্নিশর্মা চেহারায় সে দু'জন অফিসারকে ডেকে আনলো। প্রথম শ্রেণীর যাত্রী হওয়া সত্ত্বেও গান্ধীজিকে তারা কামরা ছেড়ে তৃতীয় শ্রেণীতে যেতে আদেশ দিলো। গান্ধীজি তাতে আপত্তি করলেন। অতঃপর

তারা পুলিশ ডেকে জোরপূর্বক গান্ধীজিকে প্রথম শ্রেণী থেকে বের করে দিলো। প্লাটফর্মে ছুড়ে ফেলে দিলো তাঁর জিনিসপত্র। পর্যাপ্ত গরম কাপড় না থাকায় অসহ্য শীতে সারারাত গান্ধীজি নিদারুণ কষ্ট পেলেন। টেলিগ্রাম করে আব্দুল্লাহ কোম্পানিতে সমস্ত ঘটনা জানালে তারা অন্য একটি ট্রেনে চার্লস টাউন পর্যন্ত যাওয়ার ব্যবস্থা করলো। অবশিষ্ট পথ তিনি সিগরামে অর্থাৎ ঘোড়ার গাড়িতে যাবেন বলে মনস্থির করলেন। আব্দুল্লাহ কোম্পানি যে সিগরামের ব্যবস্থা করেছিল- ঘটনাক্রমে গান্ধীজির বিলম্ব হওয়ায় কর্তৃপক্ষ তা বাতিল করে দিয়েছিল। অবশেষে তাঁকে অন্য সিগরামে অন্যান্য যাত্রীদের সাথে যেতে হলো। সিগরামওয়ালা গোলমালের ভয়ে গান্ধীজিকে নির্ধারিত আসনে না বসিয়ে কন্ডাক্টরের আসনে বসালো। ব্যবস্থাটি গান্ধীজির জন্যে অপমানজনক হলেও ক্লান্ত শরীরে, বিধ্বস্ত মনে তা তিনি কষ্টের সঙ্গে মেনে নিলেন। কিছু পথ যাওয়ার পর ঘটনা অন্যদিকে মোড় নিলো। অস্বস্তিকর গরমে এবং ধুমপানে অসুবিধা হওয়ায় গান্ধীর নির্ধারিত আসনে কন্ডাক্টর আর বসে থাকতে চাইলো না। নিজের সুবিধার জন্যে কন্ডাক্টর গান্ধীজিকে পাদানিতে বসতে বললো। 'গরু মেরে জুতো দান'-এর মতো কন্ডাক্টর দয়াপরবশ হয়ে, নূন্যতম ভদ্রতায় পাদানিতে একটি চট্ বিছিয়ে গান্ধীজিকে বসতে বললো। কল্পনাতীত এ ঘটনায় গান্ধীজি প্রতিবাদের ঝড় তুললেন। তিনি এই অপমানের বিরুদ্ধে দৃঢ়তায় দাঁড়িয়ে গেলেন। স্পষ্ট ভাষায় কন্ডাক্টরকে জানালেন, তিনি গরম সহ্য করেও তাঁর নির্ধারিত আসনে বসতে রাজি, কিন্তু কোনভাবেই পাদানিতে বসবেন না। গান্ধীজির দৃঢ়তায় বর্ণবাদী কন্ডাক্টর তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো। গান্ধীকে অকথ্য-অশালীন ভাষায় গালিগালাজ করেও ক্ষান্ত হলো না। সে গান্ধীজির কানও মলে দিলো। একপর্যায়ে জোর করে গাড়ি থেকে নীচে ফেলে দিতে চেষ্টা করলো। বেগতিক গান্ধীজি কোনরকম আসনের পাশে পিতলের ডান্ডা ধরে নিজেকে রক্ষা করলেন। আত্মম্ভরিতা অতিক্রম ক'রে অবশেষে একজন যাত্রী প্রতিবাদ করলে গান্ধীজি রক্ষা পেলেন। তবুও বর্ণবাদী কন্ডাক্টরের চোখের ভাষা ছিল ভয়ংকর, আতংকের। অবশিষ্ট পথ যেতে যেতে বর্ণবাদী গোঁড়া কন্ডাক্টর গান্ধীজিকে ভয় দেখিয়ে বললো— 'সামনে চলো, মজা দেখাবো।'

ট্রেনে এবং ঘোড়ার গাড়িতে এরকম অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে গান্ধীজি মনে মনে ভীত হলেন। প্রিটোরিয়ায় নেমে তিনি দেখলেন—'Dogs and Indians are not Allowed'। বোর্ডটি হোটেলে হোটেলে ঝুলছে। গান্ধীজি বিপদে পড়ে আবারও বরাবরের মতো দিশাহারা হলেন না। তিনি অতিকষ্টে এক মার্কিনীর ফ্যামিলী হোটেলে রাতের আশ্রয় জোগাড় করলেন। হোটেল মালিক ভালোমানুষ। তিনি গান্ধীজির অসহায়ত্বের সুযোগ না নিয়ে তাঁকে তাঁর নিজ কক্ষে খাবার খেতে পরামর্শ দিলেন। তিনি জানতেন হোটেলের অন্যান্য গোঁড়া খদ্দের তাঁর সাথে খেতে আপত্তি করবে। বড়োসড়ো ঝামেলা পাকাবে।

ডারবান থেকে প্রিটোরিয়ার পথে অনেক বৈষম্যের শিকার হলেন গান্ধীজি। তাঁর শরীরের রক্ত সাধারণ মানুষের মতো উষ্ণ হলেও প্রতিবাদে তিনি ছিলেন ধ্যানমগ্ন ঋষি। নির্গত হওয়ার অদম্য আকাঙ্ক্ষায় সুপ্ত আগ্নেয়গিরিতে লাভা যেমন সুপ্ত থাকে, তেমন ঘটে যাওয়া ঘটনার সমস্ত কষ্ট-ব্যথা-বেদনার প্রতিবাদগুলোও গান্ধীজির মধ্যে সঞ্চিত হলো।সুপ্ত হলো। কষ্ট-ব্যথা-বেদনাগুলো দীর্ঘ অপেক্ষায় প্রহর গুনতে শুরু করলো। পার্থক্য শুধু আগ্নেয়গিরির মতো তিনিধ্বংসাত্মক নয়। শত নির্যাতন নিপীড়নে অসীম ধৈর্যে গান্ধীজি সবকিছু আত্মস্থ করলেন। বিকল্প পথেহাঁটলেন। সমস্ত অন্যায়, অশুভশক্তি নিজের মধ্যে পরম মমতায় সঞ্চয় করতে ব্রতী হলেন। সযত্নেসমস্ত অন্ধকারকে ভালোবেসেগান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকায়আলো জ্বালাতে বেছে নিলেন অহিংসার পথ। বেছে নিলেন ব্যক্তিগত অন্যায়ের প্রতিকারের বিরুদ্ধে মামলা না করার কৌশল। এভাবেই তিনি উদ্ভুত যে কোন সমস্যার সমাধান করতে আলাপ-আলোচনা অন্তে আপস-মীমাংসায় আসতে সংক্ষুব্ধপক্ষকে অনুপ্রাণিত করতে শুরু করলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় এসে গান্ধীজি জানলেন ভারতীয়দের এখানকার ফুটপাতে হাঁটা নিষেধ। প্রায় আট-নয় বছর পূর্বের পাশ করা এই কালো আইনের কারণে ভারতীয়দের এ'করুণ দশা। গান্ধীজির লেখা থেকে আইনের নির্যাসটুকু এখানে তুলে ধরা হলো—

"ট্রান্সভালে ১৮৮৫ সালে কঠোর আইন পাস হইয়াছিল। ১৮৮৬ সালে এই আইনের কতকটা সংস্কার হয়। তাহাতে স্থির হয় যে, ভারতবাসী মাত্রকেই তিন পাউন্ড হিসাবে প্রবেশ-ফি দিতে হইবে। আরও স্থির হয় যে, কেবল তাহাদের জন্য নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যেই তাহারা জমি পাইতে পারিবে এবং তাহাও আবার মালিকি-স্বত্বে পাইবে না। ভোটের অধিকার তাহাদের অবশ্যই নাই। ইহা কেবল এশিয়াবাসীদের জন্যই বিশেষ নিয়ম। কিন্তু কালো লোকদের জন্য যে সকল নিয়ম আছে, তাহাও তাহাদের উপর প্রযোজ্য। এই আইন অনুসারে ভারতীয়দের সাধারণ 'ফুটপাথে' চলার অধিকার ছিল না। রাত্রি নয়টার পর লাইসেন্স ব্যতীত তাহারা বাহিরেও যাইতে পারিত না। এই শেষোক্ত আইন ভারতীয়দের উপর কম-বেশি প্রযুক্ত হইত। যাহারা আরব বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিত তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া ইহার ভিতর ফেলা হইত না। ছাড় দেওয়া পুলিশের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত।"[৮]

ট্রান্সভালে জনাব কোটসের সঙ্গে গান্ধীজি সন্ধ্যায় বেড়াতে গেলে বাড়ি ফিরতে প্রায় দশ'টা বেজে যেতো। এসময় বাসায় ফিরতে তাঁর ভয় হতো- এই বুঝি পুলিশ তাঁকে ধরে ফেলবে। বেড়ানোর পর গান্ধীজিকে একা ছেড়ে দিতেও কোটসের খারাপ লাগতো। কোটসের নিকট থেকে লাইসেন্স নিয়ে অধীনস্ত হাবসি এবং কর্মচারীরা রাত ৯টার পর অনায়াসে বাইরে চলাচল করতে পারতো। ইচ্ছে করলে কোটস গান্ধীজির ভূয়া মালিক সেজে তাঁকে লাইসেন্স দিতে পারতেন এবং গান্ধীজিও তা গ্রহণ করতে পারতেন। কিন্তু তাঁরা দু'জনই নৈতিকতার দাঁড়িপাল্লায় শুদ্ধ ছিলেন বলে মিথ্যে কল্প-কাহিনী সৃষ্টি করে কোটস যেমন ভূয়া মালিক সাজেননি গান্ধীজিও তাঁর মিথ্যা কর্মচারী সাজেননি।

রাত-বেরাতে গান্ধীজি সমস্যায় পড়তে পারেন এ আশংকায় জনাব কোটস সরকারি আইনজীবী জনাব ব্রাউজের কাছে তাঁকে নিয়ে গেলেন। পরিচয়পর্বের প্রারম্ভেই গান্ধীজি জানতে পারলেন জনাব ব্রাউজ এবং সে একই 'ইন' থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করেছেন। ১৮৮৫ সালে পাশকৃত আইনের বেড়াজালে বন্দী গান্ধীজিরও লাইসেন্সের প্রয়োজন— কথাটি জেনে জনাব ব্রাউজ বিরক্ত এবং বিব্রত হলেন। রাত ন'টার পর লাইসেন্স ছাড়া

সাধারণ মানুষের মতো কোনো ভারতীয় বাইরে বের হতে পারে না ভাবতেই তিনি কষ্টে ভারাক্রান্ত হলেন। গান্ধীজিকে তিনি লাইসেন্স না দিয়ে একটি চিঠি দিলেন। চিঠির বলে গান্ধীজি রাত ন'টার পর নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারতেন। পুলিশ কোন বাঁধা দিতো না। ব্রাউজের চিঠি গান্ধীজি সবসময় সঙ্গে রাখতেন। বিশেষ করে ফুটপাতে হাঁটার সময়। প্রেসিডেন্ট স্ট্রিটের পাশে ছিল উন্মুক্ত মাঠ। মাঠটি তাঁর ভালো লাগতো বলে ঘনঘন সেখানে যেতেন। যেতে যেতে তাঁর চোখে পড়তো প্রেসিডেন্ট ক্রুগারের সাদা-মাটা বাড়ি। তিনি আশ্চর্য হয়ে ভাবতেন একটি দেশের প্রেসিডেন্টের বাড়ি এত সাধারণ হয় কী করে! প্রেসিডেন্টের বাড়ির আশেপাশে সাধারণ মানুষের বাড়ি কী চমৎকার-সুন্দর সাজানো-গোছানো। প্রেসিডেন্ট ক্রুগার সহজ-সরল-সাধারণ জীবন-যাপন করতেন। তাঁর রাজ প্রাসাদ থেকে সাধারণ প্রজার বাড়ি সুন্দর হলে তাতে তাঁর অনিন্দ্যের কিছুই এসে যায় না। প্রজাদের ভালো থাকায় তিনিও ভালো থাকতেন। উদার মানসিকতার কারণে প্রেসিডেন্ট ক্রুগার দেশবাসীর কাছে শ্রদ্ধার আসনে ছিলেন। অন্যান্য সাধারণ প্রজার বাড়ি থেকে প্রেসিডেন্টের প্রাসাদ আলাদা করার একমাত্র উপায় ছিল, সাধারণ প্রজার বাড়িতে পাহারাদার থাকতো না। রাজ প্রাসাদে থাকতো। এ পথ দিয়ে উন্মুক্ত মাঠে যেতে গান্ধীজিকে কোনদিন কোন পাহারাদার বাঁধা দেয়নি, কোন প্রশ্ন করেনি। হাঁটার সময় হঠাৎ একদিন এক পাহারাদার গান্ধীজিকে ফুটপাত থেকে লাথি-ধাক্কায় রাস্তায় ফেলে দিলেন। কাকতালীয় ঘটনা— এসময় কোটস এ'পথে যাচ্ছিলেন। গান্ধীজির সাথে পাহারাদারের এই আচরণে কোটস খুব ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি রাগে উত্তেজনায় গান্ধীজিকে বললেন—

"গান্ধী, আমি সমস্তই দেখিয়াছি। আপনি নালিশ করিলে আমি সাক্ষ্য দিব। আমার বড়ই দুঃখ হইতেছে যে, আপনার উপর এই জুলুম হইল।

আমি বলিলাম- ইহাতে দুঃখের কারণ নাই, সিপাই বেচারা কি জানে! তাহার কাছে কালা ত কালাই! সে নিগ্রোদের সঙ্গে এইরকম ব্যবহারই করিয়া থাকে। সেজন্যে আমাকেও ধাক্কা মারিয়াছে।

আমি নিয়ত করিয়াছি যে, ব্যক্তিগত অন্যায়ের প্রতিকারের জন্যে আদালতে যাইবো না। সেইজন্য আমি মামলা করিবো না।"[৯]

গান্ধীজির কথায় কোটস আশ্চর্য হলেন। বিশ্বাস করতে পারলেন না- রক্ত-মাংসের একজন সাধারণ মানুষ কীভাবে এত সহিষ্ণু, এত উদার হতে পারেন!তিনি অবাক বিস্ময়ে গান্ধীজির দিকে চেয়ে বললেন—*"আপনার স্বভাবের উপযুক্ত কথাই বলিয়াছেন। তবুও পুনরায় চিন্তা করিয়া দেখিবেন। এইসব লোককে শিক্ষা দেওয়া দরকার।"*[১০]

কোটসের উপদেশানুযায়ী লোককে শিক্ষা দেওয়ার জন্যে গান্ধীজি কোন কোর্ট-কাচারি বেছে নিলেন না, কোন মামলা-মোকদ্দমা করলেন না, এমনকি কোন ব্যক্তির কাছে পর্যন্ত কোন অভিযোগ-অনুযোগ করলেন না। তিনি অবলীলায়-নির্দ্বিধায় বেছে নিলেন ক্ষমার সুপ্রশস্ত পথ। এ পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না তবু চলার পথে ভালোবাসা-মমতায় তিনি ফুটিয়ে তুললেন নানা রঙের পুষ্প। তাঁর পুষ্পোদ্যানে বাহারি সৌন্দর্যে প্রস্ফুটিত হলো সত্যাগ্রহ! অহিংস অসহযোগ আন্দোলন! খেলাফত আন্দোলন! আরও কত কী। চলার পথে গায়ে মেখে নিলেন অকারণে মানুষের দেওয়া লাথি-ধাক্কা, অপমান-বঞ্চনা, বেদম প্রহার। বেছে নিলেন নিজেররক্তাক্ত শরীর। কোটসের কথা তিনি গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিলেন। মানুষকেশিক্ষা দেওয়ার জন্যে আরও বেছে নিলেন ক্ষমার কোমল হৃদয়। উষ্ণ করমর্দন। দিগন্তপ্রসারী কল্যাণকর দৃষ্টি। গোঁড়া-বিবেকহীন মানুষ যতই অকৃপণতায় কষ্ট-অপমান দিলেন, ততই তিনি এগুলো পরম মমতায় উষ্ণহৃদয়ে জড়িয়ে ধরলেন। গান্ধীজির এমন নির্বিকার এবং নিরুত্তাপ আচরণে অবশেষে কোটস নিজেই সিপাইকে ডেকে 'ডচ্' ভাষায় সতর্ক করলেন। ধমকালেন। তাদের কথোপকথন 'ডচ' ভাষা বুঝতে না পারলেও গান্ধীজি দু'জনের শরীরিক ভাষা বুঝতে পারলেন। ক্ষমা প্রার্থনা করার আগেই তিনি সিপাইকে ক্ষমা করে দিলেন।

গান্ধীজি সারাজীবন প্রচলিত আইনের বাইরে এসে শান্তিপূর্ণ বিকল্প পথে হাঁটতেন। তাঁর ব্যক্তি জীবনে ঘটে যাওয়া কোন ঘটনা সামাজিক জীবনে

প্রভাব ফেললে তা নিয়ে তিনি লেখালেখি শুরু করতেন। বিজ্ঞাপনের ভাষায় যাকে বলে প্রচারে প্রসার। গান্ধীজি প্রিটোরিয়ায় থাকতে ভারতীয় মুসলমানের সংখ্যা সেখানে বেশি ছিল। মুসলিম সমাজে তায়েব মোহাম্মদের প্রভাব বেশ চোখে পড়তো। গান্ধীজি প্রিটোরিয়া পৌঁছে বুঝলেন ভারতীয়দের জন্যে এখানে কিছু করতে হলে তায়েব মোহাম্মদকে তাঁর প্রয়োজন। ভাবনার শুরুতেই সপ্তাহখানেকের মধ্যে তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের বিরাজমান সমস্যাগুলো তিনি ভালো মতো তাঁকে বোঝালেন। সমস্যাগুলোর আরও গভীরে যেতে তায়েব মোহাম্মদ বৈঠক ডাকলেন। বৈঠক হলো শেখ হাজী মোহাম্মদ তায়েবের বাড়িতে। প্রধান বক্তা কুলিব্যারিস্টার করমচাঁদ গান্ধী। ছোটখাটো পরিসরের এ'বৈঠকেই জন্ম নিলো নতুন এক গান্ধী। তারপর গান্ধীর সমস্ত ভয়-ভীতি-লাজ-লজ্জা-জড়তা কোথায় যে হারিয়ে গেল! কোথায় যে কর্পুরের মতো উড়ে গেল! ছোটখাটো পরিসরের বৈঠকে গান্ধী তাঁর বক্তৃতায় যোগ করলেন নতুন মাত্রা, নতুন তত্ত্ব। তাঁর বক্তব্যে বিরোধী শক্তিকে তিনি চিহ্নিত করলেন না, দোষারোপের আঙ্গুল কারো দিকে তুললেন না। তাঁর দীর্ঘদিনের বিশ্বাস, বিরোধ থেকে বিরোধী শক্তির সৃষ্টি। কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ তুললে, বিরোধের অসুর ডঙ্কা নিনাদ করে। অকারণে বিরোধী পক্ষ সৃষ্টি করা বোকামি। বিরোধী পক্ষ সৃষ্টি হলে আকাশে ভেসে বেড়ায় কালো মেঘের মতো শত্রুছায়া। আমাদের সুন্দর পৃথিবীতে ঠুনকো কারণে অবিরল ধারায় নেমে আসে একজন আরেকজনকে ঘায়েল করার জন্যে নানারকম বিগ্রহ। পরস্পরের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হলে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে সুপেয় জলের জন্যে হাহাকার ওঠে, দূষিত জলে মানুষ স্নান ক'রে অবশেষে অমানুষ হয়। শরীর-মনকে ক্লান্ত করে, অবসন্ন করে। একজন আরেকজনকে অকারণে শত্রু ভেবে দূরে যেতে শুরু করে।

গান্ধীজি-বিরোধকে রোধ করতে শ্বেতাঙ্গের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ তুললেন না। তিনি শুধু ভারতীয়দের উজ্জীবিত হতে বললেন। দৃঢ়তার সাথে তিনি আরও বললেন দেশ হোক, বিদেশ হোক, ভারতীয়দের কাজে-কর্মে নিষ্ঠা ও সততা থাকতে হবে। কাজে-কর্মে দক্ষতা ও পরিচ্ছতা আনতে হবে। নিজেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করতে হবে। তাঁর বক্তৃতায় শেষের দিকে

তিনি ভারতীয়দের একটি সমিতি করতে বললেন। তিনি বিশ্বাস করতেন জোটবদ্ধতার ভিত্তিতে ভারতীয়রা একটি সমিতি করলে সমষ্টির শক্তি নিয়ে তারা সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারবে। চেতনায় ভারতীয়দের উন্মেষ হলে শ্বেতাঙ্গ ইংরেজরা আপনা-আপনি বৈষম্য আচরণ থেকে সরে আসবে। সমিতি গঠনের প্রাথমিক লক্ষ্যে প্রথম বৈঠক সফল হওয়ার পর ভারতীয়রা নিয়মিত বসতে শুরু করলো। সপ্তাহে একবার না হলেও মাসে অন্তত একবার তারা একত্রিত হতো। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্যে তারা পরস্পর পরস্পরের সাথে আলোচনা ক'রে সিদ্ধান্ত নেওয়া শুরু করলো। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিবরণ সংগ্রহ করে, প্রকৃত অবস্থা বুঝতে সবাই নিয়মিত বৈঠকে আসতে শুরু করলো। ভারতীয়দের মধ্যে ঘনঘন যোগাযোগে স্পষ্ট হলো ভারতীয়দের সুযোগ-সুবিধা-অধিকারগুলো আদায় করতে হবে। প্রয়োজনে প্রচলিত আইনি ব্যবস্থায় তাদের প্রাপ্য আদায় করতে সচেষ্ট হতে হবে। তারা বুঝতে পারলো কোন পক্ষকে দায়ী না ক'রে উদার মানসিকতায় এগিয়ে আসতে হবে। কার্যকর আলোচনার মাধ্যমে তাদের সমস্যা সমাধান করতে হবে। ফলপ্রসূ আলোচনার বিকল্প নেই। অলসতার কারণে নীরবে-নিভৃতে ভারতীয়রা যেনো কোন প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয় তার জন্যে তাদের উজ্জীবিত করতে সমিতি সর্বতোভাবে চেষ্টা করবে।

ভারতীয়দের অধিকার আদায়ে শুরু হলো পরীক্ষামূলক আইনি লড়াই। সর্বাগ্রে এগিয়ে এলেন তায়েব মোহাম্মদ। তিনি বেছে নিলেন তার জীবনে ঘটে যাওয়া ট্রেনের ঘটনাটি। ডারবানের পথে ট্রেনের দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা থেকে তাকেও একদিন জোর করে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। গান্ধীজি তাঁর ঘটনার সাথে এই ঘটনার সাদৃশ্যতা পেলেন। ভিকটিম এবং উকিলের আবেগ একসাথে সঞ্চারিত ক'রে এবার আইনি লড়াই-এ নেমে পড়লেন। মামলায় তিনি সাফল্যের হাসি হাসলেন। তায়েব মোহাম্মদকে একশো পাউন্ড ক্ষতিপূরণ আদায় করে দিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় এভাবে ভারতীয়রা অধিকার আদায়ে সোচ্চার হতে শুরু করলো। কখনো আইনি লড়াই, কখনো আলাপ-আলোচনা, কখনো অহিংস পথ।

গান্ধীজি ধীরে ধীরে প্রিটোরিয়ায় পরিচিতি পেতে শুরু করলেন। 'ছোট ছোট বালুকণা, বিন্দু বিন্দু জল, গড়ে তোলে মহাদেশ, সাগর অতল'-এর মতো অধিকার আদায়ে ভারতীয়রা গান্ধীজির পদাঙ্ক অনুসরণ করলো। প্রিটোরিয়ায় ভারতীয়দের জাগরণে গান্ধীজির ভূমিকা ছিল সাহসী নেতার মতো। আবেগী কবির মতো। আবার কখনো অনবদ্য কবিতার মতো। সফল গান্ধীজি সময়ের হাত ধরে একদিন প্রিটোরিয়ার চেতনা ছড়িয়ে দিলেন ডারবানে, নাটালে, দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যান্য কলোনিতে। ভারতবাসীর জাগরণের ঢেউ দক্ষিণ আফ্রিকাকে প্লাবিত রাখলো দীর্ঘ একুশ বছর। স্নিগ্ধ জাগরনের এ'ঢেউ একসময় আটলান্টিক মহাসাগর থেকে ভারত মহাসাগরে আছড়ে পড়লো। প্লাবিত হলো ভারতবর্ষের নানা প্রান্ত।

> *"সত্যিকার ওকালতি আমি এইখানেই শিক্ষা করিলাম-একথাও বলা যায়। নতুন ব্যারিস্টার পুরাতন ব্যারিস্টারের অফিসে থাকিয়া যাহা শিক্ষা করে, তাহাও আমি এইখানেই শিখিলাম। ওকালতি করিতে আমি যে অপটু নই এই বিশ্বাস আমার এইখানেই আসিলো। ভালো উকিল হওয়ার ভিতর যে রহস্য আছে তাহার সন্ধানও আমি এই খানেই পাইলাম।"*(১১)

ভারতবর্ষে সাহসের অভাবে আইন পেশায় ব্যর্থ গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকায় হয়ে উঠলেন সাহসী। নিজেই নিজেকে মূল্যায়ন করে সনদ দিলেন ওকালতিতে তিনি অপটু নন। গান্ধীজি নিজের সাহসী বিশ্বাসে আবিষ্কার করলেন ওকালতির রহস্য-সৌন্দর্য। দাদা আব্দুল্লাহ এবং তৈয়ব শেঠ দু'জন আত্মীয়। আত্মীয়তার মধ্যে চিড় ধরালো মামলা-মোকদ্দমা। আত্মার আত্মীয় থেকে তাদের কাছে মুখ্য হলো সম্পত্তি। মুখ্য হলো স্বার্থান্ধতা। অবশেষে চল্লিশ হাজার পাউন্ড আদায় করতে দাদা আব্দুল্লাহ মামলা ঠুকে দিল পরম আত্মীয় তৈয়ব শেঠের বিরুদ্ধে। প্রথম প্রথম দু'পক্ষই একজন আরেকজনকে ঘায়েল করার বাসনায় আদাজল খেয়ে লাগলো। দিন যায়, মাস যায়-মামলার নিষ্পত্তি হয় না। গান্ধীজি মামলার বাদী আব্দুল্লাহর পক্ষে নিযুক্ত আইনজীবী। অর্থ-বিত্তে সমৃদ্ধ পরম দু' আত্মীয় কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে- তা তিনি কাছে থেকে দেখলেন। অর্থ-কড়ি ছাড়াও মানসিকভাবে তারা ভেঙ্গে পড়তে শুরু করলো। অন্য কাজগুলোতে তাদের উৎসাহ কমে গেলো। পরম

আত্মীয় হলেও তাদের মধ্যে মামলার কারণে বিরোধ চরমে পৌছালো। বৈরী বাতাসে শরীর-মনে তারা ক্লান্ত হতে শুরু করলো। তাদের বিপন্ন অবস্থা দেখে বাদী পক্ষের উকিল গান্ধীজি বিবাদীপক্ষ তৈয়ব শেঠকে অনুরোধ করলেন মামলাটি আপসে মিটিয়ে ফেলতে। মামলার কারণে তাদের করুণ অবস্থা দেখে গান্ধীজির ওকালতি পেশার উপর আবারও ঘৃণার ঢেউ জেগে উঠলো। সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করবেন মামলার আপস-মীমাংসা করতে। দু'পক্ষকে মিলিয়ে দেবেন সম্প্রীতির বন্ধনে। হারিয়ে যাওয়া পরম আত্মীয়তার বন্ধনকে আবার প্রীতিময় অবস্থায় ফিরিয়ে আনবেন। উকিলের পেছনে টাকা ঢেলে তারা যেন আর মরিচিকার পেছনে ছুটে শক্তি খরচ না করে, অর্থ অপচয় না করে।

মামলার পক্ষদ্বয় গান্ধীজির শুভ উদ্যোগে নড়ে-চড়ে বসলো। অবশেষে শালিসে আপস-মিমাংসায় রাজি হলো। শালিসে বাদীপক্ষ আব্দুল্লাহ জিতলেন। মামলার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত তৈয়ব শেঠ শালিস বৈঠকে নির্ধারিত সাঁইত্রিশ হাজার পাউন্ড এককালীন পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলেন। গান্ধীজি আবারও তাদের আলোচনায় বসালেন। দ্বিতীয়বার শালিস বৈঠক হলো। অবশেষে আপস-মীমাংসায় সিদ্ধান্ত হলো তৈয়ব শেঠ সাঁইত্রিশ হাজার পাউন্ড একাধিক সহনীয় কিস্তিতে পরিশোধ করবে। অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে তৈয়ব শেঠ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

অনেক পরিশ্রম, অনেক ধৈর্য আর অনেক প্রজ্ঞায় গান্ধীজি মামলার দু'পক্ষ আত্মীয়কে শালিসে বসিয়ে দীর্ঘ দিনের পুঞ্জিভূত সমস্যার সমাধান করে শান্তির স্নিগ্ধ আলো জ্বালিয়ে দিলেন। দু'পক্ষকেই ধংসের শেষ প্রান্ত থেকে উদ্ধার করলেন। আপস-নিষ্পত্তিতে তারা আবার সমৃদ্ধির পথে হাঁটতে সাহস পেলেন। আবারও সামাজিক প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখলেন। আত্মীয়ের মধ্যে মামলা নামক বৈরী নদীর অশুভ-ধ্বংসাত্মক স্রোতধারাকে ফলপ্রসু আলোচনায় থামিয়ে দিলেন। শালিস করে আপসের পলিমাটিতে নির্মান করলেন সত্যিকার সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি। গান্ধীজি এভাবে ওকালতিতে সৃষ্টি করলেন আপস-মীমাংসার অনবদ্য নজির।

গান্ধীর ওকালতি জীবনের আরেকটি ঘটনা। এ'ঘটনাটিও মেডিয়েশনের ধারণাকে আরও স্বচ্ছ আলোয় প্রতিভাত করেছে। তাঁর মধ্যস্থতায় সহজ পদ্ধতিতে পারসি রুস্তমজি সমস্যার ঘেরাটোপ থেকে বেড়িয়ে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। মধ্যস্থতার মঙ্গলবার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে রুস্তমজি ঘটনার খুঁটিনাটির বিবরণ লিপিবদ্ধ করলেন। তারপর তা একটি চমৎকার ফ্রেমে বাঁধাই ক'রে তিনি তার অফিসঘরে টাঙিয়ে রাখলেন। ঘটনাটি হলো-

"একবার বিশ্রী এক ঝামেলায় পড়েছিলেন প্রয়াত পারসি রুস্তমজি, যাঁর নাম দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের ঘরে ঘরে প্রচারিত হত। তিনি দীর্ঘদিন আমার সহকর্মী ছিলেন, তাঁর কাজকর্মর খবরাখবর সবসময় আমাকে জানিয়ে রাখতেন। কিন্তু এইবারের ব্যাপারটি তিনি আমার কাছে চেপে গিয়েছিলেন। তিনি বোম্বে আর কলকাতা থেকে বিপুল পরিমাণ পণ্য আমদানি করতেন। মাঝে মাঝে চোরাই মালও আনতেন। শুল্কবিভাগের কর্তাদের সঙ্গে তাঁর খুব খাতির থাকায় কেউই তাঁকে সন্দেহ করতে চাইত না। কিন্তু এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে তাঁর ইনভয়েস নিয়ে প্রশ্ন উঠল, তাঁর অপরাধ ধরা পড়ে গেল। অনুতাপে দগ্ধ হয়ে তিনি আমার কাছে ছুটে এলেন। তাঁর গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল অশ্রু। তাঁকে শান্ত করে আমি এই আশ্বাস দিলাম যে আমার মতে তাঁর বাঁচবার পথ একটাই- সব কিছু কবুল করা।

তিনি বললেন, 'আমি তো আপনার কাছে সব কবুল করছি, সেটাই কি যথেষ্ট নয়?'

উত্তরে আমি বললাম, 'অন্যায়টা তো আপনি আমার প্রতি করেননি, করেছেন সরকারের প্রতি। তাহলে আমার কাছে দেওয়া স্বীকারোক্তি আপনাকে কী করে বাঁচাবে?'

আমরা ওঁর উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করলাম। তিনি আমার পরামর্শ মানতে রাজি হবেন বলে মনে হল না। পারসি রুস্তমজি কিন্তু আমার কথামতোই চলতে চাইলেন। আমি প্রস্তাব দিলাম শুল্কবিভাগের অফিসার এবং অ্যাটর্নি-জেনারেল উভয়েরই সঙ্গে আমি কথা বলব। এ-বিষয়ে মামলা শুরু করার ভার ওই দুজনের ওপরেই ন্যস্ত ছিল। আমি আরও প্রস্তাব দিলাম যে ওঁরা যে-টাকা

জরিমানা ধার্য করবেন, সেটা দিতে হবে পারসি রুস্তমজিকে; আর তাঁরা রাজি না হলে তাঁকে জেলে যেতে হবে। আমি তাঁকে বোঝালাম, আসল লজ্জার বিষয় তো জেলে যাওয়া নয়, অপরাধটা করা।

পারসি রুস্তমজি যে এককথায় সব মেনে নিলেন, তা বলতে পারব না। কিন্তু তাঁর মনের জোর ছিল। তিনি বললেন, 'ঠিক আছে। আমি তো আপনাকে বলেইছি যে আপনি যা বলবেন তাই আমি করতে প্রস্তুত।'

লোককে বুঝিয়ে রাজি করবার যে-শক্তি আমার ছিল তা এই মামলায় পূর্ণমাত্রায় কাজে লাগালাম। সংশ্লিষ্ট দুই অফিসারের সঙ্গেই দেখা করলাম। আমি যে সব কিছু খুলে বলছি, এটা তাঁদের ভালো লাগল। তাঁরা নিশ্চিত হলেন, আমি কিছু লুকোচ্ছি না। পারসি রুস্তমজির বিরুদ্ধে আনা মামলা কিছুটা নরম হল। যত টাকার চোরাই মাল তিনি আমদানি করেছেন বলে কবুল করেছেন, তার দ্বিগুণ অঙ্কের টাকা তাঁকে জরিমানা দিতে হল। উত্তরাধিকারী ও সহ-বণিকদের কাছে চিরস্থায়ী চেতাবনী স্বরূপ, শেঠ রুস্তমজি এই পুরো ঘটনাটার খুঁটিনাটি বিবরণ লিখে, ফ্রেমে বাঁধিয়ে, ঝুলিয়ে রেখেছিলেন তাঁর অফিসঘরে।"[১২]

আব্দুল্লাহ-তৈয়ব শেঠের ঘটনার স্নিগ্ধ আলোরেখায় গান্ধীজি সমস্যার গভীরে যেয়ে মানুষের ভালো-মন্দ আবার নতুন করে দেখতে শুরু করলেন। নতুন আঙ্গিকে নিজেকে উপস্থাপন করার সাহস সঞ্চয় করলেন। এই মামলার আপস-মীমাংসা থেকেই তিনি ওকালতির নতুন পাঠ নিলেন। টই-টম্বুর চৌবাচ্চা থেকে উপচে পড়া পানিতে আর্কিমিডিস নতুন সূত্র আবিষ্কার ক'রে যেমন চিৎকার করলেন ইউরেকা, ইউরেকা। এবার গান্ধীজি সমাজে উপচে পড়া সমস্যায় আবগাহন ক'রে আবিষ্কার করলেন আপস-মীমাংসার সূত্র। গান্ধীজি হয়তো আর্কিমিডিসের মতো ইউরেকা ইউরেকা বলে চিৎকার করলেন না। কিন্তু মনে মনে তিনি চিৎকার করলেন ইউরেকা, ইউরেকা। গান্ধীজির ইউরেকা চিৎকারে নেই কোন বিজ্ঞানের সূত্র। গান্ধীজির ইউরেকা চিৎকারে দেশ-সমাজ-বিশ্বে সৃষ্টি হলো সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধির নতুন দিগন্ত। সভ্যপৃথিবী গান্ধীজির আপস-মীমাংসার সূত্রে সমস্যা সমাধানে এখন নতুন

অংক কষছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতার ধ্বংসস্তুপে দাঁড়িয়ে এবং গান্ধীজির উদ্ভাবিত সূত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে আন্তর্জাতিক পরিসরে প্রতিষ্ঠিত হলো জাতিসংঘ। পক্ষদ্বয়ের মধ্যে বিরোধ নিস্পত্তিতে শুধু মামলা-মোকদ্দমা দায়েরই একমাত্র সমাধান নয়- আপস-মীমাংসার মাধ্যমেও সমস্যার সমাধান হতে পারে এ' নীতিতে বিশ্বাসী জাতিসংঘ আজও পৃথিবীব্যাপী আশার আলো জ্বেলে রেখেছে।

"আমি দেখিলাম যে, উকিলের কাজ উভয় পক্ষের ভেতর বিচ্ছেদ দূর করা।"[১৩]—পক্ষদ্বয়ের সমস্যা সমাধানে এ কথাটি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দাদা আব্দুল্লাহ-তৈয়ব শেঠের মামলাটিতে আপস-মীমাংসার পথে হেঁটে সফল হলেন গান্ধীজি। এ মামলা থেকে আপস-মীমাংসার প্রকৃত শিক্ষা নিয়ে সমস্যা সমাধানে শান্তিপূর্ণ সমঝোতায় উজ্জীবিত গান্ধীজি দীর্ঘ বিশ বছর মামলা পরিচালনার জন্যে কোর্ট-কাচারিতে যাতায়াত কমিয়ে দিলেন। অফিসে বসেই শত শত মামলায় বাদী-প্রতিবাদীর মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে শান্তিপূর্ণ আপস-মীমাংসা করতে শুরু করলেন। বাদী-প্রতিবাদী দুই পক্ষকে আলোচনার জন্যে বৈঠকে ডাকতেন। বিস্তারিত আলোচনা ক'রে আপস-মীমাংসায় দুই পক্ষকে সম্প্রীতির সুতোয় গেঁথে তিনি ওকালতিতে প্রকৃত নির্ভেজাল স্বাদের গন্ধ পেতেন।

> *"আমি দেখিলাম যে, উকিলের কাজ উভয় পক্ষের ভিতর বিচ্ছেদ দূর করা। এই শিক্ষা আমার মনে এমন বদ্ধমূল হইল যে, আমার বিশ বৎসরের ওকালতির ভিতর অধিকাংশ সময়ই অফিসে বসিয়া শত শত মামলার বাদী প্রতিবাদীর ভিতর মিটমাট করিতেই অতিবাহিত হইয়াছে। তাহাতে আমি কিছুই হারাই নাই। আত্মা ত হারাই নাই-ই-অর্থক্ষতি যে হইয়াছে এ কথাও বলা যায় না।"*[১৪]

দাদা আব্দুল্লাহ-তৈয়ব শেঠের মামলা আপস মীমাংসা করে ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে গান্ধীজি মনে করলেন তাঁর আর প্রিটোরিয়ায় থাকার প্রয়োজন নেই। ভাবলেন এবার ডারবান হয়ে তাঁর স্বদেশে ফেরার পালা।

দেশ অনুযায়ী বেশ

ইতোমধ্যে গান্ধীজি মানুষকে সামাজিক কাজে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত করলেন। মানুষের চেতনায় জাগরণের ঢেউ তুললেন। ভারতীয়দের ন্যায্য অধিকার আদায়েও সফল হলেন। আন্দোলনের সফল ভিত্তি নির্মাণে তিনি সামনে থেকে নেতৃত্ব দিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় সময়ের হাত ধরে গান্ধীজি মধ্যমণি হয়ে উঠলেন। সর্বোপরি আব্দুল্লাহ্-তৈয়ব শেঠের মামলায় শান্তিপূর্ণ আপস-মীমাংসা করায় দাদা আব্দুল্লাহ্ ব্যক্তিগত ভাবে গান্ধীজির উপর কৃতজ্ঞ ছিলেন। তিনি মনে করলেন দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের উজ্জীবিত করতে গান্ধীর বিকল্প নেই। গান্ধীজিকে সকলের সামনে পরিচয় ক'রে দেওয়ার মানসে তিনি একটি ভোজসভার আয়োজন করলেন। ভোজসভায় 'নাটাল মার্কারি' কাগজে ছোট্ট একটি খবর গান্ধীজির নজরে এলো। নাটালের আইনসভায় ভারতীয়দের ভোটাধিকারের বিষয়ে খবরটি ছাপা হয়েছিল। কারও নজরে না এলেও গান্ধীজির নজরে পড়লো খবরটি। সভায় তিনি বললেন- ভোটাধিকারে ভারতীয়দের বঞ্চিত করা হলে তার বিরুদ্ধে ভারতীয়দের আইনি লড়াই করা দরকার। তাঁর প্রস্তাবে আইনি লড়াই করার জন্যে একটি কমিটি গঠন করা হলো। লড়াই করতে অর্থের প্রয়োজন পড়লে তা প্রদানের প্রতিশ্রুতিও অনেকে দিলেন।

শুরু হলো গান্ধীজির নতুন আন্দোলন। গান্ধীজি সভা থেকে বেড়িয়ে আবেদনের খসড়া তৈরি করলেন। পাঠিয়ে দিলেন আইনসভায়। 'আইনি লড়াই' কমিটির নিয়মিত বৈঠক হতো দাদা আব্দুল্লাহর বাড়িতে। কমিটি থেকে অনুরোধ করা হলো প্রধানমন্ত্রী এবং স্পিকার যেন ভারতীয়দের ভোটাধিকার বিল পাশ না করেন। উপেক্ষিত হলো তাদের কাছে কমিটির অনুরোধ। অবশেষে পাশ হয়ে গেলো ভোটাধিকার বিল। কমিটি বুঝতে পারলো প্রবল জনমত সৃষ্টি ছাড়া লর্ড রিপন এবার থামবে না। তারা বিশ্বাস করতে শুরু করলো পাশ করা আইনটি একসময় প্রবল জনমতের জোয়ারে ভেসে যাবে। বিশ্বাসের সঙ্গে তাদের মধ্যে সৃষ্টি হলো আন্দোলনের তীব্র মানসিকতা। অল্প সময়ে সংগ্রহ করে ফেললো দশ হাজার ভারতবাসীর স্বাক্ষর। স্বাক্ষর যুক্ত দরখাস্তটি অবশেষে পাঠিয়ে দেওয়া হলো লর্ড রিপনের কাছে।

ভারতীয়দের ভোটাধিকার আন্দোলনে গান্ধীজি নিজেকে বিকল্পহীন নেতার ভূমিকায় উপস্থাপন করলেন। সবাই চিন্তা করলো আন্দোলনের এ পর্যায়ে গান্ধীজি দেশে ফিরে গেলে আন্দোলনের গতি থেমে যাবে। গান্ধীজিকে এ আন্দোলনে ভারতীয়দের বিশেষ প্রয়োজন। ভারতীয় ব্যবসায়ীরা গান্ধীজিকে আন্দোলনে সার্বক্ষনিক পেতে তাঁর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করলো। বিভিন্ন ব্যবসায়ীরা তাদের প্রতিষ্ঠানে আইনজ্ঞ হিসেবে গান্ধীজিকে নিয়োগ দিলো।

আন্দোলন এবং আইন পেশায় গান্ধীজি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর আর দেশে ফেরা হলো না। এবার তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন পাঁকা-পোক্তভাবে ওকালতি করবেন। 'দেশ অনুযায়ী বেশ' প্রবাদটি মাথায় রেখে গান্ধীজি মাথার পাগড়ি খুলতেও দ্বিধা করলেন না। ওকালতির সনদ পাওয়ার জন্যে দরখাস্ত করলেন। অনেক বাধা-বিপত্তি পেড়িয়ে রেজিস্ট্রারের সামনে গান্ধীজি প্রতিজ্ঞা করলেন ওকালতির প্রয়োজনে তিনি আর মাথায় পাগড়ি পড়বেন না। ওকালতির সনদ পেয়ে ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষায় এবং ভোটাধিকার আন্দোলনে সৃষ্ট মামলা-মোকদ্দমা পরিচালনায় তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন নতুন উদ্যেমে।

গান্ধীজি দেশ এবং জনগণের প্রয়োজনে পাগড়ি পড়ার মানসিকতা পরিহার করলেন। তিনি ভাবলেন- জাতির বৃহৎ স্বার্থের স্রোতধারায় ব্যক্তি পর্যায়ের ছোট ছোট স্বার্থকে ত্যাগ করতে হবে। তিনি বিশ্বাস করলেন ভারতবাসীর মঙ্গলের জন্য তাঁর মাথায় পাগড়ির চেয়ে বেশি প্রয়োজন ওকালতি। ভারতবাসীর অধিকার আদায়ে আইনি লড়াইয়ের জন্যে গান্ধীজির মাথা থেকে পাগড়ি নামানোর সিদ্ধান্ত এবং জজ মহোদয়ের কাছে তাঁর শপথ - এটাই হলো মেডিয়েশনের বীজতলা। এজন্যে পাগড়ি পড়ার অধিকার আদায়ের জন্যে দক্ষিণ আফ্রিকার আদালতে কোন মামলা করেননি গান্ধীজি। পরিস্থিতির প্রয়োজনে গান্ধীজি ওকালতির জন্যে পোশাক নির্বাচনে মধ্যস্থতা করে আবারও জানান দিলেন- তিনি আফ্রিকায় এসেছেন ঝগড়া-বিবাদে জড়ানোর জন্যে নয়। তিনি এসেছেন ঝগড়া-বিবাদগুলো আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতা করতে। তিনি এসেছেন সুখ-শান্তির পথে

সুদুরে হাঁটতে। পাগড়ি বিষয়ে মধ্যস্থতা না হলে হয়তো দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর ভাগ্যাকাশে দুঃখ-কষ্ট আরও দীর্ঘায়িত হতো। ভারতবাসী এতো সহসা পেতো না ভোটাধিকার। দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী দেখলো গান্ধীজি কী অপূর্ব মহিমায় বিদ্যমান সমস্যাগুলো আপস-মীমাংসায় সমাধান করছেন!গান্ধীজি কী অপূর্ব মহিমায় অহিংস পথে মেডিয়েশনের আলো ছড়িয়েছেন।

আগুনের পরশমনি ছোঁয়াও প্রাণে

'আগুনের পরশমনি ছোঁয়াও প্রাণে'- গানের কলির মতো গান্ধীজির এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়লো সবখানে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আদলে গান্ধীজি গড়ে তুললেন 'নাটাল ভারতীয় কংগ্রেস'। আব্দুল্লাহ হাজী আদম সভাপতি এবং গান্ধীজি সম্পাদক। হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, পার্সি, জৌন সকল ধর্মের মানুষ নাটাল ভারতীয় কংগ্রেসের ছায়াতলে এলো। প্রথম মাসেই তিনশো'র অধিক সদস্য পেলো সংগঠনটি। অদম্য মানসিক শক্তিতে গান্ধীজি অচিরেই মানুষের মনে আদর্শ নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেলেন। নাটাল ভারতীয় কংগ্রেসের সাংগঠনিক কাজের পাশাপাশি গান্ধীজি তাঁর লেখনীতে ফুটিয়ে তুললেন দক্ষিণ আফ্রিকার সমাজে চলমান সমস্ত অন্যায়-অবিচার। কংগ্রেসের সাংগঠনিক শক্তিতে এবং গান্ধীজির গঠনমূলক-প্রতিবাদী-জ্বালাময়ী লেখনীতে ইংল্যান্ড এবং ভারতের শাসককূলও নড়ে-চড়ে উঠলো। বিভিন্ন প্রত্রিকা গান্ধীজির আন্দোলন এবং লেখাকে সমর্থন করতে শুরু করলো। গিরমিটদের (চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক) দুঃখ-দুর্দশা দূর করতে গান্ধীজির নেতৃত্বে নাটাল কংগ্রেস দায়িত্ব নিলো।

১৮৯৪ সালে গিরমিটদের জন্যে বার্ষিক পঁচিশ পাউন্ড কর ধার্য করা হলে কংগ্রেস অহিংস প্রতিবাদে-আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লো। আন্দোলনের ফসল

তারা ঘরে তুলে নিল। পঁচিশ পাউন্ড এর পরিবর্তে কর ধার্য হলো তিন পাউন্ড। আন্দোলনের আংশিক ফসল পেয়ে গান্ধীজি থামলেন না। পঁচিশ পাউন্ড থেকে তিন পাউন্ড, তিন পাউন্ড থেকে শূন্য পাউন্ড-এ আনতে তিনি অবিরাম অহিংস আন্দোলন চালিয়ে গেলেন। তিনকে শূন্যে আনতে দীর্ঘ বিশ বছর গান্ধীজিকে অহিংস আন্দোলন সজিব রাখতে হলো।

দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজির উদ্যোগগুলো ব্যবচ্ছেদ করলে পাওয়া যায় গিরমিটদের আন্দোলন। তিনি অপূর্ব-মহিমায় অহিংসকে জীবনের ব্রত জেনে বিকশিত করলেন এ'আন্দোলনে। দৃশ্যত: অহিংস আন্দোলনকে বিশ্ববাসী নখহীন, দন্তহীন মনে করলেও এ আন্দোলন দক্ষিণ আফ্রিকার শাসকের শক্ত ভিত্তি কাঁপিয়ে দিলো। অবশেষে এ অহিংস আন্দোলন ভারতীয় জনগনের মন-মেজাজ জয় করে তাদের স্বাধীনতার স্বপ্নকে বাস্তবায়নের দ্বারপ্রান্তে এনে দিলো। অহিংস রীতি-নীতির অপরূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ গান্ধীজি অহেতুক কোন মামলা-মোকদ্দমা সৃষ্টি হতে দেননি। গান্ধীজির অহিংস নীতিতে সমাজ এবং রাষ্ট্র বিস্তীর্ণ পরিসরে দীপ্তময় আলোর সন্ধান পেলো। গান্ধীজির অহিংস আন্দোলনে ছিল না কোন দ্বেষ-বিদ্বেষ, ছিল না কোন অভিযোগ-অনুযোগ, ছিল না কোন প্রতিশোধ নেওয়ার ন্যূনতম উগ্র বাসনা।

দ্বেষ-বিদ্বেষ, অভিযোগ-অনুযোগ এবং প্রতিশোধ নেওয়ার উগ্র বাসনার গর্ভে জন্ম নেয় শত শত মামলা-মোকদ্দমা। কুলিব্যারিস্টার মামলা-মোকদ্দমার পথে হাঁটলে তিনি হয়তো টাকার পাহাড় গড়তেন। তিনি সেদিকে না হেঁটে - হেঁটেছেন অহিংসার পথে। তিনি জানতেন অহিংসার পথে কখনো কোন সমস্যার সৃষ্টি হয় না। কুলিব্যারিস্টার গান্ধীজি সারাজীবন বিরোধ নিষ্পত্তি করতে বিকল্প পথে হেঁটে আজ সারা পৃথিবীতে শ্রদ্ধা-সম্মানের পাহাড়ে স্বমহিমায় দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি আজ তাঁর ৫'৫" শরীরকে হিমালয়ের উচ্চতায় নিয়েও থেমে যাননি। আজ তিনি হানাহানির বিকল্প পথে হেঁটে আকাশ পানে তুলে ধরেছেন তাঁর জীর্ণ-শীর্ণ শরীরকে। মানুষকে ভালোবেসে, দেশ এবং দশকে ভালোবেসে প্রচলিত মামলা-মোকদ্দমার বিকল্প পথে হেঁটে গান্ধীজি নিজে শান্তি পেয়েছেন এবং মানুষকে শান্তি দিয়েছেন।

আমি কারো বিরুদ্ধে কোন নালিশ করবো না

সময়কাল ১৩ জানুয়ারী ১৮৯৭ সাল।

এদিন 'নাতাল'-এ ভিড়লো কুরল্যান্ড এবং নাদেরী স্টিমার। স্টিমার দু'টি ভারতবর্ষ থেকে নিয়ে এলো গান্ধীজিসহ আটশো ভারতীয়কে। দীর্ঘ সমুদ্রপথ অতিক্রম ক'রে যাত্রীরা ক্লান্ত-শ্রান্ত। তবুও তাদের বন্দরে নামতে দেয়া হলো না। অপরাধ তাদের নয়। অপরাধ শুধু একজনের। নাম তাঁর মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।

তাঁর অপরাধ ক্ষমার মতো নয়। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতবর্ষে এসে নাতালবাসীর বিরূদ্ধে বক্তব্য দিয়েছেন। নাতালবাসী ইউরোপীয়দের তিনি তীব্র সমালোচনা করেছেন! গান্ধীজি ক্রমাগতভাবে নাতাল শাসকগোষ্ঠীর দুর্নাম-কূৎসা রটিয়েছেন। গিরমিটদের উপর তিন পাউন্ড করারোপের তীব্র সমালোচনা ক'রে নাতালে বসবাসকারী ভারতীয়দের ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন! সুব্রহ্মন্যম্ নামের একজন শ্রমিক নির্যাতনের ঘটনাকে গান্ধীজি তাঁর বক্তব্যে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করেছেন। গান্ধীজির বিরুদ্ধে নাতালবাসী আরও একটি নতুন অভিযোগ আনলো। তিনি নাকি এ'যাত্রায় আটশো ভারতীয় এনে নাতাল ছেয়ে ফেলার ষড়যন্ত্র করছেন!

বক্তৃতায় গান্ধীজি ভারতবর্ষে যে বিষয়গুলো উপস্থাপন করেছেন ইতোপূর্বে তিনি সে বিষয়গুলো দক্ষিণ আফ্রিকায় বিভিন্ন বক্তৃতায় উল্লেখ করেছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় উল্লেখ করা ঘটনাগুলোই শুধু তিনি ভারতবর্ষে বক্তৃতায় বলেছেন। তবে দু'দেশে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন এবং পরিবেশনে পার্থক্য ছিল। গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকায় ঘটনাগুলো উপস্থাপন করেছিলেন অল্প লোকের উপস্থিতিতে, স্বল্প পরিসরে। দক্ষিণ আফ্রিকায় উপস্থাপিত ঘটনাগুলোই গান্ধীজি আরও মার্জিত এবং সংযত ভাষায় ভারতবর্ষে উপস্থাপন করলেন - অপেক্ষাকৃত একটু বড় পরিসরে,বেশি লোকের সমারোহে। গান্ধীজির বক্তব্যগুলো সে সময় দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রচার না

হওয়ায় নাতালবাসী ইউরোপীয়রা সে বিষয়ে কিছু জানতে পারতো না। ভারতে গান্ধীজির বক্তব্যগুলো তুলনামূলক বড় পরিসরে বেশি লোকের উপস্থিতিতে হওয়ায় প্রচার পেলো। সর্বোপরি রয়টারের সংবাদদাতা গান্ধীজির বক্তব্যগুলো প্রচারের জন্যে সংক্ষেপে তারযোগে পাঠাতেন। কখনো কখনো সংবাদ পরিবেশনে গান্ধীজির বক্তব্যগুলো সংক্ষিপ্ত করায় মূল বক্তব্য বিকৃত হয়ে পরতো। আবার সংক্ষিপ্ত সংবাদ শিরোনামও অনেক সময় ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বহন করে। বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচারিত গান্ধীজির বক্তব্যগুলো বিকৃতভাবে নাতালবাসীর নিকট পৌছানোর কারণে তারা গান্ধীজির উপর ক্ষুব্ধ হলো।

ক্ষুব্ধতায় নাতালবাসী যখন চরম পর্যায়ে, ঠিক তখন 'কুরল্যান্ড এবং নাদেরী' স্টিমার দু'টি ভারতবর্ষ থেকে নিয়ে এলো আটশো ভারতীয়কে। এদের সাথে গান্ধীজিও ছিলেন। ১৮৯৬ সালের ১৮ ডিসেম্বর নাতালে স্টিমার দু'টো নোঙর করলেও বন্দর কর্তৃপক্ষ কোন যাত্রীকে নামতে দিলো না। জারী করা হলো পাঁচদিন কোয়ারেন্টাইনে বন্দী থাকার আদেশ। ডাক্তার এসে যাত্রীদের পরীক্ষা করে বললেন- প্লেগ মড়কে আক্রান্ত ভারতবর্ষ থেকে যাত্রী এলে তাদের শরীরে তেইশ দিন পর্যন্ত বিষ থাকতে পারে। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী স্টিমার দু'টো বোম্বে বন্দর ত্যাগের দিন থেকে তেইশ দিন কোয়ারেন্টাইনে রাখতে নতুন আদেশ জারী করলো। মড়কের অযুহাত শুধু সাদা চোখে মূল্যায়ণের বিষয় নয়। ঘটনার নেপথ্যের ঘটনা হলো গান্ধীজিকে শ্বেতাঙ্গরা নাতালে নামতে দেবে না। আন্দোলনরত শ্বেতাঙ্গরা ভয় দেখালো যে, যাত্রীরা ভারতবর্ষে ফিরে না গেলে প্রয়োজনে তাদের সাগরের জলে ডুবিয়ে মারবে। ভয়ে ভীতু না হয়ে গান্ধীজি সবার সাথে মিশতে শুরু করলেন। মনোবল চাঙ্গা করতে খেলাধুলা পর্যন্ত শুরু করলেন। যাত্রীদের বোঝানো হলো বিপদে তারা যেন সাহস না হারায়। আটশো যাত্রীসহ কোয়ারেন্টাইনে বন্দী গান্ধীজি জাহাজে বড়দিন উৎযাপন করলেন। ক্যাপ্টেনও সেদিন যাত্রীদের ভালো খাদ্য পরিবেশন করলেন।

আটশো যাত্রী নিয়ে নাতাল দখলের অভিযোগে অভিযুক্ত গান্ধীজি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অনেক দেন-দরবার করার পরও তাদেরকে জাহাজ থেকে নামতে দেওয়া হলো না। আন্দোলনরত শ্বেতাঙ্গরা স্টিমারের যাত্রীদের হত্যা

করার হুমকি দিলে তারাও জানিয়ে দিলো যতই ক্ষতি হোক তারা জাহাজ থেকে নামবে এবং তারা তাদের অধিকার আদায় করবে। বেগতিক অবস্থায় অবশেষে আলাপ-আলোচনা ক'রে কর্তৃপক্ষ বত্রিশ দিন পর ১৮৯৭ সালের ১৩ই জানুয়ারী জাহাজ থেকে যাত্রীদের নামতে দিল। এখানেও মেডিয়েশনে গান্ধীজির ভূমিকা উজ্জ্বলভাবে লক্ষ্যণীয়।

সমস্ত যাত্রী নেমে গেলে স্টিমারে থাকলো গান্ধীজি এবং তাঁর পরিবার। সিদ্ধান্ত হলো ডকের সুপারিন্টেনডেন্ট সন্ধ্যায় তাদেরকে গন্তব্যে পৌছে দেবে। স্টিমারের এজেন্ট লাটেন স্টিমারের ক্যাপ্টেনকে বললেন গান্ধীজির পরিবারকে গাড়িতে পাঠিয়ে তিনি গান্ধীজিকে নিজ দায়িত্বে রোস্তমজি শেঠের বাড়িতে নিয়ে যাবেন।

'গান্ধীজি দিবালোকে শহরে প্রবেশ করুন, রাতের অন্ধকারে নয়'- লাটনের এরকম ইচ্ছেকে গুরুত্ব দিয়ে পরিবারের সদস্যরা জাহাজ থেকে নামলেন। গাড়ীতে চড়ে রোস্তমজির বাড়িতে গেলেন। অতঃপর লাটন এবং গান্ধীজি পায়ে হেঁটে পথচলা শুরু করলেন। দু'মাইল হেঁটে রোস্তমজির বাড়িতে পৌছানো দূরের কথা। তাঁরা রাস্তায় নামতেই শ্বেতাঙ্গরা গান্ধী গান্ধী বলে চ্যাঁচামেচি শুরু করল। ২/৪ জন চিৎকার করতে করতে ছুটে আসলে তারা ভয়ে রিক্সায় উঠতে চেষ্টা করলেন। শ্বেতাঙ্গদের ভয়ে রিক্সাওয়ালাও পালিয়ে গেল। উন্মত্ত-কর্কশ চিৎকারে অনেক শ্বেতাঙ্গ জড়ো হলো। অনেকের ভিড়ে লাটন থেকে গান্ধীজি পৃথক হয়ে গেলেন। ক্ষুব্ধ শ্বেতাঙ্গরা গান্ধীজির উপর ঢিল ও পঁচা ডিম ছুড়তে লাগল। একজন এসে তার পাগড়ি ফেলে দিল। কেউ কেউ লাঠি পর্যন্ত মারতে শুরু করল। গান্ধীজির একপর্যায়ে জ্ঞান হারানোর অবস্থা হলো। প্রতিরোধ নয়, প্রাণে বেঁচে থাকতে তিনি একটি বাড়ির রেলিং ধরে শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করলেন। তাতেও ক্ষান্ত হলো না ক্ষুব্ধ মানুষজন। গান্ধীজি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখানেও তাঁর উপর অনবরত কিল, ঘুষি পড়তে লাগল। ভাগ্য ভালো ঘটনাক্রমে ঘটনাস্থল দিয়ে যাচ্ছিলেন পুলিশের প্রধানকর্তার সহধর্মিনী মিসেস আলেকজান্ডার। তিনি গান্ধীজিকে ভালো জানতেন। বেগতিক অবস্থা থেকে তিনি গান্ধীজিকে রক্ষা করতে তার কাছে দাঁড়ালেন। রোদ না থাকলেও ছাতা খুলে আগলে

রাখার চেষ্টা করলেন গান্ধীজিকে। ইতোমধ্যে একজন ভারতীয় যুবক দৌড়ে থানায় খবর দিলে গান্ধীজিকে উদ্ধার করতে পুলিশ সুপারিনন্টেন্ডেন্ট আলেকজেন্ডার অতিরিক্ত পুলিশ পাঠালেন। গান্ধীজিকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যেতে চাইলেন। সুপারিটেন্টডেন্ট সাহেবের প্রস্তাবে গান্ধীজি বললেন- লোকে যখন নিজের ভুল বুঝবে তখন এমনিতেই শান্ত হয়ে যাবে। ভাবতে অবাক লাগে উন্মত্ত-ক্ষুব্ধ শ্বেতাঙ্গদের উপর তখনও গান্ধীজির ছিল অগাধ বিশ্বাস ।

পুলিশ বেষ্টিত গান্ধীজি ক্ষত-বিক্ষত শরীর নিয়ে রোস্তমজির বাড়ি পৌছালেন। সন্ধ্যার পর ঘন অন্ধকার থেকে উন্মত্ত শ্বেতাঙ্গদের স্লোগান গান্ধী নিজে শুনতে পেলেন। তারা স্লোগানে স্লোগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে চিৎকার করছে আর বলছে- 'গান্ধীজিকে আমরা চাই।'ক্ষুব্ধ প্রতিবাদীদেরনিয়ন্ত্রণ করতে পুলিশ সুপারিনন্টেন্ডেন্ট আলেকজ্যান্ডার হিমশিম অবস্থায় পড়লেন। ক্ষুব্ধ জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পরায় তিনি সংগোপনে খবর পাঠালেন। খবরানুযায়ী গান্ধীজি সিপাই-এর পোশাক পড়ে মাথায় বড় পিতলের তাওয়া বসিয়ে দু'জন ছদ্মবেশী ডিটেক্টিভের সঙ্গে গলিপথ দিয়ে রোস্তমজির বাড়ি ত্যাগ করলেন।

কৌশলে গান্ধীজিকে নিরাপদে পৌছানের পর পুলিশ সুপারিনন্টেন্ডেন্ট উন্মত্ত জনতার সঙ্গে রঙ্গ-নাটকে মেতে উঠলো। দায়িত্ব সম্পন্ন ক'রে রসিক পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট (সংক্ষেপে পু:সু) আলেকজান্ডার এবং হাজার হাজার গোঁড়া (মৌলবাদী) জনতার (সংক্ষেপে গোঁ:জ) মধ্যে যে সংলাপ হলো তা নাটুকেপনায় তুলে ধরা হলো:-

"পু:সু : তোমরা কি চাও?
গোঁ:জ : আমরা গান্ধীকে চাই।
পু:সু : তাঁকে নিয়ে কি করবে?
গোঁ:জ : তাঁকে পুড়িয়ে মারবো।
পু:সু : কেন, সে কি করেছে?
গোঁ:জ : ভারতবর্ষে আমাদের নামে মিথ্যা

অপবাদ দিয়েছে, আর হাজার হাজার ভারতীয় দিয়ে এই দেশ ছেয়ে ফেলতে চাচ্ছে।

পু:সু : কিন্তু সে যদি বাইরে না আসে তবে কি করবে?

গোঁ:জ : তাহলে এই বাড়িটা জ্বালিয়ে দিব।

পু:সু: : এখানে তাঁর স্ত্রী-পুত্র, অন্য স্ত্রীলোক ও ছেলেপুলে আছে। স্ত্রীলোক ও ছেলেপুলে পুড়িয়ে মারতে তোমাদের লজ্জা হবে না?

গোঁ:জ : সে তো আপনারই দোষ। আপনি যদি আমাদেরকে বাধ্য করেন তবে আমরা কি করব? আমরা তো আর কাউকে সাজা দিতে চাই না। গান্ধীকে এনে দিলেই চুকে যায়। দোষীকে আমাদের হাতে ফিরিয়ে দিবেন না, আর তাঁকে সাজা দিতে গেলে যদি অপরের ক্ষতি হয় তা হলে সে দোষ আমাদের-এই অভিযোগ করা কি আপনার পক্ষে ন্যায়সঙ্গত হচ্ছে?

পু:সু : (হাল্কাভাবে হেসে উত্তর দিলেন) গান্ধী তোমাদের মধ্য দিয়েই অন্যত্র গিয়ে নিরাপদে পৌছেছেন।

গোঁ:জ : (অবিশ্বাসের হাসিতে চেঁচাতে লাগলো) মিছে কথা-মিছে কথা।

পু:সু : তোমরা যদি তোমাদের বুড়ো সুপারিনন্টেন্ডেন্টের কথা বিশ্বাস না কর, তবে তোমাদের মধ্য থেকে তিন-চারজন লোকের একটি কমিটি করে দাও। কথা দাও যে, বাড়িতে আর কেউ ঢুকবে না। আর যদি তোমাদের কমিটি গান্ধীকে খুঁজে না পায় তবে তোমরা খুব শান্তভাবে

ফিরে যাবে। তোমরা আজ উত্তেজিত হয়ে পুলিশের কথা রাখনি। এতে পুলিশের দোষ নেই, তোমাদের দোষ। সে জন্য পুলিশ তোমাদের সাথে চালাকি করেছে। তোমাদের মধ্য দিয়েই তোমাদের শিকার নিয়ে পালিয়ে গেছে। তোমরা হেরে গিয়েছো। এতে পুলিশকে দোষ দিও না। তোমরাই যে পুলিশ রেখেছ, সেই পুলিশই তাদের কর্তব্য পালন করেছে।"(১৫)

গোঁড়া জনতার সাথে হাস্যোজ্জ্বল মুখে খুব মিষ্টভাবে পুলিশ সুপারিনন্টেন্ডেন্ট সংলাপ শেষ করলেন। তার কথানুসারে বাড়ির ভেতর প্রবেশের জন্যে উন্মত্ত জনতা কমিটি গঠন করলো। কমিটির লোকজন শেঠ রুস্তমজীর বাড়ির কোণায় কোণায় তল্লাসী করলো। কোথাও গান্ধীজির হদিশ পেলো না। নিরাশ হয়ে শূন্য হাতে বাড়ি থেকে তারা বের হলো। অতিকষ্টে বিষন্নতায় কমিটির লোকজন উন্মত্ত জনতার কাছে স্বীকার করলো সুপারিনন্টেন্ডেন্টের কথাই ঠিক। তিনি আজ বিজেতা। আমরা পরাজিত। তিনি আমাদের কৌশলে হারিয়েছেন। কমিটির কথা শুনে উন্মত্ত জনতা নিরাশ হলো। বিষাদে রুদ্ধ হলো তাদের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। কষ্টে তারা বরণ ক'রে নিলো তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি। শেঠ রুস্তমজীর বাড়ী-ঘরের কোন ক্ষতি না ক'রে অবশেষে তারা ফিরে গেল।

মন্ত্রী চেম্বারলেন গান্ধীজিকে অনুরোধ করলেন তাঁর উপর যে অত্যাচার হয়েছে তার প্রতিকার চেয়ে তিনি যেন আদালতে নালিশ করেন। নালিশের পর বিচার পেতে গান্ধীজির কোন সমস্যা হলে প্রয়োজনে তারযোগে বিষয়টি তিনি আদালতকে অবহিত করবেন। সরকারি উকিল এসকম্ব গান্ধীজিকে আক্রমণের ঘটনায় কষ্ট পেলেন, মর্মাহত হলেন। তিনি গান্ধীজিকে বললেন লাটনের কথানুযায়ী নির্দ্ধারিত সময়ের আগে জাহাজ থেকে নেমে তিনি ঠিক কাজটি করেননি। পরিনামে যেটুকু বিপদ হয়েছে এর চেয়ে বড় বিপদ

এমনকি গান্ধীজির জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হতে পারতো। গান্ধীজিকে মন্ত্রী চেম্বারলেনের মনোভাবের কথা উল্লেখ করে বললেন তিনিও চেয়েছেন গান্ধীজিকে যারা আক্রমণ করেছে তাদের বিরূদ্ধে গান্ধীজি যেন মামলা করেন। মামলা করলে আক্রমণকারীদের তিনি ধরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। মামলা করার প্রস্তাব গান্ধীজি বিনয়ের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করলেন। গান্ধীজি বললেন তিনি কারও বিরুদ্ধে কোন নালিশ করবেন না। হামলা ও হাঙ্গামাকারী ২/১ জনকে চিনলেও মামলা করে তাদের সাজা দিতে তাঁর অন্তরাত্মা কষ্টে কেঁপে উঠলো। হামলাকারীদের ক্ষমা করতে তাঁর কোমল হৃদয়ে জেগে উঠলো ভালোবাসা, প্রেম আর সহানভুতির উত্তাল ঢেউ।

গান্ধীজির এই মহানুভবতায় শ্বেতাঙ্গরা লজ্জিত হলেন। তাঁর মহানুভবতার গল্প অল্প সময়ের মধ্যে ইথারে ইথারে ভেসে বেড়াতে শুরু করলো। দক্ষিণ আফ্রিকার পত্রপত্রিকাগুলোও তাঁকে সমর্থন দিতে দ্বিধা করলো না। উন্মত্ত জনতা তাঁর বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে যে দোষ দিয়েছিল তাও সবার কাছে দিবালোকের মতো ফুটে উঠলো। প্রমাণ হয়ে গেল তাদের উত্থাপিত অভিযোগগুলো আসলে ছিল গান্ধীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের ফসল।

গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকায় একজন ভিনদেশী-ভারতীয়। অনেক পরিশ্রম করে কোর্ট-কাচারীতে তাঁর অবস্থান মজবুত করেছিলেন। পরিশ্রম এবং সংগ্রাম করে একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যারিস্টার তাঁর চলমান জীবনে লাথি-ধাক্কা খেয়ে, নিক্ষিপ্ত পঁচা ডিমের গন্ধ সহ্য করে ও ঢিল-পাটকেলের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত শরীরে বহন করেছেন অহিংসার শ্বাশত বাণী। রক্তাক্ত শরীর নিয়ে গান্ধীজি মনেপ্রাণে কখনও সংক্ষুব্ধ হয়ে দৃশ্যমান ফৌজদারী আইনের আশ্রয় নেননি। কোন বিচার প্রার্থনা করেননি। গান্ধীজি বুঝতেন এবং বিশ্বাস করতেন মামলা-মোকদ্দমায় সাময়িক মানসিক প্রশান্তি আসতে পারে কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে মামলা-মোকদ্দমার ফলে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিদ্বেষের বীজ রোপিত হয়। পরবর্তীতে তা বিদ্বেষের বিষবৃক্ষে রূপান্তরিত হয়ে নানা অপরাধের ডালপালা ছড়াতে থাকে।

* * *

গ্রন্থসহায়:

(১) পৃষ্ঠা: ২৩৬
আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর
আবুল মনসুর আহমদ
প্রথমা প্রকাশন

(২) পৃষ্ঠা: ৩৮৬
প্রবন্ধ: গান্ধী হত্যার রাজনীতি
আশিষ নন্দী
গান্ধী পরিক্রমা
সম্পাদনা: শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়; ব্যারাকপুর

(৩) পৃষ্ঠা: ৩৯২
আশিষ নন্দী
সম্পাদনা: শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রাগুক্ত

(৪) পৃষ্ঠা: ৩৯২
আশিষ নন্দী
সম্পাদনা: শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রাগুক্ত

(৫) পৃষ্ঠা: ৩৯৩
আশিষ নন্দী
সম্পাদনা: শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রাগুক্ত

(৬) পৃষ্ঠা: ৭৩
আত্মকথা অথবা সত্যের প্রয়োগ
মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী
ইংরেজী থেকে অনুবাদ: সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত
নবজীবন পাবলিশিং হাইজ; আমেদাবাদ

(৭) পৃষ্ঠা: ৭৩-৭৪
মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী
ইংরেজী থেকে অনুবাদ: সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত
প্রাগুক্ত

(৮) পৃষ্ঠা: ৯৯
মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী
ইংরেজী থেকে অনুবাদ: সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত
প্রাগুক্ত

(৯) পৃষ্ঠা: ১০০
মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী
ইংরেজী থেকে অনুবাদ: সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত
প্রাগুক্ত

(১০) পৃষ্ঠা: ১০০
মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী
ইংরেজী থেকে অনুবাদ: সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত
প্রাগুক্ত

(১১) পৃষ্ঠা: ১০১
মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী
ইংরেজী থেকে অনুবাদ: সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত
প্রাগুক্ত

(১২) পৃষ্ঠা: ১২৬-২৭
আমার জীবনের আদিকাণ্ড
মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী
বঙ্গানুবাদ: আশীষ লাহিড়ী
OXFORD UNIVERSITY PRESS

(১৩) পৃষ্ঠা: ১০৩
মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী
ইংরেজী থেকে অনুবাদ: সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত
প্রাগুক্ত

(১৪) পৃষ্ঠা: ১০৩
মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী
ইংরেজী থেকে অনুবাদ: সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত
প্রাগুক্ত

(১৫) পৃষ্ঠা: ৫৭
মহাত্মা গান্ধীর নির্বাচিত রচনা: *VOL.II*
দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ
নবজীবন পাবলিশিং হাউজ; আমেদাবাদ

তোমাকে পেয়েছি অনেক মৃত্যু-উত্তরণের শেষে

বঙ্গদেশে ঘরগেরস্তালির আদিকাব্য

ছন্দময় গতিশীল শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে ভারতবর্ষের হাজার বছরের গৌরব। এখানকার সনাতনধর্মকে মনে করা হয় পৃথিবীর প্রাচীন ধর্মের একটি। বিভিন্ন গবেষণায় এ'তথ্য-উপাত্ত উঠে এলেও এ'অঞ্চলের ভূপ্রকৃতির বর্ণনা খুব একটা বেশি আমরা পাইনি। চৌদ্দ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে মরক্কোর পর্যটক ইবনে বতুতার বর্ণনায় ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের একটা চিত্রকল্প আঁকতে পারি। তাঁর পষ্টাপষ্টি বর্ণনায় গ্রামীণ জীবনের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা আমাদের মানসপটে ভেসে ওঠে। তিনি ভ্রমণ কাহিনীতে লিখেছেন—

> *"আমরা পনেরো দিন নদীর দু'পাশে সবুজ গ্রাম ও ফল-ফলাদির বাগানের মধ্য দিয়ে নৌকার পাল তুলে চলেছি, মনে হয়েছে যেন আমরা কোনো পণ্যসমৃদ্ধ বাজারের মধ্যদিয়ে চলছি। নদীর দু'কূলে জমিতে জল সেচের পানিকল, সুদৃশ্য গ্রাম ও ফলের বাগান, যেমনটি রয়েছে মিশরের নীল নদের দুই তীরে।"*(১)

ইবনে বতুতার এই বর্ণনা থেকে আমরা বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনযাত্রা পাই। নদীর দু'পাশে সবুজ গ্রামের যে বর্ণনা— তা

প্রাকৃতিকভাবে গড়ে উঠেছে, নাকি বসবাস করার জন্যে মানুষ সৃষ্টি করেছে— তা আজও গবেষণার বিষয়। বঙ্গদেশে জঙ্গল পরিষ্কার করে গ্রামভিত্তিক বসতি গড়ে তোলা প্রসঙ্গে আকবর আলী খান-এর তথ্য-তত্ত্ব-বিশ্লেষণ নিম্নরূপ—

"ইটন স্বীকার করছেন যে জঙ্গল পরিষ্কার করে জমিতে আবাদ বাংলাদেশের ইতিহাসে দীর্ঘদিন ধরে চলছে। স্থানীয় অধিবাসীরা ব্যক্তিগত উদ্যোগে এ কাজ হাজার হাজার বছর ধরে করেছে। ষষ্ঠ শতকে ফরিদপুর শিলালিপিতে নব্যবাসিকা বা নবগঠিত ভূমিতে বসতি স্থাপনের বর্ণনা রয়েছে। মুসলমানরা বাংলায় আসার অনেক আগে থেকেই বাংলায় জঙ্গল পরিষ্কার করে নতুন বসতি করা হচ্ছিল। ১৩৪৯-৫০ সালে একজন চীনা পরিব্রাজক বাংলায় এসেছিলেন। তিনি বাংলার কৃষকদের সম্পর্কে লেখেন— 'These people owe all their tranquility and prosperity to themselves, for its source lies in their devotion to agriculture whereby a land originallly convered with jungle has been reclaimed by their unremitting toil in tilling and planting.' তবে ষোড়শ শতকে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় যেসব চর জেগে ওঠে তা ছিল উপকূলীয় বাদা অঞ্চল (mangrove forest)। এ ধরনের অঞ্চলে শুধু বন পরিষ্কার করাই বসতির জন্য যথেষ্ট ছিল না, বাঘ ও কুমিরের হাত থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতে হতো, লোনা পানি যাতে প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য ব্যবস্থা নিতে হতো এবং বাদাবনের গাছের সব শিকড় তুলতে অনেক কষ্ট করতে হতো। পাঁচ শ বছর ধরে বাংলায় শুধু বাদাবন পরিষ্কার করেই বসতি স্থাপন করা হয়নি। বাংলায় আরও দুই ধরনের বন ছিল। বাংলাদেশের বিভিন্ন উঁচু জায়গাতে শালবন ছিল। পাহাড়ি অঞ্চল (বিশেষ করে আসামসংলগ্ন অঞ্চলে) চিরসবুজ বন ছিল। এ ধরনের জঙ্গল পরিষ্কার করার জন্য ব্যক্তি উদ্যোগই যথেষ্ট ছিল। এ ধরনের বন পরিষ্কারের জন্য উদ্যোগী-পীরের দরকার ছিল না। বাংলায় মোট বনভূমির মাত্র পাঁচ শতাংশ ছিল বাদাবন। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে এই বাদাবনের অধিকাংশই চাষের আওতায় আনা সম্ভব হয়নি।

ব্রিটিশ শাসন আমলে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার বাদাবন পরিষ্কার করা উৎসাহিত করে কৃষি ভূমির পরিমাণ বাড়িয়েছে। কাজেই পীরদের (যা ইটন অনুমান করেছে ঘটেছে) প্রতিষ্ঠিত বসতি বাংলার মুসলমান জনসংখ্যার বড়জোর একটি ক্ষুদ্র অংশ হতে পারে।"[২]

আকবর আলি খান-এর উপরোক্ত বিশ্লেষণে আমরা দেখতে পাই বঙ্গীয় ব-দ্বীপে বসতি গড়ার জন্যে মানুষ ছোট ছোট গ্রামকে বেছে নিতো। আবার পশ্চিম বাংলার গ্রামগুলো ছিলো অপেক্ষাকৃত বড়। সেখানে জনসংখ্যাও বেশি বাস করতো। দু'বাঙলার গ্রামগুলোর আকার-আকৃতিতে পার্থক্যের মূল কারণ কী হতে পারে সে ব্যাপারে কোন তথ্য-তত্ত্ব আকবর আলি খান উপস্থাপন করেননি। সে যাই হোক। বিষয়বস্তুর আর একটু গভীরে প্রবেশের জন্যে আবার আমরা আকবর আলি খানের কাছেই ঋণী। তাঁর লিখা থেকে উদ্ধৃত করা হলো—

"উন্মুক্ত গ্রামের একটি বড় লক্ষণ হলো ছোট গ্রাম। যেখানে বড় গ্রাম হয় সেখানে প্রাতিষ্ঠানিক সংঘবদ্ধতা গড়ে ওঠে। প্রাচীন বাংলায় ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে পূর্ব বাংলায় বেশির ভাগ গ্রাম ছোট ছিল এবং পশ্চিম বাংলার বেশির ভাগ গ্রাম বড় ছিল। ঐতিহাসিক উপকরণাদি ইঙ্গিত দেয় যে প্রাচীনকালে বাংলাদেশ অঞ্চলের গ্রাম পশ্চিম বাংলার চেয়ে অনেক ছোট ছিল। গোবিন্দ কেশর-এর ভাট্টেরা তাম্রফলক (আনুমানিক ত্রয়োদশ শতাব্দী) ইঙ্গিত দেয় যে সিলেট জেলায় গ্রামের গড় আয়তন ছিল ৪৬৮ একর (২৮টি গ্রামের উপাত্তের ভিত্তিতে) এবং প্রতি গ্রামে খানার গড় সংখ্যা ছিল মাত্র ১০.৫। এখানে উল্লেখ করা যায়, ১৮৯১ সাল থেকে পরিচালিত সকল শুমারিতেই দেখা গেছে সিলেটের গ্রামের গড় জনসংখ্যা বাংলাদেশের নিরিখে সর্বদাই সর্বনিম্ন ছিল। তপর্ণদীঘি তাম্রফলক অনুসারে (আনুমানিক দ্বাদশ শতাব্দী) বিক্রমপুরের বেলহিস্তি গ্রামে ছিল ২০০.১ একর জমি। প্রতিতুলনায় পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম বাংলার গ্রাম ছিল আয়তনে বড় এবং তাতে ছিল অধিকসংখ্যক লোকের বাস। বল্লাল সেনের নৈহাটি তাম্রফলকে (দ্বাদশ শতাব্দী) লেখা আছে যে বর্ধমানে বল্লালহিথা গ্রামে পতিত জমি ও নৌচলাচলের জায়গাসহ ১৯১৬.১৫

একর জায়গা ছিল। লক্ষ্মণ সেনের (দ্বাদশ শতাব্দী) গোবিন্দপুর তাম্রফলকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বর্ধমানের বিদ্যাশাসন গ্রামের আয়তন ছিল ৪০০.৫ একর (পতিত জমি ও বনভূমিসহ), (রায়, চতুর্দশ শতাব্দী)। যদিও বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলা অঞ্চলের গ্রামের আয়তন সম্পর্কিত ঐতিহাসিক তথ্যাদি অপ্রতুল, তবু এ ধরনের প্রমাণাদির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ যে সিদ্ধান্ত সমর্থন করে তা গ্রামীণ বসতির ধরন সম্পর্কিত সাম্প্রতিক নৃতাত্ত্বিক গবেষণার সিদ্ধান্তের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ধারণা করা যায়, বাংলাদেশে ক্ষুদ্র গ্রামের সংখ্যাধিক্য বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।"(৩)

তবে নদী-নালা-খাল-বিলে পরিপূর্ণ ভারতবর্ষের বঙ্গদেশে সমতল ভূমিতে কৃষির অপার সম্ভাবনা দেখে মানুষ বসতি স্থাপন শুরু করেছে— এটা ঐতিহাসিক সত্য। ভেবে নেয়া যায় নতুন বসতি স্থাপনের সময় মৎস্য আহরণের দিকেও তাদের দৃষ্টি ছিল। নৌকোয় পাল তুলে যেতে যেতে ইবনে বতুতার মনে হয়েছে তারা যেন পণ্যসমৃদ্ধ হাট-বাজারের মধ্য দিয়ে চলছে। ইবনে বতুতা ভারতবর্ষের জীবনযাত্রাকে মিশরের নীল নদের দুই তীরে গড়ে ওঠা সভ্যতার সাথে তুলনা করেছেন। অর্থাৎ ভারতের জনগন তাদের জীবিকা হিসেবে কৃষি এবং মৎস্যকে প্রাধান্য দিয়ে এসেছে। সমতল ভূমিতে তারা বনায়ন, ফসল উৎপাদন এবং জলাধারে মাছ শিকার করে তাদের জীবন-জীবিকা নির্বাহ করতো। ফসল ও অন্যান্য কৃষিপণ্য উৎপাদন করে, মাছ শিকার করে, নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে অতিরিক্ত পণ্য বিক্রির জন্যে নদীর ধারে নিয়ে যেতো। জলপথই তাদের যোগাযোগের জন্য ছিল একমাত্র ভরসা। এজন্য জলাধারের পাশে গড়ে উঠতে শুরু করলো বসতি, বন্দর, হাট-বাজার। কৃষিকাজ এবং মাছ শিকারের সাথে সাথে জীবন-জীবিকার জন্য এ' অঞ্চলের মানুষজন নতুন পেশা হিসেবে ব্যবসা-বানিজ্যকে বেছে নিতে শুরু করলো। সময়ের বিবর্তনে এই ব্যবসা-বানিজ্যই বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করলো ভারতবর্ষে।

মান্ধাতার চৌকাঠ পেরিয়ে

ভারতবর্ষে ভারী শিল্প-কলকারখানা প্রতিষ্ঠার পূর্বে শ্রমিকরা কাজ করতো নিজের এলাকায় চিরচেনা পরিবেশে। কাজের স্থান, মালিক, সহশ্রমিক সবই ছিল তাদের পরিচিত। সবকিছু ছিল অনুকূলে। প্রতিবছর প্রায় একই ধরণের শস্য চাষাবাদ এবং উৎপাদন করতো। সুযোগ মতো নদী-খাল-বিলেমাছ শিকারেও তাদের কোন সমস্যা হতো না। এরপর ইংরেজ শাসনামলে ভারতবর্ষে বিজ্ঞান এবং নতুন কাজ-কর্ম একসাথে হাত ধরাধরি করে প্রবেশ করলো। প্রতিষ্ঠিত হলো কলকারখানা। শুরু হলো অচেনাকে জানার সুযোগ, তৈরি হলো নুতন নতুন কাজের ক্ষেত্র। মান্ধাতার আমলের মৎস্য শিকার, হালচাষ, ফসল উৎপাদন, ফসলকাটা, ব্যবসা-বাণিজ্যের বাইরে এসে শ্রমিকরা ঝাঁপিয়ে পড়লো নতুন কলকারখানায়, নতুন কর্মপরিবেশে। কারখানার মালিকদেরও বেশি বেশি শ্রমিকের প্রয়োজন পড়লো।

শাসনপর্ব তথা ক্ষমতার মসনদে বসবার পূর্বে ব্রিটিশ ভারতে এসেছিল ব্যবসা-বাণিজ্য করতে। বণিক হিসেবে শতভাগ সফল হওয়ায় তাদের একসময় মসনদে বসবার খায়েশ হলো। ১৬০০ সালে ইংল্যান্ডের কয়েকজন বণিক 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি'র ব্যানারে ভারত তথা পূর্ব এশিয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য এলো। মোগলসম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে ১৬০৮ সালে তারা বাণিজ্য করার জন্যে প্রথম সুরাটে এবং পরবর্তীতে হুগলিতে কুঠি নির্মাণ করলো। এর ধারাবাহিকতায় ১৬৫৮ সালে 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি'র প্রতিনিধি জেম্‌স হার্টঢাকায় এসে আরেকটি বাণিজ্যকুঠি নির্মাণ করে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর প্রথম থেকেই লক্ষী ভর করলো। এজন্য তারা ১৭১৫ সালে মোগল সম্রাটের নিকট থেকেনিজস্ব মুদ্রা ব্যবহারের অনুমতি পেলো। ব্যবসা-বাণিজ্যে সফলতার পর 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' সরাসরি ক্ষমতায় আসার জন্যে প্রাক-প্রস্তুতিতে ভারতবর্ষে ভারী শিল্প-কলকারখানা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করলো।

ব্রিটিশ শিল্পপতিরা ভারীশিল্পকে পরিকল্পিতভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে ভারতবর্ষে প্রথমে রেললাইন বসানোর সিদ্ধান্ত নেয়। এ'দেশে যোগাযোগ ব্যবস্থায় জলপথের পর অবশেষে যুক্ত হলো রেলপথ। ১৮৫১ সালের ২২ ডিসেম্বর থেকে মানুষজন রেলে যাতায়াত শুরু করলো এবং এক স্থান থেকে আরেক স্থানে পণ্য পরিবহনে রেলব্যবস্থাকেকাজে লাগালো। যোগাযোগ ব্যবস্থায় রেল যুক্ত হবার পর ১৮৫৮ সালে 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' থেকে শাসন-ক্ষমতা ব্রিটিশ রাজশক্তির হাতে হস্তান্তরিত হলো। এরপর অবিভক্ত বাঙলায় রানীগঞ্জ-আসানসোলে কয়লাখনিতে পুরোদমে কাজ শুরু হলো। বাঙলার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে শ্রমিকরা এসে কয়লা খনিতে কাজ শুরু করলো। বাঙলায় ভারী শিল্পের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো সারা ভারতে। বাছবিচার ছাড়াই নানা জায়গার, নানা ভাষার দক্ষ-অদক্ষ শ্রমিকরা কাজ পেতে শুরু করলো। আবার কাজ সংগ্রহ করতেও তাদের আর কোন বেগ পেতে হলো না। কয়লা শিল্পে ঈর্ষনীয় সফলতার হাত ধরে হুগলী জেলায় প্রতিষ্ঠিত হলো চটকল। একপর্যায়ে শিল্প-কলকারখানা স্থাপনে শুরু হলো ইংরেজ শিল্পপতিদের মধ্যে চরম প্রতিযোগিতা। ফলে অল্প সময়ে দ্রুত গঙ্গার দু'পাড়ে বেশ ক'টা চটকল প্রতিষ্ঠিত হলো। কাজের সন্ধানে স্বচ্ছল জীবন-যাপনের মোহে শ্রমিকরা এসে ভিড় করলো এসব শিল্প-কলকারখানায়। যোগাযোগে বাঙলায় রেল পথ যুক্ত হওয়ার বেশ পূর্বেই মুম্বাইকে কেন্দ্র করে রেলপথ যুক্ত হওয়ায় সেখানে বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

অনেক জীবন পেরিয়ে ভারতের শ্রমিকরা অবশেষে নিত্যদিনের অভাব-অনটনকে জয় করতেশিল্প-কলকারখানায় কাজ পেতে হন্যে হয়ে ছুটলো। অতিক্রম করতে শুরু করলো মান্ধাতার চৌকাঠ। সদ্য গড়ে ওঠা কলকারখানায় কাজ পেয়ে তারা আন্তরিক পরিশ্রমে ঢেলে দিতে শুরু করলো তাদের ঘর্মাক্ত শ্রম। ক্লান্তিকর শ্রমে দিনমান নিবেদিত আত্মভোলা শ্রমিকের সারল্যপনার সুযোগে ব্রিটিশ একপর্যায়ে তাদের কৃতদাস ভাবতে শুরু করলো। খেটে খাওয়া শ্রমিকদের অল্প মজুরিতে বেশি শ্রম দিতে বাধ্য করলো। বাধাহীন-লাগামহীন কর্তৃত্বের কারণে ব্রিটিশ মালিকরা হয়ে উঠলো স্বৈরাচারী। অমানসিক পরিশ্রমের বিনিময়ে অল্প মজুরি পেয়ে শ্রমিকরা শুধু অর্থনৈতিক ভাবে বঞ্চিত হলো না। তাদের ক্লান্ত শরীরে, অবসন্ন মনে

মালিকরা চাপিয়ে দিতে শুরু করলো অত্যাচার-নিপীড়নের নানা কালো আইন-কানুন।

উদয়াস্ত পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত শ্রমিকরা তাতেও করতো না কোন বাদ-প্রতিবাদ। 'অল্প মজুরীতে বেশী শ্রম'-কথাটি যেন তাদের ভাগ্যের লিখন। সবকিছু অবলিলায় মেনে নিতে শুরু করলো। দশজন, বিশজন শ্রমিক মিলিত হবে, আড্ডা-খোশগল্প করবে- সে সম্ভাবনার চিত্রকল্পও কখনো তাদের মধ্যে সৃষ্টি হলো না। কারখানায় শ্রমিকরা শ্রম দিতে এসেছে তাদের ঘর-গৃহস্থালীর চিরপরিচিত গন্ডি অতিক্রম ক'রে, অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষায় গড়ে ওঠা মমতায় ঘেরা পরিবার-পরিজন ছেড়ে। তারা এসেছে অনেক কষ্টশ্রমে তিলোত্তমায় গড়ে তোলা সবুজ-শ্যামল স্নিগ্ধ গ্রাম ছেড়ে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ-গোষ্ঠী-সমাজ-বর্ণ থেকে। তারা এসেছে রবিঠাকুরের গানের মতো 'অনেক কথা যাও যে ব'লে কোনো কথা না বলি'-এরকম দূর্ভেদ্য ভাষাভাষীর লোকালয় থেকে। তারা কেউ কাউকে বোঝে না। ভাষা তাদের অদৃশ্য কাঁচের দেয়াল। সামাজিক রীতি-নীতিতেও নেই কোনো সাদৃশ্যতা। এমনকি একজনের বিপদে অন্যজনের সহানুভূতি প্রকাশ করার মতো সামান্য দায়বোধও সৃষ্টি হলো না তাদের মধ্যে। অথচ প্রতিটি শ্রমিকের সমস্যা এক। ধরণও এক। এক একজন শ্রমিক এক একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। কেউ কারো সাতে-পাঁচে নেই। এ' অবস্থায় তাদের প্রয়োজন পড়লো শ্রমিক সংস্কৃতি গড়ে তুলতে। তাদের মধ্যে কোন ঐকতান সৃষ্টি না হবার কারণে সাহস দেখিয়ে বিড়ালের গলায় ঘন্টি বাধতে কেউ এগিয়ে এলো না।

হাড়ভাঙ্গা শ্রমে দিন শেষে সামান্য অর্থ পেলে তাতেই যেনো শ্রমিকের সব পাওয়া হয়ে যায়। একঘেয়ে জীবনের কষ্ট-ক্লান্তি ভুলতে তারা শুরু করলো নেশা। সেই সাথে কষ্ট-ঘামে অর্জন করা সামান্য অর্থ তারাঅপচয় করতে শুরু করলো সস্তা বিনোদনে। বিনোদনের নামে জড়িয়ে পড়লো বিভিন্ন অনৈতিক-অসামাজিক কাজে। গণিকাবিলাসেও তারা মেতে উঠলো। অশিক্ষা-কুশিক্ষায় বেড়ে ওঠা সহজ-সরল শ্রমিকরা তাদের এই অসামাজিক এবং অনৈতিক কাজে কোনো অপরাধের গন্ধ পেলো না। এ যেন তাদের

কষ্টের বহতা নদীকে অল্প সময়ের জন্যে বালির বাধ দিয়ে আটকানোর একটা অপকৌশল মাত্র!

পূর্বেই বলা হয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে পর্যাপ্ত শ্রমিক না পাওয়ায় অন্য এলাকা থেকে শ্রমিক আমদানি শুরু হলো কলকারখানায়। বিশেষ ক'রে অল্প পারিশ্রমিকে স্থানীয় শ্রমিকরা শ্রম দিতে অনিহা দেখালে দূর-দূরান্তের লোকজন অল্প টাকার মজুরিতে আসতে শুরু করলো। ফলে মালিকরা অল্প পূঁজিতে উৎপাদন ব্যবস্থায় বেশি লাভের মুখ দেখতে শুরু করলো। শ্রমিকের কম মজুরিতে কলকারখানায় বেশি বেশি উৎপাদন অর্থই হলো বেশি বেশি লাভ। এই নীতিতে অতি লোভে ইংরেজ মালিকরা বেশি লাভের আশায় অল্প পারিশ্রমিকে দূরাগত শ্রমিকদের বেশি কাজ করতে বাধ্য করতো। অল্প বেতনে বেশি শ্রম দেওয়ায় শ্রমিকরাও হাঁপিয়ে উঠলো। কাজ করতে অনিহা দেখালে শ্রমিকের উপর তারা অত্যাচার-নির্যাতন-নিপীড়ন শুরু করলো। নির্যাতন-নিপীড়নে শ্রমিকরা যেন দলবদ্ধ হয়ে কোনো প্রতিবাদ করতে না পারে- সেজন্যেই মালিকরা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন ভাষাভাষির শ্রমিক আমদানি করতো। আমদানিকৃত শ্রমিকগোষ্ঠী নানা অঞ্চলের, নানা ধর্মের, নানা ভাষাভাষির কারণে কখনো একতাবদ্ধ হয়ে কোন প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়তে পারেনি।

সবচে বড় সমস্যা হলো কাজ শেষে শ্রমিকরা পরিবার-পরিজনের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হতে শুরু করলো। নিদ্রাহীন গভীর রাতে তাদের মনে পড়তো এলাকায় রেখে আসা পরিবার-পরিজনের কথা, ফেলে আসা সুন্দর দিনগুলোর কথা। স্মৃতিকাতর শ্রমিক ভাবতে শুরু করলো নিজে কষ্টে থেকে, অল্প খেয়ে, টাকা সঞ্চয় ক'রে, তারা ফিরে যাবে- তাদের স্বপ্নের উঠোনে- যেখানে অপেক্ষা করছে তাদের প্রিয়জন, প্রিয়মুখ। এভাবেই দূরাগত শ্রমিকরা অবসরে-একাকীত্বে কষ্ট-বেদনা-হতাশায় ভেঙ্গে পড়তে শুরু করলো। ভেঙ্গে পড়া একঘেয়েমি জীবনে তারা সামান্য ভিন্নতার স্বাদ পেতে মরিয়া হয়ে উঠলো। শুরুতে শুরু করলো অল্প অল্প নেশা। তারপর নেশায়-আসক্তিতে বুঁদ হয়ে পড়লো। স্ত্রীকে না পেয়ে দীর্ঘ বিরহকাতর শ্রমিকস্বামী শরীরের চাহিদা নিবারণে হয়ে উঠলো গণিকালয়ের নিয়মিত খদ্দের।

এ'সকল শ্রমিকরা অসামাজিক কাজ করতে প্রয়োজনে চড়া সুদেও টাকা-পয়সা কর্জ করতে দ্বিধা করলো না।

গান্ধীজির শান্ত স্থির কণ্ঠ শোনা গেল- ভয় পেয়ো না

বিভিন্ন অঞ্চলের আবাদি জমিতে গড়ে উঠা কলকারখানায় অনেক শ্রমিকের বসবাসে নতুন নতুন সমস্যা সৃষ্টি হলো। বিশেষ ক'রে বিপুলসংখ্যক শ্রমিকের বাসস্থান, খাদ্য, নিত্য প্রয়োজনীয় পন্যসামগ্রীর চাহিদা পূরণ করতে নতুন অবকাঠামো-পরিকাঠামো সৃষ্টি করতে হলো। নানা প্রান্ত থেকে আগত বিভিন্ন শ্রমিকদের ইতোমধ্যে গড়ে ওঠা কুঅভ্যাসগুলো স্থানীয় কিছু সচেতন, শিক্ষিত সমাজসেবীর দৃষ্টিতে এলো। সমাজসেবীরা উপদেশ-অনুরোধ করলো শ্রমিকরা যেন কুঅভ্যাসগুলো ত্যাগ করে। কুঅভ্যাসগ্রস্ত শ্রমিকদের বোঝানো হলো ভারতের যে প্রান্ত থেকেই তারা আসুক না কেনো— তারা কিন্তু ভারতেরই সন্তান। ব্রিটিশ যেভাবে ভারতকে শাসন-শোষণ করছে তাতে তাদের গড্ডালিকা প্রবাহে নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়া উচিত নয়। তাদের জেগে উঠতে হবে। তাদের শ্রমের ন্যায্য হিস্যা আদায়ে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। অল্প টাকায় ইংরেজরা যেভাবে শ্রম কিনে নিচ্ছে- তাতে শুধু শ্রমিকরাই ঠকছে না, প্রতারিত হচ্ছে না, প্রকৃতপক্ষে ভারতমাতাও ঠকছে, প্রতারিত হচ্ছে। সমাজসেবীরা আরও বোঝালো তারা যদি বদঅভ্যাসগুলো ত্যাগ করে তাহলে শরীর-মন ভালো থাকবে। কিছু অর্থ সঞ্চয়ও হবে। পরিবার-পরিজনের মঙ্গল হবে। আরো বোঝানো হলো নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি শুধু নিজে ধ্বংস হয় না। তার কারণে পরিবার ধ্বংস হয়, সমাজ কলুষিত হয়, স্বদেশ বিপন্ন হয়। গণিকালয়ের নিয়মিত খদ্দের কখনো শুদ্ধ বাতাসে, মুক্ত পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে না। ব্যক্তিগত কুঅভ্যাসগুলো মানুষের শুভ চেতনাগুলোকে আস্তে আস্তে নিস্তেজ করে দেয়। সামাজিকভাবে তারা হেয় প্রতিপন্ন হতে থাকে ক্রমাগত। বদঅভ্যাসগুলো ত্যাগ করে শ্রমিকরা যেন কম টাকায় তাদের শ্রম কেনার বিরুদ্ধে প্রাথমিক পর্যায়ে অন্ততঃ একটা প্রতিবাদ করে। সমাজসেবীরা তাদের আরও বোঝালো প্রতিবাদ করতে সবার আগে প্রয়োজন শারীরিক এবং মানসিক সুস্থতা।

সূর্যোদয়ের পর সূর্যকিরণ কখন প্রখর হয়- তা যেমন আলাদাভাবে বোঝা যায় না- ঠিক তেমনি ভারতবর্ষে শ্রমিক এবং সমাজসেবীরা কখন যে একতাবদ্ধ হলো, কখন যে আন্দোলন বেগবান করলো- তা সঠিকভাবে বলা বেশ কঠিন। তবে একথা স্বীকার্য যে, শ্রমিক স্বার্থ রক্ষায় শ্রমিক আন্দোলনকে বেগবান করতে প্রাণমনআত্মা ঢেলে প্রথম যুক্ত হলো বিদেশ ফেরত কিছু জ্ঞান-তাপস ভারতসন্তান। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রেঙ্গুন হাইকোর্টের ব্যারিস্টার কন্যা সন্তোষ কুমারী গুপ্তা, টাটা পরিবারের ঘনিষ্ট আত্মীয় সাকলতওয়ালা, ব্যারিস্টার দেওয়ান চমন লাল, ভি ভি গিরি, বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে প্রথম ডক্টরেট এবং আমেরিকা কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রী ডক্টর প্রভাবতী দাসগুপ্তা প্রমুখ। তারা ইতোমধ্যে ইউরোপ, আমেরিকাসহ উন্নত দেশে শ্রমিকদের যাপিত জীবনে উন্নয়নের ছোঁয়া দেখে অনুপ্রাণিত। দেশে এসে তারা স্বপ্ন দেখতে শুরু করলো- তারাও আন্দোলন-সংগ্রামে ক'রে শ্রমিকদের জীবনযাত্রায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে। শ্রমিকদের সঙ্গে নিয়ে তারা শুরু করলো শ্রমিক অধিকার আন্দোলন। এ আন্দোলন শুরুতেইদমন করতে ব্রিটিশ নানা অপকৌশলের আশ্রয় নিলো। উল্লেখযোগ্য অপকৌশলের মধ্যে ছিল তাদেরDevided and Rules নীতি! তারপরও শ্রমিক আন্দোলন ছড়িয়ে পড়লো বিভিন্ন অঞ্চলে, বিভিন্ন কলকারখানায়। আন্দোলন-সংগ্রাম অব্যাহত থাকলেওআশাতীত সাফল্য এলো না শ্রমিকের ভাগ্যে। শ্রমিকদের আন্দোলনে সমাজসেবীদের মূলত দু'টি অন্তর্নিহিত স্বার্থ ছিল- প্রথমটি হলো শ্রমিকদের স্বার্থ আদায় করে তাদের জীবনমানের উন্নতি করা। দ্বিতীয়টি হলো শ্রমিক আন্দোলনের তীব্রতায় কারখানার বিদেশী মালিকদের নাস্তানুবাদ করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভবভারত থেকে তল্পিতল্পা সমেত বিতাড়িত করা।

এরপর ভারতব্যাপী শ্রমিক আন্দোলনে গতি আনতে এগিয়ে এলেন কমিউনিস্ট নেতা মোজাফ্ফর আহমেদ এবং বঙ্কিম মুখার্জি। তাঁরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও অনুরোধ করলেন এ আন্দোলনে সম্পৃক্ত হতে। রবি ঠাকুর তাদের আহ্বানে শুধু সাড়া দিলেন না, একটি বিবৃতি দিয়েও যুক্ত হলেন- চটকল শ্রমিক আন্দোলনে। ডক্টর প্রভাবতী দাশগুপ্তা এবং ব্যারিস্টার

বাখের আলী মির্জার অনুরোধে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু শ্রমিক আন্দোলনে যুক্ত হলেন। বলতে দ্বিধা নেই শতভাগ আন্তরিকতার ছোঁয়া লাগিয়ে রবি ঠাকুর এবং জওহরলাল নেহরুর মতো মনিষীরা শ্রমিক আন্দোলনে কোন গতি আনতে পারলেন না। ফলে আন্দোলনরত শ্রমিকদের জীবনধারা আগের মতোই থেকে গেলো। তারা যে তিমিরে ছিল সে তিমিরেই রয়ে গেলো।

সময়ের গতিতে এগিয়ে যাওয়া জীবনে একদিকে অল্প পয়সায় শ্রম কিনে বিদেশী শিল্পপতিরা বিত্ত-বৈভবেআয়েশি জীবনযাপনে বিভোর। অন্যদিকে অমানসিক শ্রমের বিনিময়ে সামান্য মজুরিতে শ্রমিকের সংসার-পরিজন হতাশার বদ্ধ জলায় হাবুডুবু অবস্থা। এভাবে মালিক এবং শ্রমিকের জীবনে দানা বেঁধে উঠলো পরস্পরের প্রতি পরস্পরের পাহাড়সম বিদ্বেষের অভিযোগনামা।

শিল্প বিপ্লবের নামে শিল্পপতিদের বিত্ত-বৈভবের চাপে ভারতীয় শ্রমিকদের যখন নাভিশ্বাস অবস্থা তখন দীর্ঘ একুশ বছরের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ ব্যারিস্টার মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতবর্ষে এলেন। তিনি তার জাগ্রত বিবেকে দেখতে পেলেন কলকারখানায় শ্রমিকের এ করুণ দশা। বুঝতে পারলেন মালিক-শ্রমিকের মধ্যে ইতোমধ্যে গড়ে উঠেছে পাহাড়সম বিদ্বেষ। তিনি মালিক-শ্রমিকের বৈষম্য দূর করতে এগিয়ে এলেন। তাঁর চলার পথও মসৃণ ছিল না। ধাপে ধাপে, পদে পদে বাধা পেলেন। সবকিছু উপেক্ষা করে তবুও তিনি শ্রমিকদের নিয়ে এগিয়ে গেলেন শ্রমিক অধিকার আন্দোলনে। সাথে পেলেন অনেকের মতো পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে। তিনি গান্ধীজির আবির্ভাবকে মূল্যায়ণ করলেন—

"এই সময় গান্ধীজি এলেন–যেন স্নিগ্ধ নির্মল বায়ুপ্রবাহ, আমরা নিশ্বাস নিয়ে স্বস্তি পেলাম, যেন আলোকের রেখায় অন্ধকার ভেদ করে আমাদের নয়নের আবরণ দূর করে দিল, ঘূর্ণিবায়ু এসে যেন সব ওলটপালট করে দিল, বিশেষ করে মানুষের মনকে। তিনি উচ্চশিখর থেকে আমাদের মধ্যে নেমে আসেননি, ভারতের অগণিত সাধারণশ্রেণীর মধ্য থেকেই যেন তিনি বেরিয়ে এলেন, তাদের

ভাষাতেই তিনি কথা বলেন, আর তাদের দুঃখদুর্দশার কথাই তিনি সর্বদা আলোচনা করছেন। তিনি বললেন, চাষী-মজুরদের শোষণ করাই যাদের জীবিকা তাদের সে বৃত্তি ত্যাগ করতে হবে; এই দুঃখদুর্দশা যে বিধানের ফল তাকে বর্জন করতে হবে। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা নূতন রূপ, নূতন অর্থ নিয়ে আমাদের কাছে দেখা দিল। তিনি যা বললেন অনেক ক্ষেত্রে তা আমরা সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে পারিনি, কখনও কখনও তাঁর কথা সম্পূর্ণই অস্বীকার করেছি। কিন্তু সেসবই গৌণ। তাঁর বাণীর সারকথা হচ্ছে নির্ভয় ও সত্যসন্ধ হয়ে সর্বসাধারণের মঙ্গলকর্মে ব্রতী হও। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে বলেছে, ব্যষ্টির তথা সমষ্টির শ্রেষ্ঠ সম্পদ হচ্ছে অভয়ব্রত–কেবল দৈহিক সাহসে হবে না, মন থেকেও ভয়কে নির্বাসিত করতে হবে। আমাদের ইতিহাসের আদিযুগে জনক, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি বলে গিয়েছে যে দেশনায়কদের কর্তব্য হচ্ছে জাতিকে অভয়মন্ত্রে দীক্ষিত করা। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের অধীনে আমাদের চারদিকে ভয় ঘিরে আছে–সৈন্যের ভয়, পুলিশের ভয়, গুপ্তচরের ভয়, উচ্চকর্মচারীদের ভয়, দমনমূলক আইন ও জেলের ভয়, ভূস্বামীর ভয়, মহাজনের ভয়, বেকার হয়ে উপবাসী থাকবার ভয়–এই সর্বপ্রকার ভয়ই আসন্ন। সর্বব্যাপী এই ভীতিকে উপেক্ষা করে গান্ধীজির শান্ত স্থির কণ্ঠ শোনা গেল–ভয় পেয়ো না। এ কি এতই সহজ? তা ঠিক নয়। তবে একথাও সত্য যে, ভয়ের মায়ামূর্তি বাস্তবের চেয়ে ভীতিজনক–শান্তভাবে বিচার করে বাস্তবকে যদি স্বেচ্ছায় স্বীকার করে নেওয়া যায় তবে তার ভয়াবহতা অনেকখানিই চলে যায়।"[৪]

দক্ষিণ আফ্রিকায় দীর্ঘ ২১ বছর অহিংস সংগ্রাম করে তিনি শ্রমিকের মজুরী সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা অর্জন করেন। তিনি মনে করতেন শ্রমিকদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক না দিলে তা হবে ঘর্মাক্ত শ্রমিকের প্রতি চরম অবিচার করা, সভ্যতার সাথে প্রতারণা করা। মহাত্মাগান্ধী বাস্তবতার ধূসরপ্রান্তে দাঁড়িয়ে বেদনার সাথে উপলব্ধি করে বললেন—

"আমাদের যদি সুবিচার করতে হয় তবে তাদের মধ্যে প্রাপ্য দিয়ে দিতে হবে। আমাদের অবশ্যই জীবন নির্বাহযোগ্য পারিশ্রমিক তাদের দিতে হবে। তাদের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে এমন এক পারিশ্রমিক আমাদের দেওয়া উচিত নয় যা তাদের এক বেলাও পুর্ণ আহার দিতে পারবে না।"[৫]

শ্রমিকদের মূল সমস্যা দারিদ্রতা—বিষয়টি তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন। তিনি আরো বিশ্বাস করতেন— শিল্পে যতদিন মুনাফা মুখ্য থাকবে ততদিন শ্রমিকদের দারিদ্রতার শেষ হবে না। শ্রমিকদের কাজের সময়-পরিধি নিয়ে গান্ধীজির বিজ্ঞানসম্মত একটি ব্যাখ্যা ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন ইংল্যান্ডের মতো ভারতেও যদি শ্রমিকদের কর্মঘন্টা ১২ থেকে কমিয়ে ১০ করা হয় তাহলে দু'টি ইতিবাচক ফল আসবে। প্রথমটি হলো কর্মঘন্টায় দু'ঘন্টা কমলেও উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। দ্বিতীয়টি হলো শ্রমিকরা কার্যদিবসে দু'ঘন্টা কম কাজ করলে তারা এ'সময়টুকু অবসর পাবে এবং এ'কারণে তারা শারীরিক ও মানসিকভাবে সতেজ থাকবে। এই পদ্ধতি ইতোপূর্বে ইংল্যান্ডে কার্যকর করে ইতিবাচক ফল এসেছে। তিনি বিশ্বাস করতেন শিল্প-কলকারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন শ্রমিকদের মানসিক ও শারীরিকভাবে সুস্থ থাকা। শ্রমিকদের অবস্থার সন্তোষজনক পরিবর্তনের জন্যে তিনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভূক্ত করতে চেয়েছেন—

"১। শ্রমিকদের কাজ করবার সময়ের মধ্যে কিছুটা সময় তাদের বিনোদনের জন্য থাকা চাই।
২। তাদের নিজেদের শিক্ষার সুযোগ তাদের পেতে হবে।
৩। তাদের শিশুদের জন্য পর্যাপ্ত দুধ, পরিধেয় এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যবস্থা থাকতে হবে।
৪। শ্রমিকদের জন্য পায়খানাসহ বাড়ির সুযোগ তাদের পেতে হবে।
৫। বৃদ্ধ বয়সে যাতে তাঁরা নিজেদের ভরণ-পোষণ করতে পারেন সেজন্য তাঁরা যেন এখন সঞ্চয় করার অবস্থায় থাকতে পারেন।"[৬]

গান্ধীজি শ্রমিক অধিকার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে যখন একটি দায়িত্বশীল এবং আস্থার জায়গায় দাঁড়ালেন তখন শিল্পমালিকেরা শ্রমিকদের বিরুদ্ধে গান্ধীজিকে অভিযোগ করতে শুরু করলো। তারা ভাবতে শুরু করলো গান্ধীজির আদেশ-নির্দেশ শ্রমিকরা মেনে চলে। এ'কারণে শ্রমিকদের সাথে তাদের সমঝোতা করতে গান্ধীকে তারা'মেডিয়েটর' মনে করলো।

তাদের অভিযোগের বিষয় ছিল- শ্রমিকরা ঠিকমতো কাজ করে না, তারা অলস।গান্ধীজি মালিকদের অভিযোগ শুনতেন কিন্তুবিশ্বাস করতে তাঁর কষ্ট হতো। তিনি উল্টো অভিযোগকারী মালিককে বুঝিয়ে বলতেন একজন শ্রমিকের দিনে ১২ কর্মঘন্টার পরিবর্তে ১০ ঘন্টা করলে শ্রমিকরা সুস্থ শরীর-মন নিয়ে কারখানায় কাজ করে শিল্প উৎপাদন বাড়াতে উৎসাহী হবে। তিনি সবসময় শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে গঠনমূলক আলোচনা করতেন। উভয় পক্ষের মধ্যে কোন সমস্যা সৃষ্টি হলে তিনি আলোচনার মাধ্যমেই সমঝোতা করে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে উভয়পক্ষকে উদ্বুদ্ধ করতেন। বিদেশি শিক্ষায় শিক্ষিত গান্ধীজি বিশ্বাস করতেন শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। উৎপাদন বৃদ্ধিতে মালিকদের বেশি লাভ হলে প্রকৃতপক্ষে সেই লাভের অংশ শ্রমিকদের হাতেও যাবে। তিনি কারখানার মালিকপক্ষের পুঁজি বিনিয়োগের স্বার্থের সাথে শ্রমিকদের শ্রমস্বার্থকে সমন্বয় করে বললেন—

"আপনারা প্রত্যেক শ্রমিককেই অবশ্যই আপনাদের সমান এবং আপনাদের সহোদর ভাই বলে মনে করবেন। আপনারা যদি সেই অবস্থায় পৌঁছাতে পারেন তাহলে আপনারা দেখতে পাবেন যে আপনাদের নিজেদের এবং দেশের কল্যাণ করার জন্য আপনাদের ভেতরে কী বিরাট শক্তি রয়েছে। আমি আপনাদের কাছে এই আশাই করব যে আত্মশুদ্ধির কাজকে সিদ্ধ করতে আপনারা মাদক সেবন, পচা মাংস ও গো মাংস ভক্ষণ ছেড়ে দেবেন, জুয়া খেলা বন্ধ করবেন এবং ঋণগ্রস্ত হবেন না। আপনাদের মধ্যে যদি মুসলমান শ্রমিকরাও থাকেন তাহলে তাঁদের সঙ্গে আপনারা প্রীতি ও সম্পূর্ণ সাম্যের ভাব নিয়ে আচরণ করবেন। যে কাজ আপনারা করেন সেই কাজের প্রতি আপনাদের যেন ব্যক্তিগত আগ্রহ থাকে। আপনাদের নিয়োগকর্তাদের কাছে ভাল আচরণ, পর্যাপ্ত বেতন এবং সুন্দর সুযোগ-সুবিধা দাবি করার অধিকার যেমন আপনাদের কাছে, তেমনই আপনাদের কাছে এটিও প্রত্যাশিত যে, যে-বেতন আপনারা পান তার বিনিময়ে আপনারা যথাযথ এবং আন্তরিকভাবে কাজ করবেন। আপনারা যদি কেবল একটু চিন্তা করেন তাহলেই আপনারা দেখতে পাবেন যে, কোন ব্যক্তিগত মালিকানার শিল্পে শ্রমিকরূপে নিযুক্ত হওয়ার কারণেই আপনারা সেই শিল্পে সহ-

মালিকও হয়ে গিয়েছেন বিশেষত যাঁরা এতে টাকা বিনিয়োগ করেছেন তাঁদের মতোই। প্রকৃতপক্ষে শ্রমও ধাতব মুদ্রার মতোই অর্থ। কেউ যদি কোনো শিল্পে অর্থ বিনিয়োগ করে থাকেন আপনারাও তেমনই আপনাদের শ্রম তাতে নিযুক্ত করেছেন। অর্থ বিনা আপনাদের শ্রম যেমন ব্যর্থ তেমনই পৃথিবীর সমস্ত অর্থই শ্রম ছাড়া ব্যর্থ। তাই যে শিল্পে আপনারা কাজ করছেন সেটিকে আপনাদের নিজেদের বলে মনে করে আপনাদের গর্বিত হওয়া উচিত। এইভাবে একদিকে যেমন আপনারা নিজেদের এটির সহ-মালিক বলে মনে করে আপনাদের অধিকার প্রয়োগ করবেন তেমনই অন্যদিকে সৎভাবে কাজ করে আপনারা এর পূর্ণ সেবা করবেন।"[৭]

কৃষিকাজেও তিনি ভূমি মালিক ও কৃষকদের মধ্যে ভালো এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরিতে কার্যকর উদ্যোগ নিলেন। বিহারের চম্পারণ ও গুজরাটের বারদৌলিতে কৃষকদেরন্যায্য প্রাপ্য আদায়ের আন্দোলন—গান্ধীজির নেতৃত্বেই বলিষ্ঠ রূপ পেলো।

শুদ্ধতায় পরিপূর্ণ গান্ধীজি শ্রমিকদেরশ্রম অল্প পয়সায় আদায় করা পাপ মনে করতেন। শ্রমিকরা অল্প পয়সায় যেন শ্রম না দেয় তার জন্যে শ্রমিক আন্দোলনকে যৌক্তিকভাবে সব সময় সমর্থন দিতেন। আমেদাবাদে বস্ত্রশিল্পে শ্রমিকদের সফল সংগ্রামের ফলে ১৯২০ সালে ভারতে প্রতিষ্ঠিত হলো প্রথম কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠন। ফলে শুরু হলো ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে শ্রমিক সংগঠন গড়ে ওঠা। গান্ধীজির প্রেরণায় বিভিন্ন জায়গায় শ্রমিকদের স্বার্থে আঘাত এলে ধর্মঘট ডেকে তা প্রতিহত করা শুরু হলো। তবে ধর্মঘট ডাকার পূর্বে কেন ধর্মঘটে যাবেন সে বিষয়ে মালিকপক্ষের সঙ্গে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনার জন্যে গান্ধীজি ধর্মঘটিদের বার বার সচেতন করতেন। তাঁর ভাবনা প্রসূত লেখা থেকে উদ্ধৃত করা হলো—

"ধর্মঘট, কর্মবিরতি, হরতাল যে অপূর্ব জিনিস তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে এগুলির অপব্যবহার কোনো শক্ত কাজ নয়। শ্রমিকদের নিজেদের পাকাপোক্ত ইউনিয়নে সংগঠিত হতে হবে এবং এইসব ইউনিয়নের সম্মতি ছাড়া তাঁরা ধর্মঘট করবেন না।

মিল-মালিকদের সঙ্গে আগে আলোচনা শেষ না করে ধর্মঘটের ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয়। মিল-মালিকেরা যদি সালিশীতে রাজী থাকেন তাহলে পঞ্চায়েতের নীতি মেনে নেওয়া উচিত। আর একবার পঞ্চ 'পঞ্চ' নিযুক্ত হয়ে গেলে তাঁর রায়কে ভাল লাগুক বা না লাগুক উভয় পক্ষকে সমানভাবে মেনে নিতে হবে।

পাঠক, আপনারা যদি শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি চান, আপনারা যদি কর্মরত মানুষদের বন্ধু হতে চান ও তাঁদের সেবা করতে চান তাহলে আপনারা উপরে যা লেখা হয়েছে তা থেকে দেখতে পাবেন যে আপনাদের সামনে একটি মাত্র গৌরবময় পথ খোলা আছে। সেটি হলো, দুটি পক্ষের মধ্যে পারিবারিক সম্বন্ধ সৃষ্টির মধ্য দিয়েই কর্মরত মানুষের উন্নত করা যায়। আর তা করতে সত্য ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। কেবল বেতন বৃদ্ধি আপনাদের সন্তুষ্ট করতে পারে না। শ্রমিকেরা কিভাবে তা পাচ্ছে এবং সেই বেতন বৃদ্ধি তারা কিভাবে খরচ করছে তাও আপনাদের জানতে হবে।"(৮)

গান্ধীজি শোষিত শ্রমিকের কষ্ট পরম মমতায় বুকে নিয়ে মালিকপক্ষকে শোষক হিসেবে চিহ্নিত ক'রে, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে সতর্ক ক'রে বললেন—

"তোমরা যারা বেঁচে আছ কৃষক শ্রমিককে শোষণ করে ওদের পিঠের উপর থেকে নেমে দাঁড়াও, যে ব্যবস্থা এই দারিদ্র এই দুঃসহ ব্যথার সৃষ্টি করে তার অবসান ঘটাও।"(৯)

শ্রমিকদের সমস্যার সাথে গান্ধীজি একাকার হয়ে ১৯১৭ সালে বিহারে চম্পারণে মতিহারী এলেন। এখানে ইংরেজরা নীলচাষীদের অমানবিক নির্যাতন করছিলো। চম্পারণে গান্ধীজির আগমন ইংরেজের চোখে ভালো লাগেনি। ১৪৪ ধারা জারি করে তাঁকে আটকানোর চেষ্টা করলো। গান্ধীজি প্রতিবাদে ব্রিটিশের দেওয়া 'কাইজার-ই-হিন্দ' সরকারকে ফিরিয়ে দিলেন। চম্পারণে কৃষকদের নিয়ে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু ক'রে তিনি ভারতে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের বীজতলা তৈরি করলেন। যে বীজতলা থেকে একদিন সৃষ্ট হলো অহিংসআন্দোলনের লক্ষ-কোটি বৃক্ষ। অহিংস আন্দোলন সংগ্রামে গান্ধীজি চম্পারণে শ্রমিক স্বার্থ প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে চললেন। শহর জুড়ে

জনতার ঢেউ। কোথা থেকে যে হাজার হাজার কৃষক এসে আদালতের চারদিক ঘিরে ফেলেছে। গান্ধীজি সঙ্গীদের নিয়ে যতই আদালতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন ততোই এ মিছিলের সাথে যুক্ত হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। গান্ধীজির সঙ্গীরা ভিড় নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে বার বার ব্যর্থ হচ্ছে। স্বতঃস্ফূর্ত গণজোয়ারে গান্ধীজি আদালতের সমন অগ্রাহ্য করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে উল্টো পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরকে বোঝালেন তাদের সাথে তাঁর কোন বিরোধ নেই। তিনি যা করবেন তা অহিংসভাবে আদালতের সামনেই করবেন।

মামলা কোর্টে উপস্থাপিত হলো। বেগতিক সরকারি উকিল এবং ম্যাজিস্ট্রেট কী করা যায় বুঝে উঠতে পারছেন না। উপায়ান্তর না দেখে সরকারি উকিল মামলাটির শুনানি মুলতুবির আবেদন করলেন। গান্ধীজি শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে প্রতিবাদ করে বললেন- মুলতুবির কোন প্রয়োজন নেই। আদালতে তিনি নির্দ্বিধায় এবং সাহসে স্বীকার করলেন- চম্পারণ ছেড়ে যাবার নোটিশ তিনি সচেতন ভাবেই অমান্য করেছেন। সুতরাং তাঁকে আইনানুগ শাস্তি দেওয়া হোক। সেদিন তিনি আদালতে একটি লিখিত বিবৃতি পাঠ করলেন। যার অংশবিশেষ—

"দণ্ডবিধির ১৪৪ ধারা অনুসারে দেওয়া আদেশ অমান্য করার মতো গুরুতর কাজ আমি কেন করেছি, তা মহামান্য আদালতকে সংক্ষেপে জানাতে চাই। ...রায়তদের সঙ্গে নীলকরদের এই ব্যবহার আইনসম্মত হয়নি। এই রায়তদের সাহায্য করার জন্য আমায় কেউ কেউ খুব আগ্রহ নিয়ে ডেকেছেন বলেই আমি এখানে এসেছি। সমস্ত বিষয়টা ভালো করে না জেনে আমি কীভাবে তাদের সাহায্য করব? সম্ভব হলে বিষয়টা সরকার ও নীলকরদের সাহায্য নিয়েই বুঝতে এসেছি- অন্য কোনো উদ্দেশ্য আমার নেই। আমার জন্য লোকেদের শান্তিভঙ্গ হবে, খুনোখুনি হবে একথা আমি স্বীকার করি না। ...এখন আমার মতো অবস্থায় পড়া আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন মানুষের পক্ষে সরকারি আদেশ অমান্য করা এবং তার জন্য যে শাস্তি প্রাপ্য তা গ্রহণ করা ছাড়া আর কোনো সম্মানজনক পথ খোলা নেই।... ... ..."(১০)

সরকারি উকিল, প্রশাসন এবং ম্যাজিস্ট্রেট ভাবতেই পারেননি কোন ব্যক্তি এমনভাবে স্বেচ্ছায় আদালতে স্বীকারোক্তি পেশ করতে পারেন। অভিভূত আদালত তাঁকে জামিনের আবেদন করতে বললেন। গান্ধীজি আদালতের কথায় কোন সাড়া দিলেন না। আদালত অবশেষে স্বপ্রণোদিত হয়ে গান্ধীজিকে নিঃশর্ত জামিন দিলেন এবং সে সাথে স্বাধীনভাবে চম্পারণে চলাচল করারও অনুমতি দিলেন। সত্যাগ্রহে গান্ধীজির অভাবনীয় এ সফলতার সংবাদ পেয়ে রাজেন্দ্রপ্রসাদ সহ অনেক বিখ্যাত আইনজীবী চম্পারণে চলে এলেন। তাদের দেখে গান্ধীজি আন্দোলনের ভূত-ভবিষ্যৎ কী হবে জানতে চাইলে তারা গান্ধীজিকে আস্বস্ত করে বললেন- বর্গাদার কৃষকদের উপর অবিচারের বিরুদ্ধে গান্ধীজির আন্দোলনের সাথে তারাও একাত্ম। প্রয়োজনে গান্ধীজির সাথে তারাও জেলে যেতে প্রস্তুত এবং কৃষকদের আন্দোলন সফল না হওয়া পর্যন্ত তারা আর ঘরে ফিরবেন না। তাদের অঙ্গীকারে গান্ধীজি আনন্দচিত্তে বললেন চম্পারণের লড়াইয়ে আমরা জয়ী।

চম্পারণে সত্যাগ্রহ আন্দোলন ১৯১৭-এর ১৬ এপ্রিল থেকে ৬ অক্টোম্বর পর্যন্ত চললো। সফল এই সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ফলে গান্ধীজিকে চম্পারণ কৃষি তদন্ত কমিটির অন্যতম সদস্য নির্বাচিত করলো সরকার। এই কমিটির সুপারিশক্রমে ১৯২৮-এর ১৬ এপ্রিল চম্পারণ কৃষি আইন পাশ হলো। এ আইনে প্রচলিত তিন কাঠিয়া নিয়ম রদ হলো এবং ইতোমধ্যে অন্যায়ভাবে আদায় করা রাজস্ব ভুক্তভোগী কৃষককে ফেরত দিতে বাধ্য হলো সরকার।

এ সময় শুরু হলো আমেদাবাদে শ্রমিক অসন্তোষ। চম্পারণ থেকে গান্ধীজি ছুটে গেলেন আমেদাবাদে। তাঁর উপস্থিতিতে আমেদাবাদে হয়ে উঠল আর একটি চম্পারণ। এভাবে গান্ধীজি ভারতে নানা প্রান্তে কৃষক-শ্রমিক আন্দোলনে নিজেকে সম্পৃক্ত করলেন। কৃষক-শ্রমিক নেতা হিসেবে তিনি নিজেকে অদ্বিতীয় স্থানে নিয়ে গেলেন। তাদের সমস্যা নিয়ে তিনি শুধু আন্দোলনই করলেন না, আন্দোলনের সময় কৃষক-শ্রমিকের ভূমিকা কী হবে সে বিষয়েও গান্ধীজি তাদেরকে বুঝিয়ে বলতেন। আন্দোলনে তারা যেন কোন অরাজকতা সৃষ্টি না করে সে বিষয়েও তাদেরকে সতর্ক করতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে কোনো আন্দোলনে অহিংস চেতনা দরকার। আন্দোলনে হিংসা-প্রতিহিংসা-দ্বেষ-বিদ্বেষ থাকলে সে আন্দোলন হয়ে ওঠে সভ্য সমাজের জন্যে কলঙ্কিত।

গান্ধীজি এভাবে বিভিন্ন আন্দোলনে ধাপে ধাপে সফলতা অর্জন করে কারখানা মালিকদের প্রস্তাব করলেন একটি কার্যকর সালিশি ব্যবস্থা গঠনের। মালিকদের প্রতিনিধি অম্বালাল সারাভাই দাম্ভিকতার সাথে গান্ধীজির দেওয়া প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলো। ফলে বস্ত্রকল শ্রমিকদের সৃষ্ট চলমান বিরোধে শান্তিপূর্ণ মিমাংসা অসম্ভব হয়ে পড়লো। গান্ধীজি অবশেষে শ্রমিকদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে যেতে উৎসাহিত করলেন। তাঁর উৎসাহ-পরামর্শে তারা ধর্মঘটের আহ্বান করলো। শ্রমিকরা ধর্মঘটে যাওয়ার আগেই গান্ধীজি শ্রমিকদের চারটি প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে শপথ করালেন। প্রতিজ্ঞাগুলো—

১। শান্তি ভঙ্গ করবে না,
২। যে ব্যক্তি ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত অমান্য করে কাজে যেতে চায় তার উপর জোর করবে না,
৩। শ্রমিকরা ধর্মঘটের সময় ভিক্ষা করে জীবন ধারণ করবে না,
৪। ধর্মঘট যত দীর্ঘই হোক না কেন দৃঢ় থাকবে এবং প্রয়োজনে অন্য কোথাও মজুরী করবে জীবন ধারণের জন্যে।

গান্ধীজির দেওয়া এই চারটি প্রতিজ্ঞায় উদ্দীপ্ত হয়ে শ্রমিকরা ধর্মঘট শুরু করলো। শ্রমিকদের এই আন্দোলনে আরও সম্পৃক্ত হলেন গান্ধী অনুরাগী সমাজসেবক শংকর লাল ব্যাঙ্কার এবং অনুসূয়া বেন। ধর্মঘটের সময় প্রতিদিন সন্ধ্যায় শ্রমিকদের সভায় গান্ধীজি উপস্থিত থাকতেন এবং তাদের উদ্বুদ্ধ রাখতে বক্তব্য দিতেন। সপ্তাহ দুয়েক ধর্মঘট চলার পর শ্রমিকেরা দুর্বল হয়ে পড়লো। সন্ধ্যাসভায় শ্রমিকদের উপস্থিতিও কমতে শুরু করলো। নিয়মমাফিক প্রতিদিন গান্ধীজি তার বক্তব্যে চারটি প্রতিজ্ঞার কথা শ্রমিকদের স্মরণ ক'রে দিতেন। তারাও গান্ধীজির বক্তৃতার সময় শ্লোগান দিত- "শ্রমিকেরা মরতে রাজি তবুও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে রাজি নয়।" কিছুদিন পর সন্ধ্যাসভায় শ্রমিকদের উপস্থিতির সংখ্যা কম দেখে এবং শ্রমিকদের ধর্মঘটের দুর্বলতা টের পেয়ে তাদের সমস্যা সমাধানের জন্যে গান্ধীজি ভগ্নহৃদয়ে অনশনের সিদ্ধান্ত নিলেন। অনশনের পূর্বে তিনি ঘোষণা করলেন যতদিন ধর্মঘটে মীমাংসা না হবে এবং শ্রমিকরা যতদিন তাদের দাবি

আদায়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ না হবে ততদিন তিনি অনশন চালিয়ে যাবেন। তিনি ঘোষনা করলেন তাঁর এ অনশন শ্রমিকদের প্রতিজ্ঞাভঙ্গের বিরুদ্ধে। অনশন শুরুর পূর্বে গান্ধীজি বস্ত্রকল মালিকদের বিনয়ের সাথে জানিয়ে দিলেন তাঁর অনশনের কারণ। ভালোভাবে বুঝিয়ে দিলেন তাঁর এ অনশন কোনভাবেই তাদের বিরুদ্ধে নয়। এভাবে ২১ দিন গান্ধীজির অনশনের পর অবশেষে মালিক এবং শ্রমিকদের মধ্যে একটি আপস মিমাংসা হলো। এরই ফলশ্রুতিতে পরবর্তীতে ভারতে প্রথম কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠন 'অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস' প্রতিষ্ঠিত হলো।

১৯৩০-এর ১১ মার্চ সবরমতির বালুকাময় উপকূলে সান্ধ্য প্রার্থনা সভায় দশ হাজার মানুষের সমাবেশ হলো। প্রার্থনা শেষে গান্ধীজি ঐতিহাসিক পদযাত্রা শুরুর প্রাক্কালে তাঁর অনুসারিদের উদ্দীপ্ত করতে একটি আবেগঘন ভাষণ দিলেন। তার অংশ বিশেষ হলো-

"সর্বপ্রকার সম্ভাব্যতা অনুযায়ী এই বক্তৃতাই আপনাদের কাছে আমার শেষ বক্তৃতা হতে পারে। সরকার যদি আগামীকাল সকালে আমাকে পদযাত্রা শুরু করতেও দেয় তবুও সবরমতীর পবিত্র তীরে এটাই হবে আমার শেষ বক্তৃতা। বোধ হয় আমার জীবনের এই কথাগুলি এখানে আমার শেষ কথা। আমার যা যা বলার ছিল তা আমি গতকাল বলেছি। আমি এবং আমার সঙ্গীরা গ্রেপ্তার হয়ে যাওয়ার পর আপনারা কি করবেন তা বলার ক্ষেত্রেই আজ আমি সীমাবদ্ধ থাকবো। ... ...

এই আইন ভাঙার তিনটি উপায় আছে। লবণ তৈরী করাটা অপরাধ এবং যেখানেই এই অপরাধ করার সুযোগ পাওয়া যাবে সেখানেই তা করতে হবে। বেআইনী লবণ, যার মধ্যে প্রাকৃতিক লবণ এবং লবণমাটিও পড়ে, নিজের কাছে রাখা এবং বিক্রী করাও অপরাধ। যারা এই লবণ ক্রয় করবে তারাও একইভাবে অপরাধী। সমুদ্রের তীরের প্রাকৃতিক লবণের সঞ্চয় থেকে লবণ উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়াও আইনভঙ্গ। ঐ লবণ ফেরি করাও তাই। সংক্ষেপে আপনারা উপরোক্ত যে কোন একটি বা সমস্ত উপায় অবলম্বন করে লবণের উপর একচেটিয়া কর্তৃত্বের আইন ভাঙতে পারেন। ... ...

এছাড়াও অন্যান্য বহু উপায়ে অনেক কিছু করা যেতে পারে। মদের ও বিলাতী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করা যেতে পারে। আমাদের যদি প্রয়োজনীয় শক্তি থাকে আমরা কর দেওয়া বর্জন করতে পারি। উকিলরা ওকালতি বর্জন করতে পারে। জনসাধারণ মামলা মকোদ্দমা থেকে বিরত থেকে আইন আদালত বয়কট করতে পারে। সরকারী কর্মচারীরা পদত্যাগ করতে পারে। চতুর্দিকে যে হতাশার রাজত্ব চলেছে তার মধ্যে পড়ে কিছু লোক চাকরী যাবার ভয়ে কাঁপছে। এই লোকগুলি স্বরাজের পক্ষে অনুপযুক্ত। দেশে সরকারী চাকুরিয়ার সংখ্যা কয়েক লাখের বেশী নয়। এমনকি স্বাধীন ভারতেও এর থেকে বেশী চাকুরিয়া রাখা সাধ্যে কুলোবে না। আজ একজন কলেক্টারের যতজন চাকর আছে তখন তার তত চাকরের দরকার হবে না। সে নিজেই নিজের চাকর হবে। আজও আমাদের কোটি কোটি অনাহারী মানুষের পক্ষে এই বিশাল ব্যয়ভার বহনের সাধ্য নেই। তাই আমরা যদি একটু বোধশক্তি সম্পন্ন হই তাহলে আসুন আমরা সরকারী চাকুরীকে বিদায় জানাই-সে চাকুরী জজেরই হোক বা পিয়নের-ই হোক, কিছু যায় আসে না। যাঁরা কোন না কোন প্রকারে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন, তা সে কর দিয়ে হোক, খেতাব রেখে হোক অথবা সরকারী স্কুলে ছেলেমেয়েদের পড়িয়ে হোক বা অন্যকোন উপায়ে, তাঁরা সবাই তাঁদের সহযোগিতা এই সমস্ত থেকে অথবা যতভাবে সম্ভব ততভাবে প্রত্যাহার করে নিন। তাছাড়া নারীরাও আছেন যাঁরা পুরুষদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এই সংগ্রামে দাঁড়াতে পারেন। ... ...

সত্যাগ্রহী স্বাধীন বা কারারুদ্ধ যে কোনো অবস্থাতেই সর্বদাই বিজয়ী। তিনি কেবলমাত্র তখনই পরাজিত হন যখন তিনি সত্য ও অহিংসাকে ত্যাগ করেন এবং তাঁর অন্তরের ধ্বনির প্রতি বধির হয়ে থাকেন। কাজেই সত্যাগ্রহীরও যদি পরাজয়োর ঘটনা ঘটে তাহলে তিনি নিজেই তার কারণ।"[১১]

সত্যাগ্রহীর নিঃসীম-নিঃস্বার্থ ত্যাগ এবং সুন্দর পথ ধরে গান্ধীজি ভারতের বিভিন্ন জায়গার শ্রমিকদের খোঁজ-খবর রাখতেন। অল্প বেতনে জীবন-জীবিকা না চলায় শ্রমিকরা অবশেষে অধিক সুদে ঋণ গ্রহণ করতো। চড়া সুদে ঋণ নিয়ে শ্রমিকদেরগড়ে ওঠা কুঅভ্যাসগুলোও ত্যাগ করার জন্যে

তিনি তাদের বাপুজির মতো বোঝাতেন, শিক্ষকের মতো উপদেশ দিতেন। আবার মজুরী বৃদ্ধির জন্যেও গান্ধীজি শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করতে শ্রমিকদের উদ্বুদ্ধ করতেন। শ্রমিকদের সমস্যা সমাধানের জন্যে তিনি ১৯২৫ সালে বাঙলার বিভিন্ন কলকারখানায় কতজন শ্রমিক কর্মরত আছে তার শুমারী এবং তাদের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে নানা খুঁটিনাটি সংবাদ সংগ্রহ করে সরকারের কাছে একটি তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ পাঠালেন। তথ্যসমৃদ্ধ এ বিবরণে তিনি যুক্তিপূর্ণভাবে শিল্পবিরোধ নিষ্পত্তির জন্যে সালিশি ব্যবস্থার প্রস্তাব দেন। এই সালিশি ব্যবস্থার মধ্যে শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধির দাবীসহ অন্যান্য ন্যায়সঙ্গত দাবিও পেশ করা হলো। কলকারখানায় উৎপাদিত দ্রব্যের মানোন্নয়নসহ উৎপাদনের বৃদ্ধি এবং অপচয় বন্ধ করার কৌশলও নির্ণয় ক'রে তা পেশ করা হলো এ বিবরণে। গান্ধীজির পরামর্শে 'আমেদাবাদ মিল ওনার্স এসোসিয়েশন' সালিশি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে আমেদাবাদে শিল্প-কলকারখানায় দীর্ঘদিন শান্তি বজায় রাখতে পেরেছিলো। গান্ধীজির সে দিনের প্রস্তাবিত সালিশি ব্যবস্থা-ই হলো আজকের আরবিট্রেশন ব্যবস্থা- যা মেডিয়েশনের ধ্যান-ধারণার কাছাকাছি আরেকটি সত্তা। আরবিট্রেশন ব্যবস্থা কার্যকরের পর ভারতবর্ষের শ্রমিকরা অনেক দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও খুঁজে পেলো তাদের শ্রমজীবনে একটু নির্ভরতা আর সুখ-স্বাচ্ছন্দের লেশমাত্র ছোঁয়া।

* * *

গ্রন্থসহায়:

(১) ইবনে বতুতা; বাংলাপিডিয়া
bn.banglapedia.org

(২) পৃষ্ঠা: ৮১
বাংলায় ইসলাম প্রচারে সাফল্য
একটিঐতিহাসিক বিশ্লেষণ
আকবর আলি খান
প্রথমা প্রকাশন

(৩) পৃষ্ঠা: ১০৩-১০৪
আকবর আলি খান
প্রাগুক্ত

(৪) পৃষ্ঠা: ৩১৩
ভারত সন্ধানে
জওহরলাল নেহরু
আনন্দ

(৫) পৃষ্ঠা: ৩৭৪
সালিশী ব্যবস্থা ও গান্ধীজি
বিমল ব্যানার্জী
গান্ধী পরিক্রমা
সম্পাদনা: শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়; ব্যারাকপুর

(৬) পৃষ্ঠা: ৩৫৭
মহাত্মা গান্ধীর নির্বাচিত রচনা *VOL. V*
সত্যের আহ্বান
নবজীবন পাবলিশিং হাউস; আমেদাবাদ

(৭) পৃষ্ঠা: ৩৪৫-৩৪৬
সত্যের আহ্বান
প্রাগুক্ত

(৮) পৃষ্ঠা: ৩৫৮
সত্যের আহ্বান
প্রাগুক্ত

(৯) পৃষ্ঠা: ৩৭৪
বিমল ব্যানার্জী
প্রাগুক্ত

(১০) পৃষ্ঠা: ৩০৭
শতবর্ষে চম্পারণ-সত্যাগ্রহ ফিরে দেখা
চন্দন সেন
পূর্ব
গান্ধীচর্চা
ডিসেম্বর, ২০১৯
সম্পাদক: রণজিৎ অধিকারী
উজান

(১১) পৃষ্ঠা: ২৩; ২৪; ২৫; ২৬
সত্যের আহ্বান
প্রাগুক্ত

সময়ের অমেয় আঁধারে জ্যোতির তারণকণা আসে

পরম স্নেহের বেলা

ভারতের সূর্যপুরুষ নেতাজি সুভাষ চন্দ্রবসুর ২২ বছর বয়সি ভ্রাতুষ্পুত্রী। নাম তার বেলা। নোয়াখালীতে বিকেলের প্রার্থনা সভায় গান গেয়েছে। গান্ধীজি তার গলায় রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদের গান শুনতেন। বেলা একদিন গান্ধীজিকে তাঁর বিশেষ প্রিয় গানটি শুনালেন- *'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলোরে.....।'* এ গানের মতোই বেলা একদিন অসুস্থ হয়ে কারো ডাক না শুনে একলা চলে গেল। রেখে গেল পরিবার-পরিজন, প্রিয় স্বদেশ, সুন্দর পৃথিবী আর বিপ্লবী স্বামী হরিদাস মিত্রকে। অসুস্থ শরীরে বেলা নোয়াখালীতে রেখে গেল গান্ধীজিকে। সুস্থ হওয়ার প্রত্যাশায় সে চলে এলো হাওড়ার বালি-ডানকুনি অঞ্চলে। ঝাঁপিয়ে পড়লো উদ্‌বাস্তু শিবিরে পুনর্বাসনের কাজে। কিছুদিন পর বেলার অকাল মৃত্যুতে বঙ্গবাসীর বড় কষ্ট হলো। কষ্ট ভুলতে তারা হাওড়ার দিকে একটি স্টেশনের নাম রাখলো বেলানগর।

ডানকুনিতে বেলার অসুস্থতা বেড়ে গেলে বেলার স্বামী হরিদাস মিত্র চিঠি লিখে গান্ধীজিকে জানালো সে খবর। উদ্বিগ্ন গান্ধী অবশেষে বেলাকে একটি চিঠি লিখলেন। চিঠিটি ছিল বাংলায়—

"পরম স্নেহের বেলা,

হরিদাস ফিরে এসেছেন, কত আশা, কত উদ্‌বেগ নিয়ে, তোমার কি এখন শুয়ে থাকলে চলে? তোমাকে আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ জানাচ্ছি। শীঘ্র সুস্থ হয়ে স্বামীর কাজে সহায় হও। তারও অন্তরে বল দাও। ইতি।

বাপুর আশীর্বাদ।"[১]

বেলার স্বামী হরিদাস মিত্র ছিলেন নেতাজীর আজাদ হিন্দবাহিনীর গুপ্ত বিভাগের সক্রিয় সদস্য। গ্রেফতারের পর আত্মপক্ষ সমর্থনেরসুযোগ না দিয়ে মিলিটারি পরিবেষ্টিত গোপনে তার বিচার হলো। বিচারে ১৯৪৫ সালের জুন মাসে মৃত্যুদন্ডের রায় হলো। আলিপুর কেন্দ্রীয় কারাগারের প্রকোষ্ঠে বন্দী স্বামীর সঙ্গে বেলা দেখা করেন। দেখা করার পর থেকে ফাঁসির আসামী হরিদাস মিত্রের আর মাত্র আট দিন বেঁচে থাকার কথা। স্বামী-স্ত্রীর সৌজন্য কথাবার্তা শেষেস্বামীকে বেলা আশ্বস্ত করলো- সে পুনাতে বাপুজির কাছে যাবে। স্বামীর সাথে কথা বলার সময় বেলার চোখে-মুখে ফুটলো আশা আর সংকল্পের মিশ্রণ। স্বামী হরিদাসকে আশ্বাসের ভাষায় বললো- 'যেভাবেই হোক তোমাকে ফাঁসির মঞ্চ থেকে ফিরিয়ে আনবো।' বেলার কথায় স্বামী হরিদাস কিন্তু কোন আশার আলো দেখলেন না। বিপ্লবী হরিদাস গান্ধীজির অহিংস পথে না হেঁটে সে হেঁটেছে নেতাজির আপসবিরোধী সশস্ত্র পথে। সে তো সশস্ত্র বিপ্লবী। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্যে মরণাস্ত্র নিয়ে আসাম এবং বার্মার সীমান্ত পেরিয়ে প্রায় ভারতের কাছাকাছি এসেছিল। আন্দোলন সংগ্রামে সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থানের এই ফাঁসির আসামিকে মহাত্মাজি কেন রক্ষা করতে এগিয়ে আসবেন। সন্দেহ আর অবিশ্বাসের দোলাচলে বিপ্লবী হরিদাস আস্তে আস্তে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। দিন দিন ফাঁসির মঞ্চ যেন হেঁটে হেঁটে তার কাছে এসে জীবন দরজায় কড়া নাড়তে শুরু করলো। ফাঁসি কার্যকরের আর মাত্র আট দিন। বেলার মুখে বিপ্লবী স্বামী হরিদাসের খবর জেনে বড়লাট ওয়াভেলকে গান্ধীজি চিঠি লিখলেন—

"প্রিয় বন্ধু!

লন্ডন থেকে ফিরে আসা মাত্র এই চিঠি দিয়ে বিরক্ত করবার জন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু সম্পূর্ণ মানবতার তাগিদেই এই চিঠি লিখছি। শ্রী সুভাষচন্দ্র বসুর মাত্র ২২ বৎসর বয়স্কা তরুণী ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতি বেলার স্বামী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন এম.এ শ্রী হরিদাস মিত্র মনে হয় অযৌক্তিক কারণে মৃত্যুদন্ডে দণ্ডিত হয়েছেন ..... সে যাই হোক না কেন জাপানের সহিত যুদ্ধ-শেষে দয়া প্রদর্শনই একান্ত বিধেয়।

(মুল ইংরাজি:Dear friend, I am sorry that I have to worry you almost immediately on your return from London. My only excuse is that my mission is purely humanitarian. Shri Haridas Mitra, an M.A of the Calcutta University and the husband of Shri Subhas Chandra Bose's young niece Bela, aged 22 years, is under sentence of death over what appears to be an untenable ground..... In any event the case for mercy becomes irresistible in that the war with Japan is over.)"[২]

চিঠিতে আরও লিখলেন শরৎচন্দ্র বসুর গৃহে যখন তিনি অতিথি - তখন বন্দী হরিদাস মিত্রের স্ত্রী বেলা তাঁকে খুব সেবাযত্ন করেছে। ভজনগান পরিবেশন করে তাঁকে সুখ দিয়েছে। চিঠির শেষ দিকে মহাত্মাজি খুব দৃঢ়তার সাথে লিখলেন—

"যদি এই মৃত্যুদন্ড কার্যে পরিণত করা হয় তাহলে এটা হবে চরমতম রাজনৈতিক ভ্রান্তি।

(মূল ইংরেজি:It will be a political error of the first magnitude if this sentence of death is carried into effect.)"[৩]

ফাঁসি কার্যকর করতে সময়ের ব্যাপার মাত্র। ফাঁসির মঞ্চ প্রস্তুত। দণ্ডপ্রাপ্ত আসামী মৃত্যুর চৌকাঠে। এমন সময় আলিপুর কারাগারে একটি আদেশ এলো। আদেশটি- বিপ্লবী হরিদাস মিত্রের মৃত্যুদন্ড সাময়িকভাবে স্থগিত করার। বুঝতে কারো অসুবিধা হলো না এ আদেশের নেপথ্যে কোন্ মহামানবের কল্যাণী হাত থাকতে পারে!

ফাঁসির আদেশ সাময়িক স্থগিত হলেও বিপ্লবী আসামি দিনের পর দিন অপেক্ষা করছে - কবে তার জীবনে নেমে আসবেঅন্তিমক্ষণ। জেল কর্তৃপক্ষ সব সময় প্রস্তুত থাকছে ফাঁসি কার্যকরের জন্যে। পঁচিশ দিন অন্তর অন্তর ফাঁসির মঞ্চ সাজানো হচ্ছে। দণ্ডপ্রাপ্ত আসামীর ওজন মাপা হচ্ছে। ফাঁসির দড়ি পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। সব কিছু নিখুঁতভাবে প্রস্তুত - সর্বশেষ কার্যটি সুসম্পন্ন করার জন্যে। বিপ্লবী স্বামীর ফাঁসির মহাযজ্ঞ আয়োজনের মধ্যেও মহাত্মাজি বেলাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেনু

"আমি বিশ্বাস করি, তোমাকে শীঘ্রই সুখবর জানাবো, তোমার মুখে হাসি ফোটাবো, আনন্দে তোমার ভজন গান শুনবো, তারপর তোমার ছুটি দেবো।"[৪]

এরপরও চুড়ান্ত ফয়সালা না হওয়ায় বাপুজি অস্থির হয়ে উঠলেন। পুনরায় তিনি বড়লাটকে লিখলেন—

"যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। যে কোনও কারণেই হোকফাঁসির আদেশ প্রাপ্ত সকল বন্দী যুদ্ধ শেষ হবার পরও জীবিত আছে। এটা কি অত্যন্ত বেশি হবে যদি এই ধরণের সমস্ত বন্দীদের মৃত্যুদন্ড মওকুফ করবার জন্য আপনার কাছে পুনর্বিবেচনার প্রস্তাব করি?" এই চিঠির শেষ লাইনে তিনি লিখলেন, "আমার মতে, বিচারকে যদি ন্যায়বিচারের পর্যায়ে নিয়ে যেতে হয়, তার সুসামঞ্জস্য বিধানের জন্য দয়া প্রদর্শনেরও প্রয়োজন আছে। (মূল ইংরাজি ঃin my opinion, Justice, to be real justice, requires extension of mercy to temper it.)"[৫]

মহাত্মার চিঠির ১২ দিন পর ১৯৪৫ এর ১ নভেম্বর নতুন দিল্লির ভাইসরয় ভবন থেকে তাঁকে জানানো হলো আসামীদের মৃতুদণ্ড রহিত করা হয়েছে। মৃতুদণ্ডের পরিবর্তে তাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ জারি করেছেনবড়লাট লর্ড ওয়াভেল।আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকদের দয়া-করুণা করে নতুন মামলায় আর অভিযুক্ত করা হলো না। ব্রিটিশ সরকারের ঘোষণায় মহাত্মাজি বড়লাটের কাছেক্রমাগত চিঠি লিখতে শুরু করলেন। চিঠিগুলোতে কোনফলপ্রসূ ফল না আসায় ২২ জুলাই, ১৯৪৬-এ বড়লাটকে শেষ চিঠি লিখলেন মহাত্মা-

"প্রিয় বন্ধু, চারটি বিনিদ্র রজনির গভীর চিন্তার পর, এটি আপনাকে জানানো আমার কর্তব্য মনে করি যে, শ্রী হরিদাস মিত্রের মুক্তিদানে কালক্ষয় করে আপনি অন্যায় করছেন, এটি সরকারি ঘোষিত নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন। (মূল ইংরাজিঃ-Dear friend, having slept over it for four nights, I feel it to be my duty to say that it seems your Excellency is wrong to delay the release of Shri Haridas Mitra. It is inconsistent with the declared policy of the Government.)"[৬]

চিঠি চালাচালির সময় ভারতের রাজনীতির আকাশে অনেক পূর্ণিমা এলো। অনেক অমাবশ্যা এলো। অনেক জোয়ারভাটায় ভারত মহাসাগর আর আরব সাগর ভারতবর্ষের মানুষ-প্রকৃতিকে প্লাবিত করলো। তারপরও মৃত্যুদণ্ড থেকে যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের ভাগ্যাকাশে নতুন কোন আদেশ জারি করলো না ব্রিটিশ সরকার। তারা জেলবন্দীই থেকে গেলো। ইতোমধ্যে ভাঙ্গাগড়ার রাজনীতির পাড়ে নতুন ঢেউ আছড়ে পড়লো। এলো পন্ডিত নেহেরু ও প্যাটেলের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার। ব্রিটিশের মতো তাঁরা এবার ভারতমাতাকে শুধু শাসন করলো না। শাসনের সাথে সেবা দেওয়ার মানসিকতা তাদের আজন্মের। অসুস্থ বেলা নতুন করে আশায় বুক বাঁধলো। ছুটে গেলেন দিল্লিতে। বাপুজির পাশে বসে তাঁরই ইঙ্গিতেকংগ্রেস ওর্য়াকিং বৈঠকের পূর্বে সকল রাজ বন্দীর মুক্তির দাবি তুললেন। বেলার দাবি

মেনে নিলো কেন্দ্রীয় সরকার। অবশেষে সকল বন্দী মুক্ত বাতাসে মুক্তির স্বাদে আনন্দ-উৎসবে মেতে উঠলো। মুক্তি পেয়ে হরিদাস মিত্র আনন্দ আর কষ্ট মিশ্রিত চিঠি লিখলেন গান্ধীজিকে। নোয়াখালীতে গান্ধীর কাছে চিঠিটি বহন ক'রে নিয়ে গেলো দু'টি খবর- একটি বেলা ভয়াবহ অসুস্থ, অপরটি হরিদাস এখন মুক্ত।

বড়লাটের কাছে লেখা গান্ধীর চিঠিগুলো অসুস্থ বেলাকে সেদিন বেঁচে থাকতে প্রেরণা দিয়েছিল। মৃত্যুর প্রহরগোনা ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি-একজন বিপ্লবী বাঙালি হরিদাসকে নতুন করে স্বপ্ন দেখতে অনুপ্রাণিত করেছিল। চিঠিও যে মেডিয়েশনের উজ্জ্বল ভূমিকায় এসে গতিহীন জীবনকে গতিময় করতে পারে তা বেলা এবং হরিদাস ছাড়া আর কেউ কী কখনো বুঝতে পারবে?

ওর মতো হাজারো ছেলে যেন এদেশে জন্মায়

দেশ বিভক্তির পূর্বে নোয়াখালী যে পথে হেঁটে বাংলা তথা ভারতবর্ষকে কলঙ্কিত করলো। সদ্য স্বাধীন ভারতে ঠিক একই পথে গৌরবদীপ্ত কলকাতাও হেঁটে চললো। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় কলঙ্কিত হলো কলকাতা, কলঙ্কিত হলো খণ্ডিত বাংলা, কলঙ্কিত হলো স্বাধীন ভারত। গান্ধীজি বিভক্ত ভারতের বিক্ষত চেহারা দিল্লিতে বসে আর দেখতে চাইলেন না। দেশ বিভাগের সমস্ত আয়োজনের মঞ্চ যখন দিল্লিতে, তখন গান্ধীজি দুঃখ-কষ্ট-বেদনায় আশ্রয় নিলেন বেলেঘাটা হায়দারি মঞ্জিলে। সাথে রাখলেন সদ্য ক্ষমতাচ্যুত সোহরাওয়ার্দীকে। কট্টর হিন্দুত্ববাদীরা সোহরাওয়ার্দীকে দেখে চিৎকার চ্যাঁচামেচি শুরু করলো এবং তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললো-

"এখানে মুসলমান বাঁচাতে এসেছ! অন্য জায়গায় গিয়ে দেখ, যেখানে হিন্দুরা অবাধে খুন হয়ে যাচ্ছে।"[৭]

'এশিয়াটিক এ্যাক্ট' আইনটি রদ হলো। আইনটি রদ হওয়ার প্রেক্ষিতে বাধ্যতামূলকভাবে ভারতীয়দের নাম লিখতে হলো না। স্বেচ্ছায় নাম লেখার ক্ষেত্রেও কোন বাধা থাকলো না। কেউ কেউ মনে করলো গান্ধীজি আন্দোলনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মীর আলম। তিনি কয়েকজন পাঠানকে নিয়ে গান্ধীজির উপর চড়াও হলো। মীর আলম গান্ধীজির মাথায় আঘাত করলে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। গান্ধীকে অজ্ঞানাবস্থায় তারা লাথি মারতেও কুণ্ঠিত হলো না। আশপাশের লোকজন গান্ধীজিকে উদ্ধার করলো। জ্ঞান ফিরতেই গান্ধীজি জিজ্ঞেস করলেন মীর আলম কোথায়? তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে জেনে গান্ধীজি বললেন- ওদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। ওরা নিজের বিশ্বাস মতো ঠিক কাজটিই করেছে।

গান্ধীজি এ'রকম শতশত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন তাঁর শুদ্ধ বিবেকের দায়বদ্ধতা থেকে। তিনি ব্যক্তিগত অন্যায়ের প্রতিকারের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হয়ে কোনদিন কোন অভিযোগ-অনুযোগ উত্থাপন করেননি। কোন মামলা-মোকদ্দমা করেননি। পরিবারের কোন সদস্যের সাথে কোন বিরোধে জড়াননি। ব্যতিক্রম শুধু বড় সন্তান হরিলাল। গান্ধীজির শেষ জীবনে একটি বিষণ্ন নাম হরিলাল- যে হিন্দু থেকে মুসলিম, মুসলিম থেকে হিন্দুতে ধর্মান্তরিত হয়েছিল।

সবকিছু ছেড়ে আমি বাঙালি হয়ে গেছি

১৯২১-এর ১৬ জুলাই গান্ধীর সাথে সুভাষ চন্দ্র বসুর প্রথম দেখা। গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে অভিভূত সুভাষ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাশ করেও আর সরকারি চাকরিতে গেলেন না। পরাধীন দেশমাতাকে স্বাধীন করতে গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের ছায়াতলে এলেন। প্রথম পরিচয়ের পর থেকে আর কখনো সুভাষ গান্ধীজির আন্দোলনের সুবাসে সুবাসিত থাকেননি। বিশেষ করে ১৯২৭-২৮-এ গান্ধী রাজনীতি থেকে হঠাৎ সরে

এসে সবরমতী আশ্রমে আশ্রয় নেওয়ার পর থেকে। উত্তপ্ত ভারতবর্ষকে অসহায় রেখে গান্ধীর রাজনীতি থেকে অগস্ত্যযাত্রা সুভাষ ভালোভাবে নিলেন না। তিনি গান্ধীকে বারবার অনুরোধ করলেন দেশের এ'সংকটে তিনি যেন কংগ্রেসের হাল ছেড়ে অন্য কোথাও সরে না থাকেন। নেতাজির অনুরোধে গান্ধী সাড়া দিলেন না। সুভাষও তাঁর নিস্পৃহতায় হতাশ হলেন।

১৯৩৮-এ সুভাষ চন্দ্রবসু কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন। সফল কংগ্রেস সভাপতি আবারও ১৯৩৯-এ সভাপতি হতে চাইলে গান্ধী এবং তাঁর সহযোগীরা ঘোর আপত্তি জানালেন। নেতাজি দমে যাবার পাত্র নয়। সভাপতি পদে তিনি নির্বাচনে পট্টভি সীতারামাইয়ার মুখোমুখি হলেন। নির্বাচনে নেতাজি ১৫৮০ ভোট আর সীতারামাইয়ার ১৩৭৫ ভোট পেলেন। ২০৫ ভোট বেশি পেয়ে নেতাজি দ্বিতীয়বারের মতো কংগ্রেস সভাপতি হলেন। অনেক আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্কের পর ১৫ সদস্যের কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে না পেরে তিন মাস পর ২৯ এপ্রিল নেতাজি অবশেষে পদত্যাগ করলেন। সুভাষের এই পদত্যাগের অন্যতম কারণ হিসেবে বাঙালি এখন পর্যন্ত গান্ধীকে দায়ী করেন। এই দুই মহান দেশপ্রেমিকের দ্বন্দ্বের মূল কারণ- একজন সারাজীবন অহিংসা এবং সত্যের পথে অবিচল। আরেকজনের কাছে যেকোন মূল্যেই হোক স্বাধীনতাই প্রথম এবং শেষ কথা। শত দ্বন্দ্ব বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও নেতাজির প্রতি মহাত্মার স্নেহ-ভালোবাসার কোন কমতি ছিল না।

২০ মার্চ, ১৯৪০-এ মহাত্মা বক্তব্যে বললেন- *"সুভাষকে আমি ছেলের মতোই দেখেছিলাম কিন্তু দুর্ভাগ্য আমি তার ভালোবাসা হারিয়েছি।"*[১০]

এমনকি নেতাজির কথিত অসুস্থতায় গান্ধীজি চিঠি লিখলেন-

> *"তুমি অপ্রতিরোধ্য- তা তুমি সুস্থ বা অসুস্থ- যে কোন অবস্থাতেই। আগে সুস্থ হও তারপর আবার বারুদী বিস্ফোরণ শুরু কোরো। (You are irrepressible whether ill or well. Do get well before going in for fireworks.)"*

গান্ধীজির প্রতিও নেতাজির শ্রদ্ধার আসনটি ছিল চিরদিনের জন্যে পাতা। শ্রদ্ধার এ'আসনে গান্ধীজি ছাড়া অন্য কাউকে কখনো তিনি বসাতে পারেননি। এজন্যই হয়তো গান্ধীর ৭৫তম জন্মদিনে প্রবাসী ভারত সরকার এবং আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রধান হিসেবে নেতাজি সুভাষই রেঙ্গুনে পতাকা উত্তোলন করে গান্ধীকে সর্বপ্রথম জাতির পিতা সম্বোধন করেন। গান্ধীকে ভারতবর্ষের বিকল্পহীন নেতা জেনে অনুষ্ঠানে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করবার পবিত্র যুদ্ধে তিনি তাঁর নিকট আশীর্বাদও প্রার্থনা করেন।

চিন্তা-চেতনায় এই দু'মহান মনীষীর যোজন যোজন দূরত্ব থাকা সত্ত্বেও তাঁরা পরস্পরকে শ্রদ্ধা-স্নেহ-ভালোবাসা দেখাতে কখনো কার্পণ্য করেননি। রাজনীতিতে পথ চলার বাঁকে বাঁকে তাঁরা একজন আরেকজনকে মূল্যায়ন করতে অন্তরে কোন দ্বিধা রাখেননি। এমনকি খন্ডিত ভারত যখন স্বাধীনতার স্বাদ ভোগ করছে তখন নেতাজির সঠিক কোন খোঁজ-খবর পাওয়া যাচ্ছে না। কোন কোন তথ্য বলছে তিনি আর পৃথিবীর আলো-বাতাসে নেই। কোন কোন তথ্য বলছে নেতাজি আজ এদেশে, তো কাল ওদেশে-আত্মগোপন করে আছেন। আলো-আঁধারের এই লুকোচুরি খেলায় বিপন্ন নেতাজির পরিবারের সদস্য বেলা এবং তার বিপ্লবী স্বামীকে পরম স্নেহ-ভালোবাসায় গান্ধীজি কাছে টেনে নিলেন।

১৯৪৭-এর অনেক পূর্বে বিশেষত রবীন্দ্রনাথ ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর বঙ্গদেশে প্রচলিত বাংলা ভাষার গতিময়তা অনেক গুণীজ্ঞানীকে আকৃষ্ট করলো। তাঁরা বুঝতে পারলেন গতিময় স্নিগ্ধ সুন্দর এ ভাষা না জানলে পৃথিবীর বিরাট জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন ভাবধারাকে উপলব্ধি করতে পারবেন না। এই বোধ থেকে গান্ধীজি রোজ সকালে বাংলা লেখাপড়ায় আধঘন্টা সময় দিতেন। সমস্ত কাজের সাথে বাংলাভাষাও শিখতেন নিষ্ঠার সাথে। বাংলা শিখতে তাঁর বেশি সময় লাগেনি। ১৯৪৬-এর দাঙ্গায় নোয়াখালীতে ৩ এবং ৪ ফেব্রুয়ারিতে স্থানীয় লোকজনের বাংলায় দীর্ঘ অভিনন্দনের উত্তর তিনি সরাসরি বাংলায় জানালেন। এরপর ২৫ ফেব্রুয়ারিতে সরকারি রিলিফ কমিশনারের দেওয়া বাংলাভাষণের প্রতিটি বিষয়ে গান্ধীজি বাংলায় সুস্পষ্ট অভিমত দিলেন। গান্ধীজি বাঙলার অমৃতের

সন্ধানে মৃত্যুর দিন সকালেও বাংলা চর্চা করেন। প্রতিদিনের প্রার্থনার মতো বাংলাচর্চাও প্রতিদিনের বিষয় হয়ে দাঁড়ালো তাঁর।

ভাবতে অবাক লাগে যারবেদা জেলে গান্ধীজি ৬৯৮ দিন কারাবাসের সময় ৮৫টি ইংরেজি, ৩১টি গুজরাটি, ৬টি হিন্দি, ৫টি উর্দু এবং ২৫টি মারাঠী বই পড়েন। মোট ১৫২টি বই পড়ার জন্যে শুধু পড়েননি, গভীর অধ্যায়নের পর পঞ্জি তৈরি করে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অংশের নোট নিতেন। যারবেদা জেলেই তিনি উর্দু ভালোভাবে শেখেন। ভোর ৪টায় ঘুম থেকে উঠে প্রার্থনা শেষ করে তিনি অপেক্ষা করতেন সূর্যোদয়ের। কারাপ্রকোষ্ঠে তখন আলোর কোন ব্যবস্থা না থাকায় জ্ঞানপিপাসু গান্ধীজির অপেক্ষার এ'প্রহর। তখন হয়তো পর্যাপ্ত আলো আর সামান্য সুযোগ পেলে তিনি যারবেদা জেলেই বাংলাচর্চা করতেন। বাংলাচর্চার জন্যে তাঁকে অপেক্ষা করতে হতো না আরও কিছুদিন। পরবর্তীতে গান্ধীজি স্বউদ্যোগে বাংলাচর্চা করে নিজেকে উপস্থাপন করলেন বাঙলার বিশাল ঠিকানায়। ১৯৪৬-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নোয়াখালীতে এলে নির্মল কুমার বসুর তত্ত্বাবধানে সুন্দর বাংলাচর্চার আরেকটি সুযোগ পেলেন তিনি। বাঙলা এবং বাঙালিকে আপন ভেবে গান্ধীজি অবশেষে বললেন—*"নোয়াখালির বিপন্ন সময়ে সবকিছু ছেড়ে আমি বাঙালি হয়ে গেছি।"*[১১]

মহাত্মার নিজের কণ্ঠে ঘোষিত বর্ণমালাকে বাঙালিও আবেগের রাগরাগিনিতে বরণ করলো। তপন রায়চৌধুরী স্মৃতির সমৃদ্ধ ভাণ্ডার থেকে স্মৃতিচারণে মহাত্মার মহান প্রস্থাণ প্রসঙ্গে বলেন—

> *"... ... ... জাতির পিতা নিহত হয়েছেন। দিনটা তপ্ত লৌহের অক্ষরে স্মৃতিতে লেখা আছে। সেদিন দ্বারভাঙা বিল্ডিংয়ে দিলীপ রায় গান করছিলেন। উপাচার্য ডক্টর প্রমথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্ব করার কথা ছিল। উপাচার্যর আসতে দেরি দেখে দিলীপকুমার রায় গান শুরু করে দেন। গানে খুব মন বসছিল না। কারণ গায়ক নানা ভাষার গান শোনাচ্ছিলেন। এক সময় বললেন, 'আজ আপনাদের কিছু গুজরাটি হাসির গান শোনাব।' ভাষাটা*

জানা না থাকায় খুব যে একটা হাসি পাচ্ছিল, এমন না। হঠাৎ খুব দ্রুতপদে কয়েকজন হলে ঢুকলেন এবং তাঁদের একজন ডেইসে বসা কোনও কর্তাব্যক্তির হাতে এক টুকরো কাগজ দিলেন। ভদ্রলোক কিছুক্ষণ স্তম্ভিত থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আপনাদের এক মর্মান্তিক দুঃখের সংবাদ শোনাতে হচ্ছে। জাতির পিতা মহাত্মা গাঁধী এক আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছেন।' ডেইসে যাঁরা বসেছিলেন তাঁদের মধ্যে এক মহিলা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। সভা জুড়ে একটা অর্ধস্ফুট কান্নার আওয়াজ উঠল। সবারই সঙ্গে আমিও কলেজ স্ট্রিটে বের হয়ে এলাম। দেখলাম রাস্তার পাশের দোকানগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কখন, কীভাবে পায়ে হেঁটে হস্টেলে পৌঁছলাম স্মরণ নেই। দেখলাম বারান্দায় বসে হাঁটুতে মাথা গুঁজে অনেকে কাঁদছে। নিজের ঘরে গিয়ে আমিও নিজেকে সান্ত্বনাহীন শোকের হাতে সমর্পন করলাম।"(১২)

ভারতের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীবিদগ্ধজন হুমায়ুন কবির 'মহাত্মা গান্ধী' প্রবন্ধে লেখেন—

"পরাজয়ের পরমুহূর্তেই কিন্তু গান্ধীজির প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব আরও দেদীপ্যমান হয়ে উঠল। নিভন্ত বাতি যেমন উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠে, অস্তায়মান সূর্যের কিরণে পৃথিবী যেমন ভাস্বর মায়াময় হয়ে উঠে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে গান্ধীজির জীবনও অপরূপ মহিমায় দ্যুতিমান হয়ে উঠল। দক্ষিণ আফ্রিকা ছেড়ে যেদিন গান্ধী ভারতবর্ষে আসেন, তারপরে বারবার নানা সংগ্রামে তাঁর জয় হয়েছে, কিন্তু ভারত বিভাগের পরে আত্মিক যে সংগ্রামে তিনি নিজেকে ঢেলে দিলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তার বেশী তুলনা মিলবে না। সেদিন হিংসায় উন্মত্ত ভারতবর্ষ, মানুষ তার মানবধর্ম বিস্মৃত হয়ে পশুর অধম কার্যকলাপে বিভ্রান্ত, সে নিরন্ধ্র, অন্ধকারের কোথাও যেন বিন্দুমাত্র আশার আলোক নেই। মানবতার সেই দুর্দিনে গান্ধীর কণ্ঠে প্রেমের বাণী, অহিংসার বাণী, সহযোগের বাণী মন্দ্রিত হয়ে উঠল। অন্ধকারের যারা দাস তারা সে আলোক সহ্য করতে পারল না। নিষ্ঠুর আঘাতে গান্ধীর অমরজীবন শেষ করে দিল। কিন্তু মৃত্যুর মুহূর্তেও গান্ধীর কণ্ঠে অমৃতের বাণী, মানবতার আশ্বাস। হিংসাকে জয় করে সেদিন গান্ধীর যে অমরযাত্রা, ক্ষণিক পরাজয়ের কালিমাকে দূর করে চিরবিজয়ের যে ভাস্বর দীপ্তি, তারই

স্মৃতিকে পাথেয় করে যদি পাকিস্তান ও ভারতের মানুষ চলেন, তবেই তাঁদের কল্যাণ।"(১৩)

মহাত্মাকে হত্যার দু'মাস পর ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় "গান্ধী-স্মৃতি" নিবন্ধে লেখেন—

"আজ ঠিক দু'মাস হল মহাত্মাজির মৃত্যুর পর। খবরের কাগজে, মাসিক পত্রিকায়, খানকয়েক ছবি, গোটাকয়েক প্রবন্ধ, মধ্যে মধ্যে অন্য রচনায় উল্লেখ এবং স্মৃতিরক্ষার চাঁদা তোলার বিবৃতি ছাড়া তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কেন, সাধারণ আগ্রহেরই কোনো নিদর্শন চোখে আর পড়ছে না।ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সফর করলাম, নানা লোকজনের সঙ্গে দেখাশুনো, কথাবার্তা হল, কিন্তু তাঁর অবর্তমানটা দেশের পক্ষে 'সদ্‌ভাবাত্মক' মনে হল না। তাঁর প্রভাব তাঁর অভাবে কার্যকরী হয়ে উঠেছে এমন প্রমাণ কই?"(১৪)

উপরেরলেখাগুলো তিন বিদগ্ধবাঙালির। তাঁরা তাঁদের দৃষ্টিতে মহাত্মাকে মূল্যায়ন করতে চেষ্টা করেছেন। মৃত্যুর ৭২ বছর পেরিয়ে গেলেও তাঁকে নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিতে, ভিন্ন ভিন্ন মূল্যায়ণে অবিরত গবেষণা হচ্ছে, লেখা হচ্ছে। সাধারণ বোধসম্পন্ন মানুষ থেকে জ্ঞান এবং চেতনে মহাত্মা ভিন্নতর পথের পথিক বলেই তাঁকে নিয়ে এত গবেষণা, এত আরাধনা। আবার মহাত্মার হত্যাকাণ্ড নিয়ে মিশ্রপ্রতিক্রিয়ারও কমতি নেই। *"একজন জগদ্বিখ্যাত বাঙালি পণ্ডিত মহাত্মার খবর শুনে মন্তব্য করেন- 'কী আর এমন হয়েছে। উনি তো কলেরায়ও মারা যেতে পারতেন।' কথাটি শুনে আরেক বাঙালি পণ্ডিত প্রমথ বিশী সেই পণ্ডিতকে জুতো মারতে চেয়েছিলেন।"*(১৫)

ব্যক্তি-সমাজ-রাষ্ট্র-বিশ্ব মহাত্মার নিকট থেকে যে শাশ্বত অহিংস-সত্যাগ্রহেরআদর্শবার্তা পেয়েছে তা আজও আমাদের বিস্মিত করে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এখনও বিশ্ববাসীর বিশ্বাস মহাত্মার অহিংস-সত্যাগ্রহের আতুরগৃহেই আমাদের কাঙ্খিত মেডিয়েশনের ঘরবসতি।

* * *

গ্রন্থসহায়:

(১) পৃষ্ঠা: ৩০২
বাপুকে দেখলাম ফাঁসির ঘরেতে ও নোয়াখালিতে
হরিদাস মিত্র
গান্ধী পরিক্রমা
সম্পাদনা: শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়; ব্যারাকপুর

(২) পৃষ্ঠা: ২৯৯
হরিদাস মিত্র
সম্পাদনা: শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রাগুক্ত

(৩) পৃষ্ঠা: ৩০০
হরিদাস মিত্র
সম্পাদনা: শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রাগুক্ত

(৪) পৃষ্ঠা: ৩০০
হরিদাস মিত্র
সম্পাদনা: শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রাগুক্ত

(৫) পৃষ্ঠা: ৩০১
হরিদাস মিত্র
সম্পাদনা: শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রাগুক্ত

(৬) পৃষ্ঠা: ৩০১
হরিদাস মিত্র
সম্পাদনা: শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রাগুক্ত

(৭) পৃষ্ঠা: ১৪৬
তাঁর শেষ-নোয়াখালি ও পরের দিনগুলি
আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়
শ্রয়ণ
বার্ষিক সংখ্যা; ২০১৫
সম্পাদনা: পথিক বসু

(৮) পৃষ্ঠা: ১৫২
আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়
প্রাগুক্ত

(৯) পৃষ্ঠা: ১৫৩
আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়
প্রাগুক্ত

(১০) পৃষ্ঠা: ৪৩১
আমি সুভাষ বলছি
শৈলেশ দে
বিশ্ববাণী প্রকাশনী

(১১) পৃষ্ঠা: ৪০০
গান্ধী
কানাইলাল দত্ত
দে'জ পাবলিশিং

(১২) পৃষ্ঠা: ১৬৮
বাঙাল নামা
তপন রায়চৌধুরী
আনন্দ

(১৩) পৃষ্ঠা: ৭৪
মহাত্মা গান্ধী
হুমায়ুন কবির
গান্ধী পরিক্রমা
প্রাগুক্ত

(১৪) পৃষ্ঠা: ৬০
গান্ধী-স্মৃতি
ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
পূর্ব
গান্ধিচর্চা ২০১৯
উজান

(১৫) পৃষ্ঠা: ১৬৮
তপন রায়চৌধুরী
প্রাগুক্ত

Rare Photos of Mahatma Gandhi